ব্রহ্মচারী সদানন্দ কর্ত্তৃক
"শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘ"
ডি ৫২।৪৬, লক্ষ্মীকুণ্ড, বারাণসী হইতে প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী
ডি ৩৬।৮২, কালিয়াগলি, বারাণসী (ইউ, পি,)।

২। শ্রীঅমিয়নাথ বসু
পি ৪৮১, কেয়াতলা কলিকাতা-২৯।

৩। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
"অকাল-নিবাস", সরোজিনীপল্লী,
পোঃ বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান ভারতী প্রেস,
ডি ৪৭।৮৫, রামাপুরা, বারাণসী (ইউ, পি,)।

ॐ

'আশ্রম', P. O. Garia,
Dist. 24 Parganas.

কল্যাণীয়বরেষু, স্নেহাস্পদ শ্রীমৎ সদানন্দ –

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। এ শরীর পূর্ণ স্বচ্ছন্দ না হ'লেও অনেকটা ভাল। তোমরা নববর্ষের স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও।

তোমার ও আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রেমানন্দজীর 'যজ্ঞ' শ্রীমান্ গোবিন্দগোপালের দ্বারা অনেকবার এখানে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। তাতে আমরা নিরতিশয় আনন্দ পেয়েছি। যদিও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিমতাদি এখন আর দিতে পারি না, তথাপি, এই বিশেষস্থলে, নীচের একটা শ্লোকে (যজ্ঞ সম্বন্ধে) আমার অনুভূতির একটু আস্বাদ দিচ্ছি। তোমাদেরও হয় ত' ভাল লাগিবে।

প্রেমানন্দসমুদ্রবারি বিমলং প্রজ্ঞানসূর্য্যোজ্জ্বলং
বেদীরূপমৃতক্রিয়াশ্চ সমিধঃ পীযূষবাণ্যাহুতিঃ।
তদ্ যজ্ঞাৎ সমুদেতি বিশ্বকুশলঃ পর্জ্জন্য আনন্দবৃণ্
মৈত্র্যন্নং * সকলেষু হার্দ্দি নিতরাং যস্মাৎ প্রজা নির্জ্জরাঃ ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

প্রজ্ঞানরূপ সূর্য্যেতেজোদ্বারা সমুদ্দীপিত যে সুবিমল প্রেমানন্দসমুদ্রবারি, তাহাই হউক বেদীরূপ; ঋতস্থ পন্থায় প্রবর্ত্তিত 'যোগক্ষেমায়' যে সমস্ত ক্রিয়া, তারাই হউক সমিধচয়; সাক্ষাৎ আগম অথবা আত্মপ্রত্যয়ের যে অমৃতবাণী, তাহাই হউক আহুতি; এইভাবে সংযোজিত যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ হইতে বিশ্বকুশল আনন্দমাত্রা-বর্ষণকৃৎ পর্জ্জন্য সমুদিত হইতেছেন ('যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ'…); সে পর্জ্জন্যের বর্ষণ হইতে যে অন্ন জাত হইবে, সেটি হউক সর্ব্বজীবে একান্ত হার্দ্দিরূপা মৈত্রী; আর, সে অন্নে যে সব প্রজা জন্মিবে, তারা হইবে ক্লেশসঙ্কুল জরামরণশীল প্রজা নয়, পরন্তু, তারা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—অমর ও নির্জ্জর। ওঁ শান্তিঃ॥ ইতি—

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

---

* পরের আর একটি চিঠিতে পাঠান্তর দিয়াছেন : মৈত্র্যন্নমুদারহার্দ্দি……

গ্রন্থপরিচিতি

এই 'যজ্ঞ' গ্রন্থখানি যাঁহার লেখনীপ্রসূত তাঁহাকে জগতে অনেকে চিনে না, কিন্তু যে একবার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে না। তিনি গুপ্ত থাকিতেন এবং গুপ্ত থাকিতেই ভালবাসিতেন। তথাপি তাঁহার গুপ্ত থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ যে কখনও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে তাঁহাকে ছাড়িতে পারিত না। অধিকাংশ স্থলেই তিনি তাহার জীবনের আদর্শস্বরূপ হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার উপদেশ ভক্তগণকে লিখিত পত্রাবলীতে নিবদ্ধ আছে। তা ছাড়া "পূজা" নামক একখানা গ্রন্থে তিনি সাধারণ লোকের উপযোগিভাবে উপাসনাতত্ত্ব যথাসম্ভব সরল ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উপাসনাতত্ত্বের একটা দিক্ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার আর একটা দিক্ সম্বন্ধে তিনি যজ্ঞ গ্রন্থে কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ গ্রন্থের প্রকাশন তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তবর্গ পুস্তকখানা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে আমি এখানে দুটি কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

কিন্তু কি বলিব? স্বামীজী তাঁহার অন্তরের কথাই সরল ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে দৃষ্টিতে তিনি যজ্ঞকে দেখিতেন তাহা মূলতঃ আর্য দৃষ্টি—এই দৃষ্টি সরল হইলেও মহৎ-মঙ্গলের প্রসূতি। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজের এবং বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের আপাত প্রতীয়মান বিরোধের সমন্বয় হয় এবং জগতের যত সমস্যা—পরিবারের ও দেশের,

বাহ্য জগতের ও ভাব জগতের সকল প্রশ্নই সুন্দরভাবে মীমাংসিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম্মই যজ্ঞ - এমন কি আমরা যে পানভোজন করি তাহাও প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞ। সবই যজ্ঞ, সবই পূজা আত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই আত্মা। তাই যাহাতে আত্মার সন্তর্পণ হয় তাহাই পরমাত্মার তৃপ্তিসাধক আর যাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় তাহাই বস্তুতঃ আত্ম-তৃপ্তির উপকরণ। উভয়ে যে কল্পিত ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহা অবিদ্যামূলক। যেমন নিজে কিছু ভোগার্থ গ্রহণ করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু যদি নিজে না গ্রহণ করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করা যায় তারপর যখন উহা তাঁহার দৃষ্টিপূত হইয়া তাঁহার দ্বারা গৃহীত হইয়া আমার নিকট প্রসাদ রূপে উপনীত হয় তখন উহাতে বন্ধন তো হয়ই না বন্ধন মুক্তির কারণ হয়। ইহাই কর্ম্মগত কৌশল।

স্বামীজীর ভাবটা ছিল এই যে প্রতি মনুষ্যের জীবন এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার প্রত্যেকটি কর্ম্ম যজ্ঞরূপে পরিণত হয়।

এইভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠানময় জীবনে পরম লক্ষ্য আপনিই ফুটিয়া উঠে। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা, বিশ্বকল্যাণ ইহার ফলস্বরূপ স্বভাবতঃ উদিত হয়। মানবজীবন তখন ধন্য হইয়া যায়।

আশা করি এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সাধকগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

২এ সিগরা
বারাণসী
৭৫।৬০

স্বাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

—ঃ০ঃ—

প্রকাশকের বক্তব্য

পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে তিনি অতিবাল্যাবস্থা হইতেই গভীর সাধনভজনে নিবিষ্ট ছিলেন। আবাল ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী স্বামীজী মহারাজ তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর তপোলব্ধ অনুভূতি-গুলি এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সুচিন্তিত ধারণাসমূহ ভিত্তি করিয়া বহুপূর্ব্বেই তাঁহার অনুগত প্রিয় ভক্তমণ্ডলীর উপকারার্থে অনাড়ম্বর কালোপ-যোগী ও সর্ব্বজনসুখসাধ্য অভিনব সাধনপ্রণালী প্রচার করিযা গিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে "পূজা" ও "যজ্ঞ" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'পূজা'-নামক গ্রন্থখানি তাঁহার সদেহাবস্থায থাকাকালীন মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি 'যজ্ঞ' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে যজ্ঞতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা যাহা স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং যজ্ঞসম্বন্ধে সঙ্কলন ও নোট করিয়া গিযাছেন তাহারই যথাযথ মুদ্রণমাত্র। যজ্ঞের শাস্ত্রানুমোদিত মূল ভাবটি বজায় রাখিয়া অভিনব পদ্ধতিতে তাহার অনুষ্ঠানভাগ অর্থাৎ হোম (ক্রিয়া) তিনি বহুকাল হইতেই তাঁহার অনুগত প্রিয়জনদের দ্বারা করাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রকট দশাতেই সংক্ষিপ্ত ইতিকর্ত্তব্যতাসহ ক্রমে সজ্জিত শুধু মন্ত্রগুলি হস্তলিখিত পুস্তিকাকারে অনেকের নিকটই সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের স্বল্পকাল পরেই যজ্ঞ (শুধু মন্ত্রভাগ) পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়।

ভারতীয় সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সাধকভেদে অধিকারভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। গম্য স্থল সকলেরই এক, প্রাপ্তব্যও সকলেরই এক। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

আচার্য্য গুরু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি পূজা এবং যজ্ঞ মানবজীবনের আদর্শপ্রাপ্তির পক্ষে মুখ্য উপায়। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ যেভাবে এই দুইটি কর্ত্তব্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলে এবং তদনুযায়ী নিজের জীবনকে নিযন্ত্রিত করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে। পুরুষমাত্রেরই আদর্শ পুরুষোত্তম। যখন পুরুষোত্তমত্ব লাভ হয় তখনই বুঝিতে হইবে পুরুষ জীবনের পূর্ণ আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছে। এই যে বিরাট বিশ্বচক্র নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে ইহার অন্তরালে যজ্ঞেরই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের সেবা—ইহাই যজ্ঞ। ব্যষ্টি নিজের অধিকার-সম্পদ লইয়া সমষ্টির সেবা করিবে এবং সমষ্টি নিজের সম্পদ হইতে ব্যষ্টির অভাব পূরণ করিবে। দাস প্রভুকে প্রণাম করিবে এবং ঐ প্রণামের মধ্য দিয়া আত্মনিবেদন করিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও প্রসন্ন হইয়া দাসকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়া আপনাকে দান করিবেন। ইহাই ব্রহ্মচক্র। নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া অপরের জন্য চিন্তা করিলে স্বভাবতঃই প্রকৃতির গভীর প্রদেশ হইতে যে প্রতিদান পাওয়া যায় তাহাতে শুধুই যে নিজের অভাব দূর হয় তাহা নহে, নিজের রূপান্তরও ঘটিয়া যায়—ইহারই নাম জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন।

আবার আত্মবস্তুকে অনাত্ম বস্তু হইতে পৃথক্ করণই ছিল যজ্ঞের প্রাণ। অনাত্ম বস্তুগুলির আহুতি প্রদান করিয়া আত্ম বস্তু শোধন করিতে হইবে--যজ্ঞ এই ক্রিয়ার প্রতীক। হিন্দু, পার্শীর পূর্ব্বপুরুষগণ যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন তাহা কেবল জ্বলন্ত অগ্নিচ্ছটার তামাসা দেখিবার জন্য নহে। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাই ছিল অনাত্মবস্তুর মলিনতা পুড়াইয়া ফেলা এবং তাহাকে চরম স্থিতিতে আত্মরূপে পরিণত করা। যজ্ঞের এই মূল উদ্দেশ্যটি লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজের যজ্ঞ প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টার মুখ্য হেতু। তিনি সরল ভাষায় যজ্ঞের উদ্দেশ্যটি

অন্যত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—"প্রথমতঃ ব্যষ্টি তত্ত্বগুলিকে সমষ্টি তত্ত্বে আহুতি দিয়া এক বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব স্থাপন করা, পরে সেই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবগুলিকে এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্বে আহুতি দিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব আস্বাদ করাই হোমের লক্ষ্য।" (পূজা-২৭০)।

পূজা এবং হোম সাধনার আবিশ্যিক অঙ্গ। ঢালিয়া, নূতন করিয়া সাজাইয়া স্বামীজী মহারাজ ইহাদিগকে সহজসাধ্য সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় নানা কারণে যজ্ঞ পুস্তকটি মুদ্রিত হইতে পারে নাই। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত এবং আমার অনুজ প্রতিম ডঃ ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত* পূজ্যপাদ স্বামীজীর যজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংগ্রহ এবং উপদেশাদির নোটগুলির সংকলন করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হন। শশিভূষণ অসুস্থাবস্থাতেও স্বহস্তে অনেকখানি পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু দুরন্ত কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনিও আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহার আরব্ধ ও একান্ত অভীপ্সিত কার্য্যটি সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পূজ্যপাদ স্বামীজীর রচনার কোনো পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জ্জন না করিয়াই আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। বিষয়গুলির ক্রমবিন্যাসে যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা আমাদেরই।

এই গ্রন্থ প্রকাশনে সস্নেহ প্রেরণা লাভ করিয়াছি পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে। পরমার্চ্চনীয় স্বামীজী শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজও আমাকে বিশেষ প্রোৎসাহন দিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ শরীরেও আমাদের যজ্ঞ গ্রন্থটির একটি প্রশস্তিসূচক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি

করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকসহ তাঁহার আশীর্ব্বাদ চিঠিখানি গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হইল। আচার্য্য কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশনের নিমিত্ত তাঁহার বিভিন্ন কার্য্যক্রম থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থক্রমবিন্যাস আদি প্রসঙ্গে আমাকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার উপদেশাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি অনেকাংশের প্রুফও তিনি স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থপরিচিতি সম্বন্ধে তাঁহার একটু লেখা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজের নিজের সুচিন্তিত রচনা এবং পরম পূজনীয় কবিরাজ মহাশয়ের সস্নেহ নির্দ্দেশাদি সত্ত্বেও আমার অযোগ্যতার দরুণ হয়ত অনেক ভুলত্রুটি ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকট আমি ক্ষমার্হ।

পরিশেষে বক্তব্য, এই অভিনব যজ্ঞবিধিটিকে তাঁহার মনোমত রূপদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং এই পুস্তকের 'কালোপযোগী যজ্ঞ'-শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৩৮) ঃ—"এই যজ্ঞবিধি ও তাহার তাৎপর্য্যের মধ্য দিয়া শুধু যজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইল মাত্র। সময়ের, শক্তির, যোগ্যতার অভাবে ইহার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি কৃপালু পাঠকগণ ইহাকে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে একটা সুন্দর আকার দান করিতে চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।"

—ঃ*ঃ—

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি লইয়া কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব যেভাবে এ বিষয়ে বুঝাইয়াছেন এখানে তাহার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহার মধ্যে যদি কিছু উপাদেয় থাকে তবে তাহা তাঁহার (তাঁহার গুরুদেবের) ভুলচুকের জন্য যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছে, স্বামীজী বলেন, তাহা তাঁহার নিজের। তিনি বলেন, একজন শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনধিকারীর পক্ষে সে দোষ মার্জ্জনীয়। তাঁহার লিখিবার প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নহে, শুধু গুরুর আদেশ পালনের চেষ্টা মাত্র। কারণ, তিনি বলেন, "প্রতিষ্ঠা লাভেও যোগ্যতা চাই ; আমার ভিতরে যে তাহার বিশেষ অভাব আছে তাহা বন্ধুদের নিকট সুবিদিত।"

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, স্বামীজী সন্ন্যাসী হইয়াও যজ্ঞ লইয়া এত মাথা ঘামান কেন ? এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'আমার উত্তর সহজ , আমি পিতার আদেশে সন্ন্যাস লই, তিনি আমার ভিতরে যে ভাবের সন্ন্যাস দেখিতে চান আমি সেই ভাবে জীবন চালাইতে চেষ্টা করি।' স্বামীজী ছিলেন গীতার সন্ন্যাসী—অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া ভগবদ্ ইচ্ছার পূরণ—জীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার মতে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ। তবে যাহারা তর্ক করিতে আসেন তাহাদেরেও দু' একটা কথা বলা দরকার। তাই তিনি বলেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়াছি, অন্ততঃ করিতে ইচ্ছা করি কামনা-বাসনা আসক্তি ও তৃষ্ণারূপ সংসারের, জীবসৃষ্ট জগতের ;—ভগবৎসৃষ্ট জগতের, ভগবদ্‌বিধানের

নহে। আমার ভগবানও কর্ম্ম করেন তবে তাহা "আনন্দ-প্রাচুর্য্যাৎ নতু অভাবাৎ।" সে কর্ম্ম সাধিত হয় স্বভাব হইতে—অভাবের তাড়নায় নহে। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ভগবানের কর্ম্মরহস্য যাঁহার অনুভবে আসে তিনিও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥ গীতার সাধক ভক্ত, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মহাত্মগণও তাঁহার অনুমোদিত কর্ম্মে জীবন অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে ভালবাসি। ভগবান শঙ্কর যে কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছিল সকাম কর্ম্মের ন্যাস। চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়ক কর্ম্ম তাঁহার মতেও নিন্দনীয় নয়। সৎ চিৎ আনন্দ যে কর্ম্ম করেন না তাহাও ভাবিতে পারি না। বেদান্ত দর্শনেও দেখিতে পাই ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হয়। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—প্রকৃত সন্ন্যাসীর নিজের কার্য্য বলিয়া কিছু থাকে না—অর্থাৎ ভগবদ্ ইচ্ছাপূরণে ভগবৎকার্য্যসাধনে তাঁহার জীবন ন্যস্ত হয়। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥—ভগবান যেভাবে সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, আমার মনে হয়, আদর্শ সন্ন্যাসীও সেইরূপ জীবহিতার্থ সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজে অকর্ত্তৃভাবে অবস্থিত থাকাতেই কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। তিনি থাকেন ভগবানে যুক্ত, তাঁহার ভিতর দিয়া সমস্ত কর্ম্ম ভগবদিচ্ছায় সুসম্পন্ন হইয়া যায়। সন্ন্যাস যে ভগবৎকার্য্যের, ভগবদবিধানের নহে—তাহা যে অসম্ভব তাহা শঙ্করও স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। তখনও সিদ্ধাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞের নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষেরও কর্ম্ম থাকিতে পারে। ভগবান শঙ্কর, ভগবান চৈতন্যদেব, ভগবান যীশু ও ভগবান বুদ্ধ যেভাবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন জীবের কল্যাণসাধনে যেভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। কর্ম্মকাণ্ডীয় হিংসাত্মক স্বার্থ-প্রণোদিত কর্ম্মরূপ যজ্ঞই সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নিষ্কাম ভগবদ্‌ইচ্ছা পূরণের জীবহিত সাধনের সহায়ক যজ্ঞ আমি আমার পক্ষে করণীয় মনে করি। আমার গুরুদেবের আদেশও ছিল সেইরূপ। আপনাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে আমি যে যজ্ঞের অনুমোদন করি তাহা সন্ন্যাসের অনুকূল কি প্রতিকূল। আমি যে কাজে আদিষ্ট, আমি যে কাজকে শাস্ত্র গুরু ও বিবেকের অনুমোদিত মনে করি সে কাজ করিতে বন্ধুদেরে অনুরোধ করা আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"আমি প্রাণ হইতে বিশ্বাস করি যে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে, সমস্ত প্রিয়জনকে ভগবদ্‌বিগ্রহে পরিণত করা যায়; সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞে পরিণত করা যায়। সমস্ত ইদং পদার্থ পূর্ণ অহংএরই পরিণাম বা বিবর্ত্তন। জীবজগৎ ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নহে। ঋষিদের জীবনের সারতত্ত্ব ছিল সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি। কি করিয়া সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞে ভগবদ্‌আরাধনায় পরিণত করা যায় তাহাই ছিল তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। নিষ্কামকর্ম্ম ভগবৎ-আরাধনা যে যজ্ঞের নামান্তর মাত্র ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। যজ্ঞের আগন্তুক মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঋষিদের প্রধান কাজ। এই তত্ত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সমস্ত কর্ম্মকে কি করিয়া যজ্ঞে পরিণত

করা যায় বন্ধুদেরে সে তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। যে কোন জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা যে ব্রহ্মজ্ঞান, যে কোন কাজের পূর্ণতাপ্রাপ্তি যে ভগবৎপ্রাপ্তি, যে কোন ভালবাসার পূর্ণ পবিত্রতা-প্রাপ্ত অবস্থা যে ভগবৎ-প্রেম তাহা আমি পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।" "Any knowledge raised to the power infinity is the knowledge of God; any love raised to the power infinity is the love of God; any activity done in the perfect way is the real Jnana or Para Sadhana".

তিনি আর এক জায়গায় বলিয়াছেন,—"মানুষ সাধন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া গেলে তখন তাঁহার ভিতরে আর কামনা-বাসনা-আসক্তি-নিজসুখস্পৃহা, প্রতিষ্ঠার মোহ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তিনি হইয়া পড়েন ভগবানের হাতের একটি যন্ত্র; ভগবান তাঁহাকে যে তালে যে সুরে বাজাইতে চাহেন, তিনি তখন সেই তালে সেই সুরে বাজিয়া উঠেন। তখন তাঁহার নিজের কাজ বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জীবের কাজই হইয়া পড়ে শিবের কাজ। এই শিবের কাজকেই আমি মনে করি প্রকৃত যজ্ঞ। তখন ভগবানের সহিত তাঁহার পূর্ণযোগ সাধিত হইবার ফলে তাঁহার চোখের ভিতর দিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, দিব্য-দর্শন ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি তখন দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মশ্রবণ, দিব্যশ্রবণাদি লাভ করেন। তখন তাঁহার সমস্ত বৃত্তি পূর্ণ পরিণত ও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়ায় তাঁহার দেখা, শুনা, কাজ করা, ভাবা, চিন্তা সব পূজায় বা যজ্ঞে পরিণত হয়। এই জন্যই ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, বিষয়োপভোগরচনাই হইয়া পড়ে প্রকৃত যজ্ঞ। ঋষিদের প্রাচীন যজ্ঞের ভিতরে এই ভাবের আমি একটা পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। যজ্ঞের

আগন্তুক বিকৃতিগুলি দূর করিয়া বিচার করিলে যজ্ঞের—বিশেষতঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতরে এই ভাবের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমার মনে হয়, ভগবান স্বয়ং, সব দেবতাগণ, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বৃক্ষলতা, বনস্পতি সকলেই যেন অহর্নিশ যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস—আমাদের দেখা-শুনা—আমাদের রক্তের চলাচল—আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও আমি বেশ সুন্দররূপে বৈদিক যজ্ঞের একটা আভাস দেখিতে পাই। শিবের কর্ম্মই যখন যজ্ঞ, আর জীবের কর্ম্মকেই শিবের কর্ম্মে পর্য্যবসিত করাই যখন জীবের প্রধান লক্ষ্য তখন যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, সাধনার অভাবে আমি হয়ত আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না; কিন্তু বন্ধুদের কেহ যদি আমার লক্ষ্যটি অবলম্বন করিয়া প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে সচেষ্ট হন তাহা হইলে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব। আমি যেন প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক পদার্থকে এক একটি যজ্ঞের জীয়ন্ত বিগ্রহ, এক একটি জীয়ন্ত যজ্ঞশালা বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

নিজের প্রিয়জনদেরে ভগবদ্‌বিগ্রহে পরিণত করা, সংসারকে ভগবদ্ধামে উপলব্ধি করা, জীবের সেবাকে শিবের সেবা মনে করা, সমস্ত কাজকে পূজায় বা যজ্ঞে পরিণত করা যে স্বামীজীর জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের ভালবাসাকে শুদ্ধ করিয়া, পূর্ণ করিয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত করিতে তিনি আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—"সংসারকে বৃন্দাবনধামে, প্রিয়জনদের ভগবদ্‌বিগ্রহে পরিণত করা যায়। নিজে ভাল হইয়া সকলকে ভাল করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা যাইতে পারে। প্রিয়জনকে

আস্তে আস্তে ভগবদ্‌বিগ্রহে পরিণত করিতে হইবে। তাহারা যে আসলে ভগবানেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন তাহা বুঝিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে বিবর্ত্তনের কারণটা রহিয়াছে অনেকাংশে দ্রষ্টার ভিতরে। সংসারের ভালবাসাকে আস্তে আস্তে শুদ্ধ করিয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত করা যায়। সেই পরিবর্ত্তন করাই হইবে জীবনের লক্ষ্য। তখন ভালবাসা হইবে ভগবৎপ্রেম, দেখা হইবে ভগবদ্দর্শন, চিন্তা হইবে ধ্যান, কাজ হইবে ভগবৎপূজা। নিজের দেহকে, সংসারকে করিয়া তুলিব ভগবদ্ধাম, প্রিয়-জনকে করিয়া তুলিব ভগবদ্‌বিগ্রহ, আমাদের ভালবাসাকে করিয়া তুলিব ভগবৎপ্রেম, আমাদের কাজকে করিয়া তুলিব ভগবৎপূজা। নিজের ভিতরে এবং বন্ধুদের ভিতরে এই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই আমার জীবনের প্রধান সাধনা। আমার বিশ্বাস ইহাই ছিল ঋষিদের আবিষ্কৃত আর্য্য ধর্ম্ম। ইহার ভিতরে আমার নূতনত্ব কিছুই নাই। এই আদর্শে অষ্টাবক্র জনককে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ইহাকে আর্য্য সভ্যতার বীজমন্ত্র বলি। সাধনার প্রভাবে মা বাপ হইয়া পড়িবেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ, ছেলেরা বালগোপাল, মেয়েরা কুমারী ভগবতী, স্বামী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, রাম বা শিব, স্ত্রী সাক্ষাৎ রাধা, সীতা বা ভগবতী, জীব পোষাকপরা শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী, যত্র জীব তত্র শিব। কে আমাদের চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছে, কানের ভিতর দিয়া শুনিতেছে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, মনের ভিতর দিয়া চিন্তা করিতেছে, চিত্তের ভিতর দিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত দ্রষ্টা হইয়া এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের অঙ্গীভূত।" সংসার যে ছেলেমেয়ে, বিষয়-সম্পত্তি নহে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি প্রায়ই বলেন, 'বাসনা এব সংসারস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে। যত্র

যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্তদা ॥' তিনি আমাদিগকে রাজর্ষি জনকের আদর্শে অনাসক্ত—অনুরাগী সংসারী-সংসারত্যাগী হইতে সচেষ্ট থাকিতে বলেন। ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিলে তখন আমাদের সব কাজ যে শিবের কাজে পরিণত হইয়া যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

যজ্ঞতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক নূতন তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, অনেক শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "যজ্ঞকথা" এবং কোকিলেশ্বরের "উপনিষদের উপদেশ" পাঠে তিনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সব লেখাগুলি কেহ ভালভাবে গুছাইয়া রাখিবার সুযোগ পায় নাই। অথচ আমাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহার মত আমাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইযাছেন। সেজন্য অনেক কথা ও অনেক ভাব অপূর্ণ রহিয়া গেল। যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের শ্রুতিগুলি ঠিক ভাবে সংগ্রহ করা যায় নাই, সময়-সুযোগ পাইলে এ সম্বন্ধে পুনরায় লিখিতে চেষ্টা করিবেন বলিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি এই ভাবগুলি আমাদের খুব ভাল মনে হওয়ায় আমরা যতটুকু শুনিয়াছি. যতটুকু বুঝিয়াছি তাহারই একটা সামান্য আভাস এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করিলাম। ইহা কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করিয়াও লিখিত হয় নাই। লেখার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি যাহাতে লোকের মন একটু ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া আসে সেজন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে বহু লোকের সঙ্গে মিশিতে হইত, বহু বিষয় আলোচনা করিতে হইত, বহু সভায় যোগদান করিতে হইত। কাশীর 'বান্ধব সমিতি', 'যুবক সমিতি', 'সেবা সমিতি' ও 'পণ্ডিত সভা' লইয়া তিনি অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। তাহার পরে তিনি এসব ছাড়িয়া যখন দূরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বন্ধুগণ পূর্ব্ব আলোচ্য বিষয়ে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করিয়া চিঠি লিখিতেন। যজ্ঞতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ সেই সব

চিঠির উত্তর হইতে সংগৃহীত। পুনরুক্তি দূর করিবার জন্য এগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলির মধ্যে পুনরুক্তি আসিলেও তাঁহার কথাগুলি ঠিক সেইভাবে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হই। তাঁহার বন্ধুগণ জানেন, তাঁহার মুখস্থ শক্তি কিরূপ প্রখর ; তিনি একবার যাহা পড়িয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিতেন না। সেইজন্য অপর কোন গ্রন্থে তিনি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন কিছু লিখিবার কালে অনেক সময় তাঁহার ভাবের সঙ্গে সেই ভাষা পর্য্যন্ত আসিয়া যাইত। তাঁহার আরও একটা অভ্যাস ছিল, যেখানে যেটুকু ভাল জিনিষ পাইতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন। প্রখর মুখস্থ শক্তির প্রভাবে সেইজন্য কথা বলিবার কালে অনেক সময় সেইসব কথাগুলি অবিকল নকল রূপে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত।

তাঁহার জীবনে আমরা একটা জিনিষ খুব লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি শাস্ত্রগুরু ও বিবেকের অনুমোদিত পথে চলিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও ঠিক ভাবে শাস্ত্রালোচনা করিবার সুযোগ তিনি জীবনে বেশী লাভ করেন নাই ; অনুভূতির দিকেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। নানা উপায়ে তিনি যে সব সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন শাস্ত্রের সাহায্যে—পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি তাহার সত্যতা উপপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরে সেই উপলব্ধ সত্যগুলিকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রূপে ঋষিবাক্যভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কোন অনুভূতিকেই অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাই নাই। এইসব তত্ত্ব যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইবার অবকাশও বিশেষ বন্ধু ব্যতীত খুব কম লোকেরই হইয়াছে।

তিনি অনেক সময় বলিতেন, যে আদর্শ গুরুর সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, দূরে বসিয়াও স্বপ্নাদির সাহায্যে তিনি তাঁহাকে চালাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান সাধনা।

—ঃ০ঃ—

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজ প্রবর্ত্তিত নিয়মিত পূজায় এবং সাময়িক যজ্ঞানুষ্ঠানে যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সাগ্রহে যোগদান করিতেন, সঙ্কটাপন্ন অসুস্থাবস্থায়ও এই 'যজ্ঞ' পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে উৎসুক হইয়া যিনি বিপুল পরিশ্রম সহকারে ইহার সংকলন করিতেছিলেন,

আমাদের পরম প্রিয় সেই স্বর্গত

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

পবিত্র স্মৃতিতে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইল।

—ঃ০ঃ—

সূচিপত্র

—ঃ০ঃ—

মঙ্গলাচরণ

যিনি আমাদের এই দেহের এবং দেহস্থ সব যন্ত্রের রচয়িতা এবং পরিচালক, যিনি এই দেহের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের দেহপ্রাণমন আদিকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি, হে স্বপ্রকাশ-স্বরূপ তুমি আমাদের সব তত্ত্বের ভিতর দিয়া তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর। বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্—আমাদের আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার যজ্ঞকার্য্য সুসাধিত কর। আমাদের জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করুক, পূর্ণা ভবত্বনুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা। প্রতিষ্ঠার মোহ, স্বার্থপরতা, অহংকার ও সংস্কারাদি আসিয়া যেন তোমার ইচ্ছা পূরণে কোনরূপ বাধা দান না করে।

—:•:—

যজ্ঞ

(১)

যজ্ঞ—ভগবৎ সাধনা

হিন্দু শাস্ত্রে ভগবান শব্দটি একটা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ অবস্থা কতকটা ক্যাণ্টের Noumenon এবং Phenomenon, Manifested এবং Unmanifested ভাবের দ্যোতক। নির্গুণ বাক্য মনের অগোচর, চিন্তার ধারণার—সুতরাং সাধন ভজনেরও অতীত। সগুণের সাধন করিতে করিতে নির্গুণও যে কতকটা সগুণের অন্তর্গত—সুতরাং ধারণার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সগুণ ভগবানের জীব জগৎ জীয়ন্ত বিগ্রহ। তিনি বিশ্বরূপ—বিশ্বের অন্তরাত্মা। তাঁহার একটা নাম পরমাত্মা, আত্মার পরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—গভীরতা এবং বিস্তৃতিতে অসীম অবস্থা, জীব-জগৎ তাঁহারই লীলা-স্বীকৃত বিগ্রহ, তাঁহারই মূর্ত্তি, তাই তিনি বিশ্বরূপ। তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া নিজকে লুকাইয়া লীলারস বিস্তার করিতে বসিয়াছেন। সেই লুকান চোরকে, লুকান মাকে ধরিবার একমাত্র উপায় তাঁহার ছেলেমেয়েদের সেবা করা, ছেলেমেয়েদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা। আত্মাকে, পরমাত্মাকে দেখা ধরা কঠিন। দেহ অবলম্বনেই তাঁহার প্রকাশ, তাই দেহ অবলম্বনে তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাই জীবের সেবার অধিকার

লাভ করিয়া শিবের সেবাধিকার লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। আমার এই দেহের ভিতর দিয়া এই ত্রিবিধ দেহকে শুদ্ধ শান্ত করিয়া যেরূপ আমার ভিতর দিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিতে হইবে, সেইরূপ সকল জীবদেহের ভিতর দিয়া সকল জীবদেহকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া সকলের ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে ফুটাইয়া বাহির করিয়া তাঁহার দর্শন ধ্যান ও সেবার অধিকার লাভ করাই হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। যিনি পরম অনন্ত ও ব্রহ্ম তাঁহাকে সীমাবদ্ধভাবে পাইলে যে পূর্ণভাবে পাওয়া হয় না এই তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াই হিন্দুরা সকল জীবকে আত্মৌপম্য ভাবে দেখিতে, সেবা করিতে এতটা ব্যস্ত। তাঁহাদের অভিধানে পর নাই, সকলই আপন। জীব সেবা তাহাদেরই নিজের পরমাত্মার সেবা—শিবের সেবা। ভগবান যে জীবেরই পূর্ণ স্বরূপ, ভগবানকে জানাই যে তাহার নিজকে জানা, তাহার নিজকে পাওয়া, ভগবানের পূজা তাহার নিজেরই পূজা, জীবের ভিতর দিয়া শিবের পূজা। জীবের সেবা তাহার নিজের সেবা, তাহারই পরমাত্মা পূর্ণ স্বরূপের সেবা।

ভগবান মানেই নিজের পূর্ণতা, জীবের পূর্ণ পরিণত অবস্থা, যাহা জানিলে আর জানার বাকী থাকে না, যাহা পাইলে আর পাওয়ার বাকী থাকে না, যাহা হইলে আর হওয়ার বাকী থাকে না—"যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ। যদ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥" মানুষ মাত্রেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভগবানকে জানিতে পাইতে সচেষ্ট। ভগবৎপ্রাপ্তি সেই পূর্ণতার উপলব্ধি। সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যই সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে পূর্ণরূপে বিভূষিত হওয়া। সত্তায় চৈতন্যে ও আনন্দে পূর্ণতা লাভ করা, নিজকে সব রকমে পূর্ণ করিয়া তোলাই হিন্দু সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য। বাঁচিয়া

থাকিতে চাহেন না, জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন না—সুখে থাকিতে চাহেন না, পৃথিবীতে এমন লোক নাই। সুতরাং সজ্ঞানেই হউক, অজ্ঞানেই হউক আমরা ভগবানকে চাহিতে বাধ্য। সাধনা সেই পূর্ণতা লাভের চেষ্টা; সুতরাং আমরা সকলেই সাধক। আর এক ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, ভগবান যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশক্তিমান—একটা অনন্ত শক্তির আধার-রূপী—Powerhouse—যাহার সঙ্গে যোগ থাকিলে আমাদের চোখ দেখিতে পায়, কান শুনিতে পায়, হাত কাজ করিতে পারে, মন বিচার করিতে পারে ও চিত্ত আনন্দলাভ করিতে পারে। সেই Powerhouse-এর সঙ্গে যোগ পূর্ণভাবে সাধিত হইলে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ শক্তি পূর্ণ রূপে আবির্ভূত হইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তখন দূরদর্শন, সূক্ষ্ম দর্শন, দিব্য দর্শন প্রভৃতি লাভ করিয়া ভগবানের দিব্যস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া এই দিব্য শক্তির পূর্ণ বিকাশ না হইলে সেই পূর্ণ স্বরূপ ভগবানের পূর্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে আদর্শ নর অর্জ্জুন পর্য্যন্ত ভগবানের এই পূর্ণরূপ ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াও দিব্য চক্ষু দ্বারা ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। সাধনা, উপাসনা, আরাধনা, যজ্ঞ প্রভৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য নিজকে সব বিষয়ে পূর্ণ করিয়া তুলিয়া পূর্ণস্বরূপ ভগবানকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিষ যে কোন জীব কল্পনায়ও আনিতে পারে না—তাহা বলা বাহুল্য। জীবের সেবার অর্থাৎ জীবের কল্যাণসাধন দ্বারা জীবের ভিতর দিয়া ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া জীবকে শিবের বিভূতি ও জীয়ন্ত বিগ্রহরূপে সেবা করিবার এমন উচ্চ আদর্শ জগতে দুর্লভ। এই উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করাই যজ্ঞাদি সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বোঝা গেল যে হিন্দুর ভগবান

বিশ্বরূপ, তাঁহার সাধনা, পূজা বা যজ্ঞ জীবের ভিতর দিয়া শিবের সেবা। জীব যে শিবের জীয়ন্ত বিগ্রহ, তাহার সেবা সকলেই করিতে চায়—সকলেই করিতেছে—অজ্ঞানী অভক্ত করে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কষ্টের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে, জ্ঞানীভক্ত করে জ্ঞানত: নিজের স্বধর্ম্ম মনে করিয়া সুন্দরভাবে—আনন্দ প্রাচুর্য্য হেতু। অজ্ঞানী যে সব কর্ম্মকে মনে করে বন্ধনের কারণ, জ্ঞানীর বিচারে তাহা হয় মুক্তির, ভগবৎপ্রাপ্তির, পরমাত্মা লাভের সহায়।

ভগবৎতত্ত্বকে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ আমরা কতকটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা তত সহজ নয়। অনন্ত গভীরতায় in intensity ; ব্রহ্ম ব্যাপকতায় in extensity। অনন্তকে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা সব পদার্থের ভিতরে বিশেষতঃ আমাদের নিজেদের ভিতরে ডুব দিয়া তাহার ভিতরকার প্রকৃত সার তত্ত্ব, পরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিব ; ইহা হইবে নেতি নেতি সাধনার চরম ফল। ডুব দিয়া যখন গিয়া আমরা পরম সারতত্ত্বে, চরম আত্মতত্ত্বে পৌঁছিব তখন দেখিব তিনি সর্ব্বব্যাপক। তিনি যেন প্রকাণ্ড মহাসাগর। জীব জগৎরূপ ঢেউগুলি তাহার বুকের উপর দিয়া উঠিয়া পড়িয়া লীলা করিতেছে। এই ভাবে জীব জগৎকে তাঁহার বিভূতি, তাঁহার মহিমা, তাঁহার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বলা যায়। সাধনা দ্বারা জীবজগৎকে ভেদ করিয়া জীবজগৎকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া সকলের ভিতরে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পরে নিজকে সকলের সঙ্গে অভেদ মনে করিয়া নিজকে সকলের ন্যায় একটা সামান্য ব্যষ্টি, পরিণতি বা বিবর্ত্তন জানিয়া আত্মৌপম্য ভাবে সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আমাদের ইষ্ট পুরুষোত্তম তত্ত্ব। তিনি ব্যষ্টি

জীবদেহে স্থিত হইলেও তাঁহার সমস্ত দেহ, সমস্ত তত্ত্ব পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য। তিনি হইয়া পড়িয়াছেন একটা সমষ্টিতত্ত্বের ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতীক। সমষ্টি তত্ত্বের ঐশ্বর্য্য বিদ্যা জ্ঞান সুখ শান্তিই হইয়া পড়িয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আনন্দ। তিনি কাহাকেও নিজ হইতে পৃথক মনে করেন না; ব্যষ্টি দেহে স্থিত থাকিয়াও সমষ্টিগত সত্ত্বা সর্ব্বদা সকল কাজে, সকল ভাবে তিনি অনুভব করিতে থাকেন। সাধককে এই ইষ্টময় হইতে হইবে।

ব্যষ্টি সমষ্টি তত্ত্ব

বি পূর্ব্বক অস্ ধাতু হইতে ব্যষ্টি শব্দ সম্পন্ন, অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা। যাহা বিশেষের দিকে, বহুর দিকে লইয়া যায়। যাহা বহু ভাবাপন্ন তাহাই ব্যষ্টি ; আর যাহা সমের দিকে, সর্ব্বব্যাপী ভাবের দিকে, শান্ত অদ্বৈত ভাবের দিকে লইয়া যায় তাহাই সমষ্টি। হিন্দু ধর্ম্ম স্বীকার করেন, জগৎটা একেরই বহুরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন। একও বহু, বহুও মূলতঃ এক ; বহুর মধ্যে একত্ব, একত্বের মধ্যে বহুত্ব সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক ও বহুর একত্ব স্থাপন করাই ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবের, ব্যস্ত সমস্ত হবনের উদ্দেশ্য।

ব্যষ্টি সমষ্টির রহস্য চিন্তা করিলে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ না ভাবিয়া পারি না। ব্যষ্টি সমষ্টিরই বিভূতি, বিভিন্নরূপে অবস্থান, বা সমষ্টির বিভিন্ন প্রতিবিম্ব। ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদটা সহজবোধ্য নহে। সমষ্টি একতত্ত্ব, একরস, সর্ব্বব্যাপী, তাহা ছাড়া কিছু নাই, অবসরও নাই ; সুতরাং তাহাকে বিভাগ করা অসম্ভব। সমষ্টি পুরুষে অবয়বের ভিন্নতা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রতি অবয়বে অন্য অবয়বের ভাব গূঢ়রূপে বর্ত্তমান। নতুবা তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যে বিভিন্ন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অংশ যে জীব তাহার ভিতরে পূর্ণত্বের বীজ থাকা সম্ভব হয় না। এইজন্য অনেকে অংশ বিভাগকে প্রতিবিম্বের, প্রতিফলনের পার্থক্যজনিত মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃতির স্তর অনন্ত ; সুতরাং তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যও অনন্ত ভেদ বিশিষ্ট। এই প্রতিবিম্বগত ভেদ ও অংশগত ভেদ কথার ভিতরে বিশেষ পার্থক্য মনে হয় না। পূর্ণেরও প্রতিবিম্ব কোথায় পড়িবে একথা বলা যায় বটে ; তবে

যে তত্ত্ব বাক্য-মনের অতীত তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, মনে হয়, যেন, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন প্রেম-বিবর্ত্ত বিলাস-তত্ত্বে অভেদ, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে ভেদবাদ কল্পনা করিয়া রাধাকে কৃষ্ণ হইতে বাহির করিযা বিরহ ও মিলনের ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলা বুঝাইতে হইয়াছে। প্রতিবিম্ব যত বিম্বের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই সে বিম্বের ভাবগুলি প্রাপ্ত হইবে। বিম্বের একতা অদ্বৈতভাব দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং সাধক যত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেন ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের অদ্বৈত তত্ত্ব, ঈশ্বরের প্রেম তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

ব্যষ্টির কল্যাণ যে সমষ্টির কল্যাণের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব উপলব্ধি না হইলে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ব্যষ্টির ভিতরে সমষ্টি বীজাকারে নিহিত; সুতরাং ব্যষ্টিকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইলে তাহাকে সমষ্টিভাবাপন্ন হইতেই হইবে। সাধনার পরিপক্কাবস্থায় নিজের আত্মার ব্যাপকত্ব উপলব্ধি হওয়ায় সব জীবকে আত্মীয় ছাড়া অন্যভাবে উপলব্ধি করিবার জো থাকে না। নিজের দেহ যেমন আত্মার বিভূতি বলিয়া আত্মীয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত দেহগুলি আমাদের ব্যাপক আত্মার বিগ্রহ বলিয়া আত্মীয়। সে অবস্থায় আত্মপর ভেদভাব থাকে না। তখন যে পর বলিয়া কেহ থাকে না সুতরাং সবই আমার আত্মা। যতক্ষণ নিজদেহের বৃত্তি থাকে ততক্ষণ মনে হইবে জগতের সব দেহই আমার দেহ। যখন নিজের দেহের অস্তিত্ব থাকিবে না তখন আত্মার সেই অব্যক্তাবস্থায় জগতের কিছুই আমার নিকট প্রতিভাত হইবে না। তাই বলা হয়, অতো মম জগৎ সর্ব্বং অথবা ন চ কিঞ্চন।

অনেকে বিশ্বাস করেন, যাহা বিশ্বে (macrocosm) আছে তাহা বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে (microcosm) বর্ত্তমান রহিয়াছে। জীবদেহে জগতের সমস্ত রহস্য, সমস্ত তত্ত্ব বর্ত্তমান। সুতরাং ব্যষ্টিতত্ত্ব সমষ্টিতত্ত্বের শুধু অংশ নহে, ব্যষ্টির পূর্ণ পরিণত অবস্থাই সমষ্টি। আমরা ব্যষ্টির স্বরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে যখন তাহার আত্মার কাছে গিয়া পড়ি, তখন আত্মার সর্ব্বগত ভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। এই পরিণতির শেষ অবস্থায় ব্যষ্টির ও সমষ্টির ভেদ রহিত হইয়া যায়। ব্যষ্টির পূর্ণ পরিণতিতে সমষ্টির পূর্ণ পরিণতি এবং সমষ্টির পরিণতিতে ব্যষ্টির পরিণতি। যে সমাজে, যে দেশে এই ব্যষ্টি সমষ্টির পরিণতির মধ্যে কোনও রূপ ভেদভাব না থাকিয়া একে অন্যের চরম উন্নতির সহায় হয়, সেই সমাজকে বা দেশকে আমরা আদর্শ সমাজ বা দেশ বলিয়া গণ্য করিব। প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়াছেন, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত ; নেতি নেতি সাধনার ফলে আত্মা যখন স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইয়া আত্মার সর্ব্বগত ভাব উপলব্ধি করে তখন তাহার নিকট আর ব্যষ্টি-সমষ্টিজনিত কোন ভেদভাব বাকি থাকে না। তখন তাহার নিজের ঐশ্বর্য্য, নিজের শক্তি, নিজের শান্তি বলিয়া আর পৃথক কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তখন যে সকলের পরিণতিতেই তাহার পরিণতি, সকলের শান্তিতেই তাহার শান্তি, সকলের আনন্দেই তাহার আনন্দ। এই ভাব উপলব্ধির জন্য ব্যষ্টি জীবনের দরকার সাধন-ভজন। গোড়ার সাধন-ভজনের মধ্যে এমন কোন জিনিষ থাকা উচিত নয় যাহা তাহার পরমপদপ্রাপ্তির বিঘ্ন হইতে পারে।

ব্যষ্টি সমষ্টিতত্ত্বের ভিতরে প্রত্যেক ব্যষ্টিতে সমষ্টি পূর্ণভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্যষ্টির পূর্ণ সমষ্টিতে পরিণত হইবার যোগ্যতা আছে। এই

ব্যষ্টিকে সমষ্টির অংশ বলা যায় না, প্রতিবিম্বিত বলা যায় না, কারণ নিরংশের অংশ কি করিয়া হইবে? পূর্ণের প্রতিবিম্ব কোথায় গিয়া পড়িবে? পূর্ণের বাহিরে স্থান আছে কি? পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের তাহাতে অপূর্ব্ব সমন্বয় থাকার দরুণ সব অসম্ভবই তাহাতে সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণ পুরুষের মুখ, নাসিকা প্রভৃতি থাকা এবং একাকার রজ্জুতে সর্প কল্পনা, অচিন্ত্যলীলা রহস্যের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হয়। অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি করার অর্থ ই, সৃষ্টি-পরিণাম বা বিবর্ত্তন। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু কাহারও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ব্যষ্টি-সমষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও সম্বন্ধ না জানার ফলেই যে আজ-কাল জগতে এত অশান্তি আসিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমষ্টির প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া তাহাকে দেশ-বিশেষে, জাতি-বিশেষে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার উন্নতির জন্য আমরা অন্য জাতির, অন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। আমরা সমস্ত মানব জাতির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র জাতিতে নিজকে সীমাবদ্ধ করিয়া অপর জাতির অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছি। তারপরে ব্যষ্টির পক্ষে ব্যষ্টির প্রকৃত স্বরূপ না জানার ফলে কিসে তাহার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ না জানার ফলে আমরা অনেক সময় ব্যষ্টির কল্যাণ করিতে গিয়া সমাজের, দেশের সমষ্টির অকল্যাণ সাধন করিতে লজ্জা বোধ করি না এবং অনেক সময় সমাজের কল্যাণ করিতে গিয়া ব্যষ্টির জীবনকে ঘৃণা করিতে বসি, ব্যষ্টির উন্নতিতে বাধা দি, ব্যষ্টির স্বার্থ নষ্ট করিতে বসি। যে সমাজে, যে দেশে ব্যষ্টির পূর্ণ পরিণতি লাভে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সে সমাজ আদর্শ সমাজ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। আমাদের নেতাদের ভিতরে অনেক

সময় স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠার মোহ, নিজ সুখস্পৃহার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। আদর্শ নেতার স্বরূপ আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীর স্বরূপ বর্ণনার ভিতরে অতি সুন্দর ভাবে দেখিতে পাই। আদর্শ সমস্তের প্রতিনিধি। তাঁহার রূপটি হইয়াছে সমস্ত দেবতাদের সমস্ত জীবের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যেরই সার অংশ লইয়া। তাঁহার শক্তি হইয়াছে সমস্ত দেবতাদের শক্তির সমষ্টি। সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য আনন্দের একৈকস্থ ঘনীভূত মূর্ত্তি হইয়াছে তাঁহার স্বরূপ। তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কা মমাপরা? আমা হইতে ভিন্ন কেহ নাই, কেহ থাকিতে পারে না, আমি সমস্তের প্রতিনিধি; সমস্ত জগৎ জীবের সম্পত্তি আমার সম্পত্তি, সমস্ত জীবের শক্তি আমার শক্তি, সমস্ত জীবের জ্ঞানই আমার জ্ঞান, সমস্ত জীবের শান্তিতেই আমার শান্তি। তিনি তাঁহার নিজের মতের সঙ্গে মিলিল না বলিয়া কাহাকেও বাদ দিতে প্রস্তুত নন। এইরূপ আদর্শ জীবনেই আমরা ভগবানের সমষ্টিগত মূর্ত্তির আভাস পাই। এই সমষ্টি কোন ব্যষ্টির প্রতিবন্ধক না হইয়া উন্নতির সহায়। এইজন্য মহাভারতকার আদর্শ পুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্বার্থো যস্য পরার্থঃ স এব পুমান্ একঃ স তামগ্রণী।" আদর্শ মহাপুরুষে, স্বার্থ-পরার্থের ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কোনও ব্যক্তিকে বাদ দিলে যে আর সমষ্টির সমষ্টিত্ব থাকে না। আমরা এই মূর্ত্তির ভিতরে জগন্মাতার বেশ একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। আর্য্য ঋষিগণ দেশের অশান্তি দূর করিবার জন্য এই মূর্ত্তির শরণাগত হইতেন। মনে হয়, এই দিকে দৃষ্টি থাকিলে বর্ত্তমান সময়কার সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, রাজতন্ত্রবাদ লইয়া এতটা বিবাদ দেখা যাইত না।

ব্যষ্টি সমষ্টির এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই ছিল হিন্দুদের ব্যষ্টি সমষ্টি (ব্যস্ত-সমস্ত) হবন। এই সমষ্টিতে ব্যষ্টিকে আহুতি দেওয়ার জন্য ব্যষ্টির পূর্ণ পরিণতি লাভ, করার প্রয়োজন হইত। রামানুজের নারায়ণ মূর্ত্তি, গীতায় বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম তত্ত্ব এই সমষ্টিতত্ত্বের আভাস দান করেন। ইহা ছিল বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বের সার রহস্য। এই সমষ্টির ভিতরে প্রত্যেক ব্যষ্টি তাহার পূর্ণ পরিণতির এবং তৎপ্রাপ্তির আভাস সুন্দরভাবে দেখিতে পান। ভগবান শঙ্কর ইহার উপরে আবার পুরুষ-তত্ত্বের স্বগতভেদ দূর করিয়া একটি নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্বে পৌছিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে সে নির্ব্বিশেষতত্ত্ব শক্তিমানের পূর্ণসামরস্য ব্যতীত অপর কিছুই নহে। হিন্দুর সমস্ত পূজা তত্ত্ব, সাধন রহস্য এই সমষ্টিতত্ত্ব লইয়া। তাহার ঈশ্বর যে পূর্ণ বিকশিত সমষ্টি-তত্ত্ব, সমস্ত মন্ত্রের রহস্য সেখানে তৎ ও ত্বং-এর স্বরূপ সম্বন্ধ ও মিলন লইয়া।

এই সমষ্টিতত্ত্বের দিকেই ছিল প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। পূর্ণতা প্রাপ্ত সমষ্টিতত্ত্বই ছিল তাহাদের ইষ্ট অভীপ্সিত, প্রার্থিত আরাধ্য বস্তু বা উপাস্য ঈশ্বর। ইনিই ছিলেন তাহাদের সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ইনিই ছিলেন তাহাদের আনন্দরূপম্ অমৃতম্ তত্ত্ব। নিজের শান্ত, শিব অদ্বৈতস্বরূপ লাভ করাই ছিল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমষ্টিগত সমরস ইষ্টতত্ত্বে কেহ কখনও কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন না। ইনি ছিলেন সর্ব্ববিধ বিকারবর্জ্জিত—যাহার আরাধনায় আমাদের সব বিকৃতভাব বিকার দূর হইয়া যাইত। ইনিই ছিলেন জ্ঞান-স্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ—যাঁহার আলোকে ঋষিগণ সব সত্যাসত্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। তিনিই ছিলেন গভীরতায়

(in intensity) অনন্ত, যাঁহার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই সেই সারতত্ত্ব, আবার তিনিই ছিলেন ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী (in extensity) যাহা হইতে কেহ কখনও বাদ যায় নাই।

দীক্ষার সময় আমাদের এই ইষ্টতত্ত্ব নির্ণীত হইত, ইনিই হইয়া পড়িতেন আমাদের জীবনের সারতত্ত্ব-প্রধান লক্ষ্য-আরাধ্য বস্তু। এই ইষ্টতত্ত্বই যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমষ্টিগত মূর্ত্তি, যাহাকে চণ্ডী একৈকস্থা মূর্ত্তি (নারী), গীতা পুরুষোত্তম তত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি ছিলেন এই পুরুষোত্তমের অবতার, তাই তাহারা সমষ্টির কল্যাণের জন্য পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেন। জীবের দুঃখে তাঁহাদের হিয়া বিদরিয়া যাইত। বর্ত্তমান Body Politics-এর সারতত্ত্ব তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন। এক অঙ্গের (ব্যষ্টি দেহের) ক্ষত বা ব্যাধি যে সমষ্টি দেহকে সমষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তোলে। তাঁহারা প্রচার করিতেন ত্যাগ ধর্ম্ম, তাঁহাদের যাহা কিছু এমন কি দেহ পর্য্যন্ত জীবের হিতে উৎসর্গ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্ত্তমান যুগে সকলে মানিতে বাধ্য যে, যে জাতি সমষ্টির জন্য যতটা ত্যাগ করিতে সমর্থ সে জাতি তত উন্নত। ত্যাগের মহিমা ভুলিয় গিয়াই আজ আমরা পরাধীন, পর পদানত। পুরুষোত্তমই যে সব বিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ, সকলের সমৃদ্ধিতে যাঁহার সমৃদ্ধি, সকলের ঐশ্বর্য্যে যাঁহার ঐশ্বর্য্য, সকলের জ্ঞানে যাঁহার জ্ঞান, সকলের উন্নতিতে যাঁহার উন্নতি, সকলের আনন্দে যাঁহার আনন্দ, সকলের শান্তিতে যাঁহার শান্তি। অর্থাৎ যিনি আমাদের সকল ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-মাধুর্য্যের—সকল জ্ঞান প্রেম-আনন্দের মূল প্রস্রবণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সমষ্টিভাবের দিকে তাঁহাদের কতটা দৃষ্টি ছিল। “নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বমূর্ত্তে”, বিশ্বরূপ

বিশ্বনাথ বিশ্বজীব বিগ্রহম্” বলিয়া করিতে হইত তাঁহাকে প্রণাম। “বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি”, “নিত্য সর্ব্বগত” বলিয়া হইত তাঁহার অনুভূতি লাভ, “মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা” বলিয়া সর্ব্বজীবের ভিতর দিয়া করা হইত তাঁহার সেবা। সর্ব্বগকে (সমষ্টিভূত পরমাত্মাকে) সর্ব্বতঃ (সকলের ভিতর দিয়া) না পাইয়া তাঁহারা যে কখনও নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না। “যত্র নারী তত্র গৌরী—যত্র জীব তত্র শিব”, “জীব শিবদেহ” প্রভৃতি কত উন্নত আদর্শ তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতি পরোপকার মানিতেন না—কারণ কাহাকেও যে তাঁহারা পর মনে করিতেন না—সকলেই যে তাঁহার নিকট তাঁহার প্রিয়তমের লীলা-স্বীকৃত বিগ্রহ। জীবের দুঃখে তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। জীবের দুঃখ যে তখন তাঁহাদের হইত নিজেদেরই দুঃখ। জীবের সেবাই যে ছিল তাঁহাদের নিকট শিবের সেবা—ভগবানের পূজা জীবনের লক্ষ্য। এই আদর্শ ছিল একদিন তাঁহাদের জীবনগত সত্য—এই আদর্শ ছিল দীক্ষার মন্ত্র—তাঁহাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া তখন এই আদর্শ প্রচারিত হইত। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্য। তৎ শব্দে সেই সমষ্টিগত চরম সারতত্ত্ব এবং ত্বং শব্দে ব্যষ্টিগত কর্ত্তা-ভোক্তা ভাবে পূর্ণ জীবাত্মা। ত্বং যে তৎ ছাড়া আর কিছুই নয়, উভয়ের মধ্যে যে রহিয়াছে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা তখন অনুভবে আসিত। এই ইষ্টের সাধনাই ছিল তাঁহাদের সাধন-ভজনের লক্ষ্য। কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, যীশুকে আমরা এই আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ মনে করিতে শিক্ষা লাভ করি। এই ইষ্টের ধ্যানে তাঁহারা সমাহিত, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া তখন সর্ব্বত্র তাঁহারা আপন ইষ্টের সত্তা উপলব্ধি করিতেন। “আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি মনু” আদি বচন তাহার সাক্ষী। নিজের ভিতরে এই সমষ্টি-

ভূত ইষ্টদর্শন করিয়া তাহাদের সব ভেদভাব ঈর্ষ্যাদ্বেষ দ্বৈতভাব দূর হইয়া যাইত। তখন তাঁহারা হইয়া পড়িতেন ব্রহ্মভূত—লাভ করিতেন সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি। তখন তাঁহাদের একমাত্র কাজ থাকিত সচ্চিদানন্দের স্ফুরণ, ভগবদিচ্ছা পূরণ—জীবের প্রকৃত কল্যাণসাধন। এমন কি নিজের আহার বিহার পর্য্যন্ত তখন তাঁহাদের যে পূজায় পরিণত হইয়া যাইত। যজ্ঞেশ্বরের নির্ব্বাচন যজ্ঞেশ্বরের পূজার মধ্যে আমরা এই আদর্শের সন্ধান পাই।

শব্দ-রহস্য

কোন বিষয় জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শব্দতত্ত্ব, শব্দরহস্য জানা একান্ত আবশ্যক। যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বেও সেইজন্য **শব্দ ব্রহ্মতত্ত্ব** সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার মনে হয়। আর্য্য ঋষিগণ সকল তত্ত্বের পিছনে এক মহান সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবজগৎ সেই মহান একেরই বিবর্ত্তন বা পরিণতি মাত্র। সেই মহান এক যখন আনন্দ-প্রাচুর্য্য হেতু লীলার ছলে বহু হন, তখন সেই বহুর প্রতিতত্ত্বে সেই একের ছাপ বা প্রতিবিম্ব পড়ে। এক যেন সকলের ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়া আবার সকলের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যস্ত হন। সেই মহান একস্বরূপে এক থাকিয়াও কারণ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তত্ত্বের ভিতরে ত্রিবিধ রূপ এবং ত্রিবিধ নাম ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। সেই **মূলে একত্বকে** আমরা সাধারণতঃ **পরা** নাম দিয়া থাকি। তিনি **কারণ শরীরে পশ্যন্তী, সূক্ষ্ম শরীরে (মানসিক জগতে) মধ্যমা** এবং **স্থূল জগতে বৈখরী** নামে আত্ম পরিচয় দান করেন। এইজন্য সব শব্দই পরাবস্থায় ব্রহ্মের দ্যোতক, পশ্যন্তী অবস্থায় জীবাত্মা, মধ্যমা অবস্থায় মানসিক ভাব এবং বৈখরী অবস্থায় একটা স্থূল ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। পরাবস্থায় অগ্নি স্বয়ং **ব্রহ্ম**, পশ্যন্তী অবস্থায় **দেবের ভর্গ**— ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মজ্ঞান, সূক্ষ্ম অবস্থায় **প্রাণ বৈশ্বানর** প্রভৃতি এবং স্থূলে আমাদের **চির পরিচিত অগ্নি** শব্দের বাচ্য। এই ভাবে

তীর্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, মনের বিশুদ্ধি এবং ভৌম তীর্থ ভাব প্রকাশ করে। জল বায়ু প্রভৃতি সকল শব্দের মধ্যে আমরা এই চারিটি ভাবের পরিচয় পাই। বেদে অগ্নিকে কখনও পরব্রহ্ম (অগ্নি ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি) কখনও প্রাণাগ্নি, কখনও স্থূল অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শব্দের কোন্ তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহাও চিন্তনীয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের এই দিকে লক্ষ্য না থাকার জন্য আমরা **তাত্ত্বিক কৃষ্ণ** এবং **ঐতিহাসিক কৃষ্ণের** প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসি। কৃষ্ণ তাত্ত্বিক ভাবে অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব, আবার ঐতিহাসিকভাবে বসুদেব-সুত ইত্যাদি। তাত্ত্বিক কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, যাইতে পারেন না ; ঐতিহাসিক কৃষ্ণের মথুরা, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকা গমন অস্বীকার করিবার জো নাই।

যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ভগবৎতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, ইড়া ও সোমতত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া দরকার। ইড়া বাগ্‌দেবী, শব্দব্রহ্ম (Word of God), ব্রহ্ম-জ্ঞান ; আবার ইড়া অম্ভৃণ ঋষির ও মনুর কন্যা, ইড়া যীশুর রক্তমাংস—যজমানের পশুর প্রতীক—পুড়োডাশ। সোম ব্রহ্মজ্ঞান, সহস্রার বিগলিত সুধা—বাহিরে মদ্য বিশেষ। অগ্নির ও সোমের আহরণতত্ত্ব সাধনরাজ্যের গূঢ় রহস্যের পরিচায়ক। যজ্ঞতত্ত্বে এসব রহস্য জানিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন পরা, পশ্যন্তী আদি চারিটি অবস্থা চিন্তনীয়, স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ আদির ভিতরেও এই চারিটি তত্ত্বের রহস্য সেইরূপ চিন্তনীয়।

বেদ

ভগবান একাধারে বিধান এবং বিধাতা। তিনি বিধানের সঙ্গে নিজকে এমন ভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন যে বিধান হইতে বিধাতাকে আর পৃথক করা যায় না। বেদ ভগবদ্বিধান, শ্রীভগবানেরই চিদ্‌বিভূতি। সচ্চিদানন্দ ভগবানের চিদংশ অর্থাৎ জ্ঞান লইয়াই বেদের মহিমা। সুতরাং বিধাতা যেমন নিত্য; তাঁহার বিধানও সেইরূপ নিত্য। ইহারা অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায়, এক অপৃথক, অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বেদের আসল গ্রন্থ প্রকৃতি যাহা ভগবৎ-বিকাশের যন্ত্র, যাহার ভিতর দিয়া ভগবান নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিধাতা যেন প্রকৃতির গায়ে নিজের হাতে অনন্ত বেদ লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাহার দিব্য চোখ আছে সেই বেদ দেখিতে পায়, যাহার দিব্য মন আছে সেই বেদ বুঝিতে পারে, যাহার দিব্য চিত্ত আছে সেই বেদের ধারণা করিতে সমর্থ। সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব, সকর্ণঃ অকর্ণ ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণ ইব ইত্যাদি শ্রুতি এই বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করে। দিব্য চক্ষু পাইলে বেদ দর্শন করা যায়, প্রকৃত ঋষি হইলে—অপরোক্ষদর্শন খুলিয়া গেলে বেদমন্ত্র দেখা যায়। ঋষিগণ ভগবানের নিজ হাতে লেখা বেদমন্ত্র সাধনবলে দর্শন করিয়াছিলেন। ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, তে স্মারকাঃ ন তু কারকাঃ। মাধ্যাকর্ষণ চিরকাল ছিল, নিউটন প্রভৃতি তাহার

আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। বেদও সেইরূপ নিত্য, যুগে যুগে ঋষিগণ সেই বেদমন্ত্র দর্শন করেন মাত্র।

প্রাচীন আদর্শ স্থানীয় ঋষিগণ যেসব বেদমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা শিষ্য পরম্পরার মধ্যে প্রচার হইতে চলিল। পববর্ত্তী যুগে অনেক ঋষিকল্প মহাত্মা কতকগুলি মন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহাও আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মন্ত্রগুলির সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে চলিল, পরে এমন একটা সময় আসিল যে তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের অভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার ফলে ভগবান বেদব্যাস বৈদিক মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি প্রাচীন বিদ্যার নাম ছিল বেদ। ইহা ছিল বৈদিক ঋষিদের নিজস্ব সাহিত্য; ইহা ক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বেদপন্থিগণ আপনাদিগকে দ্বিজ বলিতেন, অপর সকলের সাধারণ নাম ছিল শূদ্র। বহু অনার্য্য ও ম্লেচ্ছগণও যে দ্বিজ সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই বিদ্যা লাভ করিবার জন্য ছাত্রগণ উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট গমন করিতেন। এই ক্রিয়ার নাম ছিল উপনয়ন এবং উপযুক্ত বিদ্যালাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার নাম ছিল সমাবর্ত্তন। উপযুক্ত রূপে বেদ বা বেদের শাখা অধ্যয়ন না করিয়া কাহারও গৃহস্থাশ্রমে, আর্য্য সমাজে প্রবেশের অধিকার লাভ হইত না। কতকগুলি নিয়মের ভিতর দিয়া মানুষকে আদর্শ জীবনলাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করা হইত, সেইগুলির নাম ছিল সংস্কার। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রধান সংস্কার ছিল বিবাহ। গৃহস্থাশ্রমের স্থান ছিল সর্ব্বোপরি। মানবকে বিবাহ করিয়া এই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। সমাজে মূর্খের স্থান ছিল

না। যে সমাজে অশিক্ষিতের স্থান ছিল না, যে সমাজে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সুন্দররূপে পরিচালিত হইত তাহার নাম ছিল দ্বিজসমাজ। সামাজিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য বিবাহ ছিল একটা প্রধান কাজ। বংশ রক্ষা করা, ধর্ম্ম রক্ষা করা, পিণ্ড অবিচ্ছেদ রাখার দিকে তাঁহাদের ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই দ্বিজগণ সমাজে আপন আপন অধিকার অনুসারে বিভিন্ন স্থান দখল করিতেন। কেহ কেহ বিদ্যা-দান করিতেন, কেহ রাজকার্য্য চালাইতেন, কেহ কৃষি বা গোরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন; অথচ ইহারা সকলেই ছিলেন দ্বিজ। সমাজস্থিতির জন্য ও লোকস্থিতির জন্য জীবনে পূর্ণ পরিণতি ও শান্তিলাভের জন্য যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল যজ্ঞ। বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এই যজ্ঞতত্ত্বের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। উভয়ই ছিল অপৌরুষেয় এবং নিত্য। ইহাদের প্রচারক যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ছিলেন ঋষি। মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যার সাধারণ নাম ছিল ত্রয়ী। ঋক্ মন্ত্রগুলি পদ্যে ছন্দে বাঁধা ছিল, যজুর্মন্ত্রগুলি বাঁধা ছিল গদ্যে; সামমন্ত্র বলিয়া কোন পৃথক মন্ত্র ছিল না। ঋক্‌মন্ত্র সুর দিয়া গীত হইলেই উহা সাম নামে পরিচিত হইত। মন্ত্র ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও সংহিতা ছিল চারিখানা। সংহিতা সংগ্রহ। ঋক্‌মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্-সংহিতা, যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া যজুঃসংহিতা এবং যজ্ঞের সময়কাল লইয়া এবং গানগুলি সংগ্রহ করিয়া নাম ধরিত সামসংহিতা। অপর কতগুলি মন্ত্র থাকিত যাহা যজ্ঞে লাগিত না, যাহা শান্তিস্বস্ত্যয়নে ব্যবহৃত হইত, সেইসব লইয়া ছিল অথর্ব্বসংহিতা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখান হইয়াছে কোন্ মন্ত্রের কি সার্থকতা, কোন্ মন্ত্র কোথায় কি জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কোন্ মন্ত্রের

কি তাৎপর্য্য ও কিরূপ বিনিয়োগ। সমস্ত বেদপন্থী ব্রাহ্মণগ্রন্থ মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের সমাজ ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদ-বাক্য বলিয়া প্রায় সকলে মানিতেন। উহা ছিল স্বতঃপ্রমাণ। ক্রমে মতভেদ দেখা দিল এবং ইহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কালক্রমে কর্ম্ম মীমাংসা ও দর্শনশাস্ত্র আসিয়া দেখা দিল। বলিতে গেলে এখান হইতেই সমাজের পতন আরম্ভ হইল।

বেদকে ইষ্টমূর্ত্তি জ্ঞানে পূজা করা হইত, অতি যত্নে রক্ষা করা হইত। শব্দ, গুণ, অন্বয়, ছন্দ যাহাতে স্থানচ্যুত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঘরে ঘরে রক্ষার ব্যবস্থা পাঠের মাহাত্ম্য প্রশংসিত ছিল। কার্য্যজগতের কর্ম্মকাণ্ডের দিকে বেশী দৃষ্টি থাকিলেও লক্ষ্য ছিল মূল কারণ সত্তার দিকে।

বেদ সকলের জন্য। বিশ্ব জননীর ন্যায সকল সন্তানের প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ও সমান স্নেহ। সৃষ্টির বাসনা লইযা এক যখন বহু হইতে বসিলেন তখন তিনি এমন ভাবে বহু হইয়া বসিলেন যে এখানে দুইটি জীব, দুইটি গাছপাতা এমন কি দুইটি বালুকা কণার মধ্যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে একতা বা পূর্ণসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। বেদের যে কাহাকেও বাদ দিলে চলে না, বেদ কাহাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন না, বেদের মধ্যে সকলের জন্যই স্থান নির্দ্ধারিত আছে; বেদ চরম নিম্নাধিকারীকেও অতি স্নেহের সহিত হাত ধরিয়া সর্ব্বোচ্চস্তরে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। পৃথিবীতে নানা রকমের লোক আছে, এখানে নর আছে, পিশাচ আছে, দেবতাও আছে। বেদ সুতরাং পিশাচ, নর ও দেবতা সকলেরই কল্যাণ সাধনে তৎপর। বেদ কি ভাবে, কি সুন্দর কৌশলে নরপিশাচদের পর্য্যন্ত হাত ধরিয়া তাহাদিগকে নরের ভূমির মধ্য দিয়া দেব-

ভূমিতে লইয়া যাইতে ব্যস্ত তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বেদ স্নেহময়ী মাতার ন্যায় নিম্নস্তরের সন্তানগুলিকে আদর করিয়া বলেন,—তুমি রূপ দেখিতে ভালবাস, আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া, আরও সুন্দর করিয়া রূপ ভোগ করিবার কৌশল বলিয়া দিব। আমি তোমাকে এমন সুন্দর করিয়া পূর্ণভাবে দেখিতে শিক্ষা দিব যে তুমি রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া যাইবে। যে খাইতে ভালবাসে তাহাকে বলেন, তুমি খাইতে ভালবাস, আমি তোমাকে খুব ভাল খাবার দিব। যাহাতে প্রাণ ভরিয়া খুব বেশী করিয়া খাইতে পার এবং বেশী খাইয়া হজম করিতে পার আমি তোমাকে তাহার কৌশল বলিয়া দিব। ভোগীকে ভোগের উপকরণ ও ভোগের কৌশল, রোগীকে স্বাস্থ্যের সমাচার ও স্বাস্থ্যলাভের উপায়, যোগীকে যোগের প্রণালী—সিদ্ধির প্রলোভন, জ্ঞানীকে জ্ঞানের পথ, প্রেমীকে প্রকৃত প্রেমতত্ত্ব, ভক্তকে ভক্তিরহস্য দেখাইয়া মুগ্ধ করেন। যাহারা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগ্য দ্রব্যের মধ্য দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে, তাহাদিগকে প্রকৃত আনন্দের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। তাহাদের জন্য সাধনার দ্রব্য হয় যাবতীয় রুচিকর সুস্বাদু ভোগ্য পদার্থ, তাহাদের দেবতা নির্দ্ধারিত হয় মনুষ্যোচিত গুণ-বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভোগরত সুখ-নিমগ্ন দেবতাবৃন্দ। ইহাদের জন্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। দ্রব্যগুলির সংগ্রহের শোধনের আহুতির মন্ত্রগুলির মধ্যে অতি কৌশলে এমন একটা ভাব নিহিত রাখা হইয়াছে, যাহার ফলে সাধকের দৃষ্টি আপনা হইতে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে আকৃষ্ট হয়; ভিতরকার সাধন রহস্যগুলি আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইয়া সাধককে ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া জ্ঞানাত্মক যজ্ঞের দিকে আকর্ষণ করে।

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের উপকরণগুলির মধ্যে আমরা আমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি দেখিতে পাই. সেগুলি যাহাতে সুন্দরভাবে সংগৃহীত হয়, অক্ষত শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার ফলে সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপক হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাহার পরে সমাজতন্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্যগুলি অর্থাৎ আমরা সকলে কিভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারি একের কল্যাণ কিভাবে অপরের কল্যাণের উপর নির্ভর করে, সকলকে সাহায্য করা, সকলের কল্যাণ সাধন করা. সকলকে সুখী করা আমাদের আপন কল্যাণ সাধন এবং সুখ লাভের জন্য কত দরকার. তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের ভিতরে একটা একতা উপলব্ধির মৈত্রীভাব-স্থাপনের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞের ইড়া ভক্ষণাদি অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি ইহার প্রধান সাক্ষী। দেবতারা আমাদের ভাগ্য বিধাতা, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য জ্ঞান ও আনন্দের কিভাবে দাতা তাহা দেখাইয়া দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করার জন্য লুব্ধ করা হয় এবং আস্তে আস্তে দেবতাদের স্বরূপবর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের মৌলিক একত্ব দেখাইয়া দিয়া আমাদের মধ্যে একটা একতা আনয়নের চেষ্টার ব্যবস্থা দেখা যায়। পদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে অর্থ; শব্দ অজ্ঞাতসারে তাহার অর্থের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে, অর্থও শব্দের ভিতর দিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করে; তাই দ্রব্যাত্মক যজ্ঞও আস্তে আস্তে আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে একটা আনন্দ আস্বাদনের মধ্য দিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়।

বেদ কিভাবে নরপিশাচদের অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে নরের ভূমিতে, তারপর সেই নরকে দেবভূমিতে লইয়া যাইতে সচেষ্ট তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। মানুষের মধ্যে যেমন খারাপ লোক, সাধারণ লোক ও উন্নত লোকাদি ভেদ দেখা যায় কর্ম্মের মধ্যেও তেমনি কুকর্ম্ম,

সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশী; উত্তম লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তাই কি করিয়া খারাপ মানুষকে ভুলাইয়া প্রলোভন দেখাইয়া আস্তে আস্তে তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কুকর্ম্ম হইতে সুকর্ম্মে লইয়া যাওয়া যায় বেদ তাহার নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বদ্ধ মাতাল পুত্রকেও যে মা তাড়াইয়া দিতে পারেন, না; কৌশলে সর্ব্বদা মদ খাইতে না দিয়া নানা ছলে তাহার মদ খাওয়ার প্রবৃত্তিকে একটু সংযত করিয়া, এমন কি মদ খাওয়াকে সাধনার অঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে এমন ভাবে মদ খাইতে শিক্ষা দেন, যে মদে খরচ কম, যে মদে নেশা ছুটিবার ভয় নাই। যে সর্ব্বদা মাংস খাইত তাহাকে আস্তে আস্তে একটা বিধানের মধ্যে লইয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সামনে হিংসার পরিণামের একটা চিত্র স্থাপন করিয়া তাহাকে অহিংসুক করিয়া তোলা হইত। তাই বলা হয়, বেদের ভিতরে, তন্ত্রের ভিতরে হিংসার ভাব আসিয়াছিল, মানুষের চিত্ত হইতে আস্তে আস্তে হিংসার ভাব দূর করিয়া দিবার জন্য।

১। সমস্ত সুখ যে দেবতার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং দেবতারা যে একটা লোভনীয় বস্তু তাহা প্রথমে দেখান হইত। ইহার ফলে আমরা স্বভাবতঃ দেবতাকে পাইতে, দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে, দেবতার মত হইয়া যাইতে লুব্ধ হইয়া পড়ি।

২। দেবতাদের বাসস্থান যে স্বর্গ, সেখানে সব রকমের ভোগের উপকরণ বর্ত্তমান, তত্রস্থ দেবতাদের ভোগ সামর্থ্যও অতুলনীয়। ইহার ফলে সাধারণ মানুষ সেখানে যাইতে লুব্ধ হইত, সেখানে যে যাওয়া যায়,

সেখানে গিয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম আনন্দ ভোগ করা যায়, তাহারও লোভ দেখান হইয়াছে।

৩। প্রত্যেক দেবতার ভিতরে দুইটি তত্ত্ব নিহিত আছে। বাহিরের তত্ত্ব অপেক্ষা ভিতরের তত্ত্ব বেশী সুন্দর, বেশী রমণীয়, বেশী নিত্য। যত তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, তত তাহাদের ভিতরকার স্বরূপের দিকে বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহাদের কাছে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।

৪। যজ্ঞের যাবতীয় দ্রব্যের, সব তত্ত্বের, সব ভাবের এমন কতগুলি সুন্দর বিশেষণ আছে যাহাতে মানুষের মন আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে, দেবতার প্রকৃত স্বরূপের দিকে ধাবিত না হইয়া পারে না। তত্ত্বগুলি, পদার্থগুলি যে সেই তৎ পদার্থেরই (পরম পদের) বিভিন্ন অনুভব যোগ্য বিকাশ মাত্র, যাহার প্রভাবে তাহার ভিতরকার নিহিত তৎপদার্থ আস্তে আস্তে মানুষের মন তাহার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রতি পদার্থের মধ্যে বিষ্ণুর সেই পরমপদ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার অর্থের, বিভূতির, মূর্ত্তির মহিমার ভিতর দিয়া মানুষকে সেই পরমপদের দিকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালীগুলির ভিতরেও যে উহারা ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যজমান আদির মন অজ্ঞাতসারে তাহার ভিতরকার সারতত্ত্বের দিকে যাইবার সুযোগ পায়। যজ্ঞের ভিতরে এমন কতগুলি সংযমের ব্যাপার নিহিত আছে যাহার ফলে আমাদের চিত্ত অজ্ঞাতসারে লুব্ধ হইয়া ক্রমে ভাবনাত্মকের মধ্য দিয়া কেবলাত্মক যজ্ঞের দিকে আমাদিগকে লইয়া যায়। বেদ দেবতাতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত। ভালভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই দেবতা ও যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে জগতের সব তত্ত্ব, সাধনভজনের সব রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বেদকে

যাঁহারা শুধু বাহির হইতে দেখেন তাঁহাদের অনেকে মনে করেন, বেদ কেবল কতগুলি দেবতাতত্ত্বের, যজ্ঞতত্ত্বের সকাম প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। তাই অনেক পণ্ডিতদের মুখ হইতেও বেদ পড়িয়া একটা বিরক্তির ভাবের আভাস শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বেদ অধ্যয়ন করেন, বেদের সাধন প্রণালীর সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহারা বেদের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈদিক যুগের লোকগুলি ছিলেন অতি সরল, স্বভাবের উলঙ্গ শিশুর ন্যায়। তাঁহাদের কথা, ভাব ও কাজের মধ্যে কোনরূপ একটা পার্থক্য লক্ষিত হইত না। আজকালকার লোকদের মত তাঁহারা ভিতরকার মলিনতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য শঠতা কুটিলতা ও কপটতার আশ্রয় লইতে শেখেন নাই। মানুষ কি করিয়া কথায় পণ্ডিত, সভায় শিক্ষিত, কাজে নরপিশাচ হইতে পারে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কথায় জ্ঞানী হইয়া শকুনের ন্যায় ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইতে, অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাগাড়ের দিকে নজর রাখিতে মামলা মোকর্দ্দমা ঝগড়া-বিবাদ লইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে তাঁহারা তৎপর ছিলেন না। যাহারা মুখে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলিয়া মুখে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্যস্ত, অথচ ব্যবহার ক্ষেত্রে ধনাগমের জন্য সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনরূপ অন্যায় কাজ করিতে দ্বিধা বোধ করে না তাহাদের পক্ষে প্রাচীন বৈদিক যুগের সাধন-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। নিজে জহুরী না হইলে খাঁটি জহরের মূল্য বোঝা যায় না। অসতী সতীর মহিমা, অসাধু সাধুর মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? যাহাদের সবকিছু চাই, অভাবের তাড়নায় যাহারা পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, অভাব পূরণের জন্য যাহারা কোন অন্যায় কাজ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তাহারা যখন শাস্ত্রে সরল সাধকদের মুখে ধনং দেহি, জনং দেহি, রূপং দেহি প্রভৃতি

প্রার্থনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠে তখন বাস্তবিকই হাস্য সম্বরণ করা যায় না। যাহাদের খাবার সময় একবার মাংস না জুটিলে অস্থির হইয়া উঠে তাহাদের মুখে বলিদানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা ততটা শোভা পায় না।

বৈদিক ঋষিদের এবং তাঁহাদের শিষ্যদের অভাব ছিল খুবই অল্প। তাঁহারা ছিলেন স্বভাবে স্থিত নিত্যতৃপ্ত। তাঁহারা ছলে, বলে, কৌশলে অভাব পূরণ করিতে জানিতেন না। অহংকার দূর হওয়ার ফলে তাঁহারা জানিতেন, ভগবান কাহারও কোন অভাব অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহাদের শির কৃতজ্ঞতাভরে ভগবানের নিকট নত থাকিত। তাই তাঁহাদের প্রার্থনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইত ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অপূর্ব্ব রহস্য। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন; তারপরে যখন সাধনার ফলে তাঁহারা দেখিতেন যে কিছু চাহিবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, বাহিরে চাহিবার আর কোন প্রয়োজন নাই, তখন তাঁহাদের পূর্ব্বাভ্যাসের ফলে ধনং দেহি প্রভৃতি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে হইত, হে ভগবান, তুমিই যে সব ধন দিতেছ তাহা যেন আমরা মনে রাখিতে পারি। আমাদের অভাবের কূল নাই, চাওয়ার বিরাম নাই; অথচ আমরা দেখাইতে চাই যে আমরা কত নিষ্কাম। আমরা চাই মানুষের নিকট, বিশ্বাস করি নিজের বলবুদ্ধি, ছল-চাতুরীর উপর। ঋষি বালকেরা ছিলেন বিশ্বাসী ভক্ত, তাঁহারা ভিতরে অনুভব করিতেন ভগবৎকৃপা, নির্ভর করিতেন ভগবৎকৃপার উপর, অভাব অভিযোগ জানাইতেন ভগবানের নিকট; প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সব অভাব পূর্ণ হইয়া যাইত। এই নির্ভরতার ফলে আপনা হইতে একটা নিষ্কাম ভাব জাগিয়া উঠিত। তাই আমরা বেদের সকাম ভাব দেখিয়াও ভয় পাই না। বিরক্ত না

হইয়া বরং সরল শিশুর ন্যায় ভগবানের উপরে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি। তারপরে বেদের উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ভিতরে ভাবনাত্মক নিষ্কাম যজ্ঞের আভাস পাইয়া অসীম তৃপ্তি লাভ করি। বেদ সম্বন্ধে লোকের ভুল ধাবণাটা দূর করিয়া যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সকলকে আকৃষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে দেশ কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের বাহিরের কাজগুলির ভিতরে যে একটু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এবং সেই পরিবর্ত্তন আসা যে সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাই যজ্ঞকে আমরা একালের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে আমাদের অভাব ছিল অল্প, তাহাও অতি সহজেই পূর্ণ হইয়া যাইত, তাই আমাদের সময় ছিল যথেষ্ট। এখন আমাদের সকল অভাব পূরণ করা দূরে থাকুক, শুধু অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াই আমরা উঠিতে পারি না; সেই চেষ্টায়ই আমাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়। তাই আমরা এমনভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে চাই, যাহাতে আমাদের কোনরূপ বেগ পাইতে না হয়; বেশী সময়ও নষ্ট না হয়।

আর একটা প্রধান কথা এই যে, প্রাচীনকালে ভারতে ধর্ম্মসাধনা উপাসনা ছিল জীবনগত। জীবনের সব কাজকে পূজায়—যজ্ঞে পরিণত করা ছিল আমাদের প্রধান সাধনা। সব কাজকে পূজায়, সব চিন্তাকে ধ্যানে পরিণত করার দিকে ছিল আমাদের প্রধান দৃষ্টি। "পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা", "যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তবপূজনম্", 'নগর ফেরা মনে কর, প্রদক্ষিণ কর শ্যামা মারে', 'আহার করা মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মারে', ইত্যাদি উক্তি তাহার সাক্ষী। জগৎ ছিল বিশ্বনাথের মন্দির, জীব ছিল পোষাক পরা শিব বা ভগবানের জীয়ন্ত

বিগ্রহ, স্বামী-স্ত্রী ছিল ভগবান বা ভগবতীর, ছেলেমেয়েরা ছিল বাল গোপালের ও কুমারীর, মা বাপ ছিল অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের জীব ছিল শিবের জীয়ন্ত বিগ্রহ। ইহাদের সেবার ভিতর দিযা আমাদের পূজা সহজ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হইয়া যাইত। ইহাদের স্নান কবান, আহার করান, এমন কি নিজের আহার করা পর্য্যন্ত ছিল উপচার সমর্পণের অন্তর্গত। আমরা ছিলাম আমাদের প্রিয় জীবগুলিকে ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহরূপে পরিণত করিতে ব্যস্ত; আমাদের এই ভালবাসাকে শুদ্ধ ও পূর্ণ করিয়া ভগবৎ প্রেমে পরিণত করাই ছিল আমাদের ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। সেই জন্যই আমাদের বৈদিক যুগে এতগুলি দেবমূর্ত্তির বাহুল্য বা অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের প্রাখর্য্য লক্ষিত হইত না। আমাদের সব কাজই যে তখন যজ্ঞে পরিণত হইয়া যাইত। আমাদের ভিতর হইতে প্রকৃতির সব তত্ত্বের ভিতর হইতে দেবতা রহস্য সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া বাহির হইত। তাই বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্য দিয়া দেবতাতত্ত্বের উপলব্ধি যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলির ভিতর দিযা যজ্ঞতত্ত্বের স্ফুবণের রহস্য বেদে এতটা প্রাচুর্য্য লাভ করিয়াছে। এই জন্য বেদে আমাদেব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে যজ্ঞে পবিণত ক‍িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহারা সব জীবের, সব তত্ত্বের, সব দৃশ্যেব ভিতর দিযা ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা মূর্ত্তি পূজক, অচেতন প্রকৃতির উপাসক বলিতেও দ্বিধা বোধ করি না। যাঁহারা প্রহ্লাদের মত প্রস্তর স্তম্ভের ভিতর দিয়াও ভগবানকে আবির্ভূত করাইতে সুদক্ষ ছিলেন তাঁহাদের সাধনা একটা তামসিক প্র‍র পূজায় সীমাবদ্ধ বলিতে আমরা কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করি না। অথচ আমরা বিশ্বাস করি প্রতি পরমাণুতে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে—every

atom contains infinite amount of energy in it in a latent form. আমাদের এই জাতীয় সংস্কার, এই জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা লইয়া বেদের গূঢ় রহস্য বেদের যজ্ঞতত্ত্ব—দেবতাতত্ত্ব বুঝিয়া উঠা যে কঠিন এমন কি অসম্ভব এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বেদের শ্রুতিগুলি কর্ম্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক। কর্ম্মাত্মক শ্রুতিগুলি দেবতা ও যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও অবশেষে জ্ঞানে লইয়া যাইতে তৎপর। দেবতা তত্ত্ব সেই এক ব্রহ্মের মহিমাপ্রকাশ, বিভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্য্য জগতের বহুত্বের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বহুত্বের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া বহুত্বের কার্য্য জগতের মূল কারণের দিকে, একত্বের দিকে লইয়া যাওয়াই দেবতাতত্ত্বের দেবপূজার মূল উদ্দেশ্য। যজ্ঞতত্ত্ব ও সেইরূপ কর্ম্মরহস্যের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, এমনকি তামসিক জীবকেও ক্রমে সাত্ত্বিক নিষ্কাম ভূমিতে লইয়া গিয়া, কর্ম্ম কিরূপে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির, ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হয়, ভগবৎকার্য্যে পরিণত হয় তাহারই রহস্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। সমস্ত বেদ জগৎ-ব্যাপারের গূঢ় রহস্য দেখাইয়া জগৎকে ভোগ করিবার সামর্থ্য দিয়া জগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে ব্যস্ত। সেখানে গিয়া ভগবানকে দেখিয়া, পাইয়া, তাঁহার লীলায় কি করিয়া সহায় হওয়া যায়, সেই শিক্ষা দান করেন। বেদের মহিমা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এই বেদের সারাংশ লইয়া উপনিষদ্, যাহা অবলম্বনে হিন্দুদের ষড়দর্শন এবং গীতা তন্ত্র প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে।

—*—

ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগতত্ত্ব

বেদের রহস্য বুঝিতে হইলে ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগতত্ত্ব এবং মন্ত্রতন্ত্র ও যন্ত্ররহস্য সম্বন্ধে একটু অনুভূতি থাকা প্রয়োজন।

১। **ঋষি**—ঋষি শব্দ ঋষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋষ্ অপরোক্ষ দর্শনে। যাঁহাদের চিত্ত সংযত, শুদ্ধ ও শান্ত হইবার ফলে অপরোক্ষ দর্শন খুলিযা গিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বত্র বৈখরীতত্ত্বের ভিতর দিয়া পরাতত্ত্ব পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষিপদ বাচ্য। ঋষিদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ পরিণত পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের চিত্ত কামনা. বাসনা, আসক্তি, স্বার্থপ্রতিষ্ঠা, কর্ত্তৃত্বাভিমানের ময়লামুক্ত, যাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এক কথায় যাঁহারা সাধনবলে শুদ্ধ ও শান্ত হইযা ভগবানের হাতের একটি যন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন, যাঁহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন খুলিয়া গিয়াছে, ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া যাঁহাদের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই, তাঁহারা ঋষিপদবাচ্য। এই ঋষিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ তে স্মারকাঃ নতু কারকাঃ। অপরোক্ষ দর্শন খুলিয়া যাইবার ফলে স্বপ্রকাশ বৈদিক মন্ত্রগুলি, বেদের সারতত্ত্বগুলি তাঁহাদের চক্ষে প্রতীত হইয়া গিয়াছে। ভগবান কোন্ পদার্থ, কোন্ তত্ত্ব কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা অবগত ছিলেন। কোন্ বীজে কোন্ বৃক্ষ কিভাবে লুক্কায়িত, কোন্ মন্ত্রে কি শক্তি গূঢ়ভাবে নিহিত তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন। কোন জীব কি কাজ করিতে আসিয়াছে, কোন্ রাস্তা

অবলম্বনে তাহার ভগবৎ সন্নিধানে যাইতে হইবে এবং সেই গন্তব্য রাস্তা দিয়া সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা তাঁহারা সুন্দররূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি লয় রহস্যের সব তত্ত্বগুলি অনুভব করিয়াছিলেন ; ভগবানের মনে কি উদ্দেশ্য নিহিত, তিনি কি করিতে চান, সমস্ত জীব জগতের ভিতর দিয়া তাঁহার কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতে চলিয়াছে— এক কথায় সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য তাঁহাদের নিকট সুবিদিত ছিল। তাঁহারা সৃষ্টি অবলম্বনে ভগবানের মন্ত্ররহস্য মননপ্রণালী দেখিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান একাধারে বিধান এবং বিধাতা, ভগবান যেমন নিত্য তাঁহার বিধানগুলিও সেইরূপ নিত্য— অপরিবর্ত্তনীয়। বিধানগুলি পূর্ণ বলিয়া পরিবর্ত্তনের কখনও আবশ্যক হয় না—তাই তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলা হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, তিনি পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন মনে করেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই ভগবৎ-বিধানগুলি এক একটি ভগবানের মননশক্তির পরিচায়ক মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রকৃতির গায়ে লেখা থাকে। যাঁহার দিব্যচক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পান। মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মের কোটি কোটি বৎসর পূর্ণ হইতে বর্ত্তমান ছিল, নিউটন শুধু সেই তত্ত্বের কতটুকু অংশ অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঋষিগণও প্রকৃতির গায়ে অনাদিকাল হইতে লিখিত মন্ত্রগুলি দেখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কর্ত্তা লেখক শ্রীভগবান নিজে ; ঋষিগণ শুধু দ্রষ্টামাত্র। আর্য্য দর্শনশাস্ত্র এই ঋষিবাক্যকে, আর্ষ প্রয়োগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ঋষিদিগের দর্শিত অনুভূত উক্ত বচনগুলি বেদের শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত। বলা বাহুল্য যজ্ঞের মন্ত্রগুলি সেই আর্ষবচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। **ছন্দ** – ছন্দ শব্দের অর্থ কম্পন বা তাল। সমস্ত জগৎ যে প্রাণ ও রয়ির নৃত্য ছন্দ বা তাল হইতে উৎপন্ন তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। শব্দরহস্য এই ছন্দতত্ত্বের মহিমা প্রচারে নিযুক্ত। গ্রীক দেশের music of the sphere এখানে চিন্তনীয়। এক তৎ পদার্থের কম্পনরূপ মাত্রা হইতে তাল হইতে যে পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি তাহার কথাও এখানে মনে হয়। পরমাণুর বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি স্বভাব ও ধর্ম্ম যে এই ছন্দ-তত্ত্বের নৃত্যের উপরে নির্ভর করে তাহাও বৈজ্ঞানিক জগতে সুবিদিত সত্য। যে দ্রব্য যে তালের যে ছন্দের পরিণাম তাহার পরিণতির জন্য এবং তাহার লয় সাধনের জন্য যে তাহার তত্ত্বটি জানা বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এক একটি ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য। ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রগুলির মধ্যেও এক একটি সুন্দর ছন্দ-তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। সেই ছন্দের অনুবর্ত্তন ব্যতীত সেই মন্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সেই মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আমাদের দেহযন্ত্রটিও ছন্দের তালে বিনির্ম্মিত ; ছন্দের তালে তালে পরিচালিত এক একটি বিশেষ ছন্দ, এক একটি বিশেষ মন্ত্র এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করিতে ব্যস্ত। যোগগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদেব বিভিন্ন চক্র-গুলির বিভিন্ন তত্ত্বগুলি এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতেছে। নাদানুসন্ধানতত্ত্ব বৌদ্ধদের স্রোতাপন্ন রহস্য এই ছন্দতত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করে। আমাদের দেহস্থ ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্নার, এমন কি প্রত্যেক স্নায়ুর প্রত্যেক শিরা-প্রশিরার গতিগুলি, মনের প্রত্যেক বৃত্তিগুলি এক একটা নির্দ্দিষ্ট ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতেছে। কোন্ কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেহের এবং মনের কোন্ ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে সাধনরাজ্যে সিদ্ধিলাভের জন্য সে তত্ত্ব উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ব্যাকরণের ছন্দ-

তত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের ছন্দরহস্যের বেশ সুন্দর একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দেবতাতত্ত্ব ঃ আমরা যজ্ঞতত্ত্বে দেখিতে পাই, দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ আহুতি প্রদান ছিল সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতবাং প্রাচীন ঋষিগণ দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া কি রহস্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন বুঝিতে চেষ্টা করা দরকার। দেব আসলে একজন,—'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' যিনি স্বরূপতঃ এক, অথচ তিনি নানারূপে নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে জীবজগতের ভিতর দিয়া লীলারত। সেই এক দেবের ভাবপ্রকাশ বিভূতি অবলম্বনে নানা দেবতার উদ্ভব। এইজন্য প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে প্রতিবিম্বিত ভগবৎ-তত্ত্বকে নানা দেবতা নামে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। যেমন ক্ষিতিতত্ত্বে কুবের, অপ্ তত্ত্বে বরুণ, তেজতত্ত্বে অগ্নি বা সূর্য্য, মরুৎ-তত্ত্বে পবন, আকাশ-তত্ত্বে যম, মনস্তত্ত্বে চন্দ্র, বুদ্ধিতত্ত্বে বিষ্ণু, অহং তত্ত্বে রুদ্র ইত্যাদি।

[ব্যাকরণগত অর্থ]। ব্যাকরণের ভিতর দিয়াও আমরা দেখিতে পাই, দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতু দ্যোতনার্থক ও ক্রিয়াথক। যিনি প্রকাশ পান এবং প্রকাশের মধ্য দিয়া যিনি লীলারত তিনিই দেবতা। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে ভগবানেব যে প্রকাশ শক্তি বিভিন্ন রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীব-জগৎ লইয়া লীলারত তিনিই দেবতা। তারপরে বেদের দেবাসুর তত্ত্বের মধ্য দিয়া আমরা দেবতা-তত্ত্বের একটি সুন্দর পরিচয় পাইয়া থাকি। কশ্যপপত্নী অদিতির অখণ্ডনীয়া প্রকৃতির সন্তানগণ দেবতা বলিয়া পরিচিত ; দিতির খণ্ডনীয়া প্রকৃতির সন্তানগণ দৈত্য বা অসুর বলিয়া পরিগণিত। উভয়ই কশ্যপের মূল দ্রষ্টার

(কঃ পশ্যতীতি কশ্যপঃ) পত্নী বা সন্তানবর্গ। যাঁহারা মূল একত্বের মূল একবিম্বের অনুসরণকারী তাঁহারা দেবতা এবং যাহারা মূল একত্বকে ভুলিয়া গিয়া বিদ্বেষভাব স্থাপনের সহায়ক তাহারা দৈত্য বা অসুর। এইভাব অবলম্বনে ভগবান শঙ্কর বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোককে দেবতা এবং রজস্তম দ্বারা অভিভূত জীবকে অসুর পর্য্যায়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। "দেবা দিব্যতে দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরা স্তদ্বিপারীতাঃ।" আবার অন্যত্র দেখিতে পাই, প্রায় সকল দেবতাকেই অসুর পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে ; সেখানে অসুর শব্দের অর্থ অসু বা প্রাণ বা শক্তিযুক্ত। দেবতাদিগকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করিয়া উপরের স্তরের সহিত তুলনায় নীচের স্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় সর্ব্বোচ্চস্তরের দেবকে ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সকল দেবতাই কতক পরিমাণে অসুর ভাবাপন্ন। অন্যত্র শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেবতাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শত-পথ ব্রাহ্মণে দ্বিবিধ দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) দিব্য-দেব (ইন্দ্রবরুণাদি) (২) মনুষ্য দেব। দেবগণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের ভিতরে বাস করেন। দিব্য দেবতাকে আহুতি দ্বারা ও মনুষ্য দেবতাকে দক্ষিণা দ্বারা তুষ্ট করিবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ ব্রাহ্মণকে দেবতাস্থানীয় বলিয়া বর্ণনা অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

[পূর্ব্বমীমাংসার মত] যজ্ঞাদির সঙ্গে পূর্ব্বমীমাংসার সম্বন্ধ খুব বেশী ; তাই যজ্ঞতত্ত্বে দেবতা সম্বন্ধে তাহার মতও একটু আলোচনা করা দরকার। পূর্ব্বমীমাংসায় দেবতাদের কোন রূপ নাই, কোন শরীর নাই ; যত কিছু চিন্তার বিষয় (object of thought, idea, concept) তাহারা এক একটি দেবতা। সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য লইয়াই এক

একটি মন্ত্র। যাহা কিছু মননযোগ্য তাহাই দেবতা। দেবতাকে যে নাম দেওয়া হয় তাহাই সেই দেবতার শরীর। ওঁ; অর্থাৎ হ্যাঁ, অস্তিত্বই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক নাম। ইহা হইতে সাধক আপনার মনের মতন করিয়া দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। তন্ত্রপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক (Idealist ও Realist) প্রত্যেক নামের সহিত একটা রস মিলাইয়া রস সম্ভোগে বিভোর। তারপরে আবার সেই নামের অনুকূল একটি রূপ যোগ করিয়া সেই রূপধ্যানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই বেদের বাগ্দেবী তন্ত্রের মাতৃকা সরস্বতী, ইনি শব্দাত্মিকা, পঞ্চাশটি বর্ণে ইহার দেহ নির্ম্মিত, প্রতি অঙ্গে এক একটি অক্ষর বিন্যস্ত। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা (রূপ) অপর হাতে অক্ষমালা (বর্ণ), তৃতীয় হাতে বিদ্যা ও চতুর্থ হাতে সুধার কলস। দেবপূজক আপনাকে মাতৃকার (সরস্বতীর) সহিত অভিন্নবোধ করেন, আপনার স্থূল দেহকে এমন কি অন্তর্দেহকেও বাক্‌-দেবতার বাঙ্ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। নিজের দেহে বাগ্‌দেবীর শব্দময় দেহ রচনা করিয়া এই দেহ যে বাগ্দেবীরই দেহ, তিনি যে ইহার চালক এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করেন। দৃষ্ট দেহও যে বাগ্দেবীর দেহ (Word of God)। সুতরাং বেদ এক একটা concept কে (ভাবকে) পূর্ণ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট; তন্ত্র তাহাকে আবার এক একটি আদর্শ মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেন। তাহার ভিতর দিয়া ভাব (idea) ও ভাবময় দেহের (reality), প্রাণ ও রয়ির লীলা আস্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পরে যজ্ঞের ভিতর দিয়া শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক (পারমার্থিক) কর্ম্মের মধ্য দিয়া দেবতার দেহলাভে সচেষ্ট হইলেন। ইড়া ভক্ষণের প্রভাবে স্থূল এবং সোম ব্যবহারের ফলে দেবতার সূক্ষ্ম দেহ লাভ হয়। যীশুর মাংস ও

রক্ত পান করিয়া যীশুর সাদৃশ্য লাভের ব্যবস্থা আছে। রামপ্রসাদের কালীকে খাইয়া কালীকে পাইবার কথাও শুনা যায়।

[দ্বিবিধ দেবতা] বেদে প্রত্যেক দেবতার দ্বিবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ; প্রকাশ্য স্থূল রূপটি নিম্নাধিকারীর জন্য, সূক্ষ্ম গূঢ় রূপটি উচ্চাধিকারীর জন্য। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম গূঢ় পদের দিকে লইয়া যাওয়াই যজ্ঞের বিশেষতঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। দেবতারা প্রত্যেকেই দ্বিবিধ ধনের (বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য ও মুক্তির) দাতা। সূর্য্যের ত্রিবিধ রূপের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—(১) উৎ (কার্য্যাত্মক, যাহা ভূলোকে আলো দান করে), (২) উৎ-তর (সূক্ষ্মাত্মক, যাহা আকাশে আলো দেয়) ; (৩) উৎ-তম, যাহা উদয়-অস্তহীন প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু জগতের আত্মা (soul of all souls)। অগ্নিসোমবরুণাদি সব দেবতারই দ্বিবিধ রূপ আছে। সব দেবতাই মূল শক্তির বিকাশ। তাহাদের নিজেদের কোন শক্তি নাই, মূল দেবতার শক্তি হইতে তাহারা শক্তি লাভ করে (কেন উপনিষদের হৈমবতী উমার আবির্ভাব ও উপদেশ এখানে স্মরণীয়)।

[দেবতাদের সংখ্যা] দেবতারা যখন ভগবানের প্রতিবিম্ব তখন যে আধারে এই প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে সেই আধারের বিভাগ অনুসারে দেবতাদের বিভাগ হওয়া স্বাভাবিক। ঋকের দেবতা তেত্রিশটি, 'যেস্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশশ্চ' (৮।৩০।২) ইঁহারা স্বর্গে এগারটি, পৃথিবীতে এগারটি এবং অন্তরীক্ষে এগারটি। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে অষ্টবসু (পঞ্চভূত, আদিত্য, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা), একাদশ রুদ্র (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) এবং দ্বাদশ আদিত্য (আয়ুঃপ্রদ বার মাস) এবং দ্যৌ ও পৃথিবী মিলিত হইয়া তেত্রিশটি দেবতা। ঐতরীয় মতে দ্যৌ ও পৃথিবী স্থানে

প্রজাপতি ও বষটকারের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যত্র দেখা যায়, পৃথিবীর দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষের দেবতা বিদ্যুৎ এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য্য। এখানে দেবতারা দ্যুতিবিশিষ্ট দ্যোতনার্থক। যেখানে দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ বলা হইয়াছে সেখানে আবার প্রত্যেক দেবতা কোটি কোটি ভাবে অনুভূত বলিয়া দেবতাদের সংখ্যা পুরাণকারগণ তেত্রিশ কোটি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাঙ্খ্য দৃষ্টিতে প্রধানতঃ দেবতাদের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি। কোথাও মূল দেবতা এক এবং বিকৃত দেবতা ষোল (ষোড়শস্তু বিকারঃ) —যাহার ছায়ারূপে আমরা বৃন্দাবনে প্রধান গোপিকা এক এবং বিকৃত গোপিকা ষোল হাজার বলিয়া পুরুষ চৈতন্যের লীলার সহায়ক গোপীদের সংখ্যা ১৬ হাজার এক বলিয়া নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। যাঁহারা প্রকৃতির তিন গুণের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন তাঁহারা দেবতাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, দেব এক, প্রকৃতির জগতের এবং জীবদেহের বিভিন্ন তত্ত্বে তাহার প্রতিবিম্ব অনন্ত হইলেও ব্যবহারিক ভাবে আপন আপন রুচি অনুসারে আমরা তাহাকে বিভিন্ন রূপে পরিগণিত করিয়া থাকি। যেমন একই আলো, জল, কাঁচ, প্রস্তর আদি বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন তত্ত্বরূপে পরিগণিত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ জীবজগতের বিভিন্ন তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

[দেবতাদের একত্ব] ঋক্‌বেদের দেবতাতত্ত্ব এবং যজ্ঞতত্ত্ব আমাদের একটা অতুলনীয় সম্পত্তি। সমস্ত দার্শনিকতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, সংস্কার-তত্ত্ব, ব্যবহারিকতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে ইহার ভিতরে নিহিত যে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ইহার একটু আভাস পাইলে আর্য্য ঋষিগণকে যাঁহারা বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা

তাঁহাদের নিজ নিজ অজ্ঞতা সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুদের উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, গীতা প্রভৃতি এই বেদেরই একটু আভাস প্রদান করিয়াছেন। বৈদিক শ্রুতিগুলি কোন ভাব বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষে বা সাধন বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় তত্ত্বটাই বেশী নজরে পড়ে। বেদে সৃষ্টির অতীত অবস্থায় এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সৃষ্টির মধ্যে সেই একের বহুত্ব অসীমের সসীমভাব, নিরাকারের সাকার রূপ গুণাতীতের গুণের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ অগ্রাহ্য করা হয় নাই। মূলে দেবতা এক, প্রকাশের ভিতর দিয়া তিনি বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে।" অংশবাদের মধ্যেও প্রত্যেক অংশকে ব্যাপক বলিয়া ধরা হইয়াছে। অংশ হইয়াও ব্যাপক হইতে পারে, যদি সেই অংশটা ব্যাপকত্বের তারতম্যে নির্দ্ধারিত হয়। এই অংশ প্রতিবিম্বিত হইবার তারতম্য অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়; নতুবা প্রত্যেক অংশে যে পূর্ণত্ব বীজাকারে বর্ত্তমান সে কথায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দেবতারাও প্রতিবিম্ব; কিন্তু তাহার মধ্যে বিম্বের ভাব এতটা বেশী বর্ত্তমান যে তাহাদের মধ্যে যেন বিম্বের একত্ব ভাবটা ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবতাদের মধ্যে ভাবগত কার্য্যগত ভেদ থাকিলেও পারমার্থিক ভাবে যে একতার অভাব হয় নাই সে কথা তাঁহাদের মনে প্রায় সময়ই জাগ্রত থাকিত। বিম্বে যাহা বর্ত্তমান বিম্বের নিকটবর্ত্তী প্রতিবিম্বে তাহার অভাব অতি অল্প পরিমাণেই লক্ষিত হয়। তাই দেবতারা একটু বেশী পরিমাণে ব্রহ্মভাবের দ্বারা পরিভাবিত। যিনি মায়ার অতীত অবস্থায় এক, তিনিই মায়াযুক্ত ভাবে বহু। দেবতাদের

একত্ব অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। সকল দেবতার মূল সত্তা যে এক, সকলেই যে স্পন্দনাত্মক, সকলেই যে মূল একশক্তির অভিব্যক্তি, সকলেই যে বিশ্বব্যাপী, সকলেই যে অপরিচ্ছিন্ন, সকলেরই মূলে যে এক কারণসত্তা বর্ত্তমান তাহা নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণভাবে এক, কার্য্যাভাবে অনন্ত। যিনি অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, তিনি আকাশে সূর্য্য, তিনি আবার ভূলোকে অগ্নি। ইন্দ্র যাহা করেন, অগ্নিও তাহাই করেন; সকলেই পৃথিব্যাদির নির্ম্মাতা বৃত্রহন্তা পাপনাশক। সকলেই প্রথম এবং বিশ্বরূপ। ইন্দ্র যাহা করেন, অগ্নিও তাহাই করেন, একের কার্য্য অন্যের দ্বারা হইতে পারে। Transformation of Energy শক্তি সাতত্য একত্ব বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করে। একই দেবতা বিভিন্ন ঋষি দ্বারা বিভিন্ন নামে বর্ণিত। যেমন, "তুমি রুদ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি অগ্নি, আবার তুমিই অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্র।" সকলেই কম্পন-স্বরূপ, স্পন্দাত্মক, বলস্বরূপ, সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বদা জাগ্রত, মঙ্গলকারী। সকলেই পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় পরমাত্মীয়।

ঋক্-বেদের অদ্বৈতবাদের দেবতাদের চরম একতার দিকে ছিল প্রধান লক্ষ্য। সাধকের শুদ্ধ শান্ত চিত্তে সব কার্য্যসত্তার পিছনে দেবতাবর্গে অনুস্যূত এক কারণসত্তা ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ হয়। জ্ঞানীই ইহা অনুভব করেন—তখন সকল দেবতাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করার ব্যবস্থা দেখা যায়। তারপরে দেবতাদের সত্তায় ও আত্ম-সত্তায় কোনও ভেদ উপলব্ধি হয় না। ঋকের প্রথম মণ্ডলই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি—সেখানে সকল দেবতাই অগ্নি। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সকলের মধ্যগত সত্তা যে এক এবং অভিন্ন এই বোধে স্থিতিলাভই তো অদ্বৈত-তত্ত্ব। সকলে মিলিয়া এক হওয়ার জন্য প্রার্থনা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

[সাধন-প্রণালী] দেবতাতত্ত্বের সাধনার মধ্যে আমরা প্রতিবিম্ব অবলম্বনে মূল বিম্বের কাছে, বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া সেই পরমপদ তৎ-পদার্থের নিকটে পৌঁছিবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাই। দেবতার সাধন অনেকটা ত্বং-পদার্থ অবলম্বনে ত্বং-পদার্থ শোধিত করিয়া তৎ-পদার্থে পৌঁছিবার অপূর্ব্ব কৌশল। জীবজগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অদ্ভুত উপায়। আমরা যজ্ঞ-রহস্যের ভিতরে ক্রমে এই তত্ত্বের পরিচয় পাইব। আমাদের ধারণার অনুকূল প্রকাশ অবলম্বন করিয়া আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় শক্তির ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া যাহাতে মূল প্রকাশের কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারি সেই রহস্যই দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া সুপ্রকট। সাধারণ চোখে কাঁচে কালি মাখিয়া সূর্য্যগ্রহণাদি দর্শন করিবার রহস্য এখানে চিন্তনীয়। প্রধানতঃ শক্তি পূজায় আবরণ দেবতার পূজার ভিতরে আমরা এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। শিক্ষকগণ শিক্ষার স্তর বিভাগের ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণ যেন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট গুরু বা দেবতা। এই শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে নিজের শ্রেণীতে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছিবার উপায়ান্তর নাই বলিলেও চলে। যোগীদের

অবলম্বনীয় দেহতত্ত্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন দেবতার *অবস্থিতি এবং উপলব্ধি দেবতাতত্ত্ব বুঝিবার একটি প্রধান সহায়।* বৈষ্ণবদের কায়-ব্যূহ এবং সখীবিভাগ দেবতাতত্ত্বের একটা প্রধান রহস্য।

[দেবতায মনুষ্যভাবের আরোপ] দেবতাতত্ত্বে মনুষ্যভাব আরোপ (anthropomoiphism) বেদেও দেখিতে পাওযা যায়। দেবগণ বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট। ইন্দ্র সুনাসিক স্থূল পেট শচীপতি বজ্রহস্ত ; রুদ্র বলিষ্ঠ, সুবর্ণ অলঙ্কারভূষিত ; বরুণের মুখশ্রী অতি সুন্দর ইত্যাদি। হয়ত বৈদিকযুগে স্থূল মূর্ত্তি গড়িযা দেবতাদের পূজা কবা হইত না ; কিন্তু সাধকদেব মনে যে সময সময এক একটি ঐশ্বর্য্যে-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত মূর্ত্তি ফুটিযা উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতরে এক একটি গূঢ় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুসন্ধানে তাঁহারা বিভোর হইযা যাইতেন। দৃশ্যটি হইযা পড়িত সেই দেবতার একটি বিগ্রহ। তাহার পরে দৃশ্যের অবযবটিব মধ্য দিযা যেন একটি নব বা নারী মূর্ত্তি তাঁহাদের মানসনেত্রে ফুটিযা বাহিব হইত, সেই মূর্ত্তিকে পূর্ণতা দান করাব ফলে যে ভাব যে দেব তাঁহাদেব অনুভবে আসিত তদবলম্বনে তাঁহারা অনেক সময় ধ্যান কবিতেন। সর্ব্বব্যাপী যখন সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত তখন সর্ব্ব অবয়বকে তাঁহাব মূর্ত্তি মনে কবা অস্বাভাবিক বা অসত্য নহে। কোনও ছেলেমেযের দেহাবযব অবলম্বনে এক একটি আদর্শ মূর্ত্তির ছায়া মনে আসা যদি অস্বাভাবিক না হয তাহা হইলে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলম্বনে এক একটি আদর্শ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠাও অস্বাভাবিক নয। শুনিতে পাওয়া যায, প্রাচীনকালে দেবতারা আহুত হইয়া যজ্ঞভূমে অবতীর্ণ হইতেন।

[দেবতাদের সমাজ] দেবতাদের কার্য্যবিভাগের মধ্যে আমরা দেব-সমাজের একটা চিত্র উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই। ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে

মনুষ্যদেহের (জীবদেহের) সমাজতত্ত্ব এবং জগৎ দেহের সমাজতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে দেবতাদের সমাজতত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। ভগবৎ-সৃষ্টির প্রধান সৌন্দর্য্য এই যে, সমস্ত জগতে যাহা আছে, প্রত্যেক জীবদেহে এমন কি প্রত্যেক পরমাণুতে তাহা বর্ত্তমান। এককে জানিলেই সকলকে জানা হয়। "একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি।" প্রকৃতির সব স্তরগুলি অল্প বিস্তরভাবে সৃষ্টির সব পদার্থে বর্ত্তমান। পুরুষচৈতন্যও দেবতারূপে শক্তিরূপে প্রকৃতির সব পরিণামে বর্ত্তমান। এই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশের স্তরগুলি কৃষ্ণলীলার সখী আদি তত্ত্বের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধ ; প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দ্ধারিত কাজের মধ্য দিয়া সমগ্র লীলার সহায়।

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছে দ্ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ॥

এই শ্লোকে আমরা দেবতাদের কার্য্য বিভাগের একটা ছায়া দেখিতে পাই। এই কার্য্যবিভাগ এবং তাহাদের সম্বন্ধটা ঠিক যেন একটা সমাজ-তত্ত্বের আদর্শ শাসনতন্ত্রের অনুকূল ভাবে তালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের কথা বলিতেছি না ; প্রাচীন ঋষিগণ সাধনবলে যে আদর্শ রাজতন্ত্রের স্বরূপ সমস্ত জগৎ-তন্ত্রের মধ্য দিয়া দর্শন করিয়াছিলেন তাহারই কথা বলা হইতেছে—যেখানে ব্যষ্টি-সমষ্টির লীলা পূর্ণ আদর্শভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—রাজা যেখানে সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি, রাজার বলবুদ্ধি সুখশান্তি যেখানে সর্ব্বপ্রকার প্রজার বলবুদ্ধি সুখশান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গ্রহ-উপগ্রহাদির স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণনার সময় এই আদর্শ শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যেমন সূর্য্য রাজা, বৃহস্পতি মন্ত্রী, মঙ্গল সেনাপতি,

বুধ ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি। আমাদের দেহতত্ত্বের মধ্যেও এই শাসনতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়. আত্মা রাজা, বুদ্ধি মন্ত্রী, কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্যবিভাগের, জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানবিভাগের কর্ম্মচারী, শব্দস্পর্শাত্মক দেহটি সাম্রাজ্য। দেবতাদের স্বরূপ ও কার্য্যবিভাগ লইয়াই দেবতাদের সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক তত্ত্ব। দেবতাগণ যখন তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন তখন মা হৈমবতী আসিয়া তাঁহাদের ভিতরকার একতা প্রতিপাদন করিয়া দেন। দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র রাজা, অগ্নি সেনাপতি, বরুণ ব্যবস্থাপক, বৃহস্পতি মন্ত্রী ইত্যাদি। তাঁহাদের ভিতরে জাতিবিভাগ এবং কার্য্য-বিভাগেরও সুন্দর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। (ব্যষ্টি-সমষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

ঋক্ বেদের পুরুষসূক্তে আমরা দেখিতে পাই, সেই আসল এক দেবতা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বিভিন্ন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দেবতারা পুরুষ চৈতন্যের এক এক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাঁহাদের ভিতরে সমস্ত অঙ্গের সমস্ত ভাব সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। জ্যোতিষশাস্ত্র সেই দেবতাগুলিকে বিভিন্ন গ্রহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক এক গৃহে এক এক দেবতার বিশিষ্টভাবে অধিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাশিচক্রের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, কেন্দ্রে যেন প্রধান দেবতার অধিষ্ঠান, তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রাশিচক্রের মধ্যে বিভিন্ন রাশিতে বিভিন্ন গ্রহের ভিতরে চৈতন্য রূপে বিভিন্ন দেবতা অধিষ্ঠিত। ইহা লইয়া আধিদৈবিক তত্ত্ব। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক জীবদেহে, বিশেষতঃ আমাদের মনুষ্যদেহে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান। রাশিচক্রাদির সব তত্ত্ব যেন এখানে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। আমাদের বিভিন্ন ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়গুলি সমষ্টি এক একটি দেবতা হইতে নির্ম্মিত। যেমন, চক্ষুর দেবতা সূর্য্য,

মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা বিষ্ণু, অহংকারের দেবতা রুদ্র ইত্যাদি। আবার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যের মধ্যে সব দেবতার চৈতন্যগুলি গূঢ়ভাবে অবস্থিত। উত্তম পুরুষে এই চৈতন্য পূর্ণ বিকশিত। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।" কৃষ্ণের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সব ইন্দ্রিয়ের সব বৃত্তি সব শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত ছিল। দেবতাতত্ত্বের সাধকগণ তাঁহাদেব ব্যষ্টিদেহে এমন কি সমষ্টিদেহে পর্য্যন্ত কোন্ তত্ত্বে কোন্ দেবতা কোন্ ব্রহ্মচৈতন্য কিভাবে লীলারত তাহা অনুভব করিয়া সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া সবতত্ত্বে পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করিয়া নিজেরা ভগবৎ শক্তিতে শক্তিমান্ হইতেন। প্রত্যেক পরমাণুতে যে পূর্ণশক্তি গূঢ়রূপে বর্ত্তমান ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে তাহার ভিতর হইতে যে সেই শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত করা যায় বিজ্ঞানশাস্ত্র তাহা অস্বীকার কবিতে পারে না। ইহার সাধন কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিবার প্রণালীব অন্তর্ভুক্ত। Every neutral body contains infinite amount of positive and negative energy in a latent form and by friction or chemical process that latent energy can be made patent.—এই বাক্য বিজ্ঞানসম্মত। (আমার একটি শিক্ষিত বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন,—আপনার দেবতাতত্ত্বেব রহস্য জানিতে পারিলে আমার বিশ্বাস জগদীশবাবু এবং প্রফুল্লবাবুর পক্ষে অনেক নূতন নূতন বিজ্ঞানরহস্য আবিষ্কার করা সহজ হইবে।) আসল কথা, ঋক্-বেদের দেবতাতত্ত্ব – বিশেষতঃ তন্ত্রের দেবতারহস্য ও মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্ররহস্য সাধনরাজ্যের একটি অতুল সম্পত্তি।

৪। বিনিয়োগ ঃ - কোনওরূপ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, কোন বিষয়ে কোন গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন

করিয়া চলিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কি জাতীয় সাধনা কি জাতীয় অনুষ্ঠান প্রণালী অবলম্বনীয়, কোন্ ইচ্ছাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কিভাবে কার্য্য করিতে হইবে, কোন জাতীয় কর্ম্মদ্বারা কিরূপ ফললাভ হইবে সেই সব বিনিয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত। ত্রিশক্তির মহিমা এখানে বিশেষভাবে চিন্তনীয়। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়, জ্ঞানশক্তিদ্বারা কোন্ পথে গেলে কিরূপ সাধনা অবলম্বন করিলে সেই ইচ্ছাটি সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে সাধিত হইবে সেই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। তারপরে সেই ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তিকে কিভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহা ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত। ক্রিয়াশক্তির তত্ত্ব বুঝিতে হইলে কুণ্ডলিনীতত্ত্ব একটু জানা দরকার। জ্ঞানকে কার্য্যকারী করিবার রহস্য লইয়া বিনিযোগতত্ত্ব। সমস্ত কর্ম্ম-রহস্য এই বিনিয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত। কোন্ কর্ম্মের কি ফল লাভ হয় সেই তত্ত্ব ঋষিরা দেখাইয়া গিয়াছেন। কোন্ কর্ম্মকে কিভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে সিদ্ধির জন্য কিরূপ ছন্দ অনুবর্ত্তন করিলে সেই ফললাভ হইবে তাহার রহস্য ছন্দতত্ত্বের ভিতরে নিহিত। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমাদের দেহ যন্ত্রের তাহার অনুকূল কোন্ কেন্দ্রে ভগবানের কোন্ শক্তি কিভাবে নিহতি, সেই শক্তি কিভাবে কার্য্য করিতে ব্যস্ত কিরূপ লীলায় রত—সেই রহস্য আমরা দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া জানিতে পারি। ছন্দ ও দেবতাতত্ত্ব অবগত হইলে কোন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিবার পক্ষে বিনিয়োগতত্ত্ব সহজবোধ্য হইবে। গীতায় অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্। বিধিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ এই পাঁচটি তত্ত্বের রহস্য চিন্তনীয়। কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে সে বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞানলাভের দরকার।

তারপরে জানিতে হইবে কি প্রণালীতে কাজ কবিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। সরপরে বুঝিতে হইবে দেহেব কোন্ কোন্ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত শক্তি সেই কার্য্য সাধনে প্রয়োজনীয। এই সব তত্ত্বগুলি ঠিক করিয়া যে কার্য্য সাধনে শক্তি প্রযোগ করা যাইবে সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ যে সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

—ঃ০ঃ—

মন্ত্র, তন্ত্র ও যন্ত্ররহস্য

মন্ত্রতত্ত্ব ভারতের হিন্দুর নিকট অল্পাধিক পরিমাণে সুবিদিত। যাহার মননে ত্রাণ পাওয়া যায়, অভাব দূর করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, কোনও নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিয়া তোলা যায় তাহার নাম মন্ত্র। ভগবান্ যাস্কাচার্য্য বলেন,—

মননান্মুনিশার্দ্দূল ত্রাণং কুর্ব্বন্তি বৈ যতঃ।
দদতে পদমাত্মীয়ং তস্মান্মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যাহা মননকারীকে ত্রাণ করে, আপন ধামে লইয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র।

মন্ত্র শুদ্ধতম নাদতত্ত্ব—ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে দেবলোক কেন, আত্মলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

বাচি মন্ত্রাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে বাচ্যং মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
মন্ত্ররূপাত্মকং বিশ্বং স বাহ্যাভ্যন্তরং ততঃ॥

মানুষের জ্ঞান বাক্য ব্যবহার সব অনিয়ন্ত্রিত, তাই ফলপ্রদ হয় না। দেবতাদের এসব নিয়ন্ত্রিত, তাই অমোঘ। বেদমন্ত্র ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে যজমানের গ্রন্থির উন্মোচন, ভাবের আবির্ভাব, দেবতাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

অধিকারী ভেদে জীবনের লক্ষ্যভেদে মন্ত্রের ভেদ হইয়া থাকে। কোন্ কার্য্যের কি উদ্দেশ্য কি প্রণালীতে তাহা সাধিত হইতে পারে,

সাধিত হইলে কি ফল লাভ হয়, এই সমস্ত রহস্য মন্ত্রতত্ত্বে নিহিত। আমাদের প্রত্যেকের জীবনটি এক একটি মন্ত্রের পরিণাম। যেমন একটা সূক্ষ্ম বীজের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে সেইরূপ আমাদের জীবনের সমস্ত গূঢ় রহস্যগুলি বীজাকারে এক একটি মন্ত্রের ভিতরে নিহিত। সেই মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের উৎপত্তির বীজতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যেমন একটি বীজ দেখিয়া তাহার সব রূপের পরিণতি ও সার্থকতা অনেকটা বলিয়া দেওয়া যায় সেইরূপ আমাদের দেহের বীজরহস্য চিন্তা করিলে জীবনের সমস্ত গতি পরিণতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে সবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রগুলি বীজাত্মক। এই মন্ত্রটি জানিতে পারিলে কে কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ রাস্তায় চলিলে সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে এবং সেই রাস্তায় সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই সব তত্ত্ব সুন্দরভাবে অবগত হওয়া যায়। যে যে বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বীজে ভগবানের কি ইচ্ছা বর্ত্তমান এবং সেই ইচ্ছা কি পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার মন্ত্র নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। সেই সাধকের সমস্ত জীবনটি হইবে সেই বীজের সেই মন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ। সেই মন্ত্রটির ভিতরে নিহিত রহিয়াছে তাহার জীবনের অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সব রহস্য। তাহার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাগুলি সেই মন্ত্রে নিহিত। অর্থাৎ সে কেন আসিয়াছে তাহার কি কাজ করিতে হইবে, কি প্রণালীতে তাহার জীবনটা চালিত করিলে সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে সেই সব তত্ত্ব উক্ত মন্ত্রের ভিতরে নিহিত। সেই মন্ত্রের দীক্ষালাভরূপ শ্রবণ, সাধনারূপ মনন, এবং তাহাতে সমাহিত হইয়া তন্ময়তা লাভ করা রূপ নিদিধ্যাসন হইবে তাহার জীবনের লক্ষ্য।

মন্ত্রের ব্যাহৃতি বীজ ও দেবতাতত্ত্ব এস্থলে চিন্তনীয়। ব্যাহৃতির মধ্যে ওঁকার-রূপ ব্যাহৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ওঁকারব্যাহৃতি অবলম্বন করিয়া অকার উকার মকার ভেদ করিয়া অৰ্দ্ধমাত্রায় (ভগবদ্ধামে) পৌঁছিতে হইবে। যোগশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট মূলাধার মণিপুর অনাহত ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে অৰ্দ্ধমাত্রাব কাছে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। সেখানে গেলে উপলব্ধিতে আসিবে ধামতত্ত্ব, স্বরূপতত্ত্ব এবং ভগবৎ-তত্ত্ব। সেখানে গিয়া বুঝিযা লইতে হইবে, ভগবান তাহাকে কি উদ্দেশ্যে কিভাবে কোন্ কায্য সাধন কবিবাব জন্য তাহাব ভিতরে কি বীজ নিহিত করিয়া সৃষ্টি করিযাছেন। তাহার পরে সেই বীজের পূর্ণসিদ্ধিপ্রাপ্ত দেবতাতত্ত্বের সাহায্যে নিজেব সব তত্ত্বগুলি ভগবৎ-ভাবে পূর্ণ করিয়া নিজে কিভাবে সেই দেবতাময হইযা যাওযা যায, সেই তত্ত্ব আমবা মন্ত্রেব দেবতাতত্ত্বেব ভিতরে নিহিত দেখিতে পাই। সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রে ব্যাহৃতিরূপ প্রণব, জীবেব নিজের জীবনেব গূঢ় রহস্যরূপ বীজ এবং তাহার পূর্ণ পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত দেবতাতত্ত্ব নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, একাক্ষব মন্ত্রগুলির মধ্যেও এই তিনতত্ত্বেব আভাস লুক্কায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রতত্ত্বের ভিতব দিয়া আমরা জানিতে পারি, আমবা কি কাজ করিতে আসিযাছি, কিভাবে পরিচালিত হইলে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সফল হইতে পারে।

তন্ত্রতত্ত্বের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সাধনার অতি উচ্চাঙ্গের একটি গূঢ় রহস্য। বেদের অভ্রান্ত সত্যগুলি কিরূপ সাধনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে তাহাব তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য্য। যাঁহারা কোন বৈদিক মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রটিকে সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত না করেন তাঁহাদের নিকট সিদ্ধিলাভ যে আকাশ-কুসুমবৎ একটা কাল্পনিক

পদার্থরূপে গৃহীত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক শুষ্ক বেদান্তী এবং কাল্পনিক সন্ন্যাসীর দ্বারা সমাজ যে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধনার অভাবে আমরা শুধু কথায় পণ্ডিত, ভাবে নাস্তিক, কাজে পিশাচ হইয়া পড়ি। যে সত্যের কথা শুনিয়াছি, মননের সাহায্যে সেই সত্যকে বোধগম্য করিতে হইবে এবং সমাধি দ্বারা সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের জীবনকে সত্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। কি প্রণালীতে সেই শ্রুত সত্যকে সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত করা যায় তাহার গূঢ় রহস্য আমরা তন্ত্রতত্ত্ব হইতে অবগত হইতে পারি। সুতরাং তন্ত্রের সাহায্যে জানিতে হইবে কি ভাবের সাধনা দ্বারা আমার মন্ত্রের আমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বোধন করিযা মন্ত্রটিকে একটি সজীব সত্যে পরিণত করিতে পারি, আমার জীবনটিকে মন্ত্রময় করিয়া তুলিতে পারি।

যন্ত্র ঃ-যন্ত্রতত্ত্ব সাধনরাজ্যের একটি অতুলনীয় রহস্য। সমষ্টিভাবে সমস্ত জগৎ—ব্যষ্টিভাবে আমাদের এই জীবদেহ আমাদের সাধনার অবলম্বনীয় একটি যন্ত্র। দেহতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে নানারূপ রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ এমনকি বর্ত্তমান দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে আমাদের এই দেহযন্ত্রের ভিতরে স্নায়ুরহস্যগুলি বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। অপর যন্ত্রগুলি ইহাদের সহকারীমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়া গিয়াছেন আমাদের এই দেহতত্ত্বের প্রধান প্রধান রহস্যগুলি প্রধানতঃ আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে, তাহার পরে আমাদের মেরুদণ্ডের ভিতরে নিহিত। ইহার ভিতরে অসংখ্য স্নায়ুকেন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্নায়ুকেন্দ্রের ভিতরে বিশেষভাবে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে অনেক বিচিত্র শক্তি নিহিত। আমাদের চক্ষুর কেন্দ্রে যে সমস্ত দৃষ্টিবিজ্ঞান,

শ্রবণকেন্দ্রে যে সমস্ত শব্দরহস্য নিহিত তাহা সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রগুলিকে পাশ্চাত্য দর্শন বোধকেন্দ্র (sensory nerve centre) এবং কার্য্যকারী কেন্দ্রগুলিকে স্নায়ুকেন্দ্র (motor nerve centre) প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ আমাদের পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতির এবং কার্য্যকলাপের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এক এক কেন্দ্রে যে অসীম শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে এবং প্রণালীবিশেষের দ্বারা যে সেই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত ও কার্য্যকরী করিতে পারা যায় তাহা লইয়াই ত তাঁহাদের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব। ষট্‌চক্রের বর্ণনাচ্ছলে কোন্ কেন্দ্রে কি শক্তি কিভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কি প্রণালীর সাধন দ্বারা সেই শক্তিকে পূর্ণবিকশিত এবং কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়, তাহা লইয়াই যোগীদের ষট্‌চক্রাদি সাধনতত্ত্ব। কোন্ কার্য্যসাধন করিবার জন্য দেহস্থ কোন্ কেন্দ্রে মনস্থির করিতে হইবে, প্রণালীবিশেষের অবলম্বনের দ্বারা কিভাবে সাধনা দ্বারা সেই কেন্দ্রে নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারা যাইবে সেই সব রহস্য আমরা যন্ত্রতত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাই। সাধারণ দর্শন, দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, দিব্যদর্শন লাভের জন্য যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় (optic centre) লইয়া সাধনা করা দরকার তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে মনস্থির করিতে হইবে। সেখানে প্রাণ শক্তিকে চালিত করিয়া সেখানকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। ভগবদ্দর্শন করিতে হইলে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে হইবে, ভগবৎ-বাণী শ্রবণ করিতে হইলে যে সেইরূপ দিব্যশ্রবণ লাভ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎ-অনুভূতি লাভ করিতে হইবে সেই ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শক্তি জাগ্রত করা যে বিশেষ

দরকার তাহাতে সন্দেহ নাই। সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব ইত্যাদি শ্রুতি ইহার সাক্ষী।

প্রাচীন ঋষিদের সব অনুষ্ঠানের ভিতরে আমরা যন্ত্রতত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য দেখিতে পাই। যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার পাঁচটি অগ্নির অবস্থিতির স্থান দেহস্থ পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রে অবস্থিত। যজ্ঞে বর্ণিত কুণ্ডগুলি এই দেহে অবস্থিত স্নায়ু-কেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে বলেন যজ্ঞের পাঁচটি কুণ্ড যথাক্রমে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত। এই পাঁচটি কুণ্ডে অবস্থিত ভর্গোদেবই যজ্ঞের পঞ্চাগ্নির নামান্তর মাত্র। এই ভিতরের স্নায়ুকেন্দ্ররূপ অগ্নিকুণ্ডের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রতীকরূপে বাহিরের যজ্ঞকুণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকি। যজ্ঞের মন্ত্রগুলির ভিতরে এই রহস্যের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। মন্ত্ররহস্যের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে ভগবত্তত্ত্ব, স্বরূপতত্ত্ব, জীবশিবের সম্বন্ধ এবং জীবের শিবত্ব প্রাপ্তির উপায়। সাধনপ্রধান তন্ত্রতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা জানিয়া লইব ভগবৎ লাভের সাধন প্রণালী। যন্ত্রতত্ত্বের সাহায্যে আমরা দেহস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রে ভগবৎ শক্তি জাগ্রত করিয়া ভগবৎ প্রতিবিম্বরূপ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আস্তে আস্তে ভগবৎ ধামে গিয়া ভগবদ্দর্শন ভগবৎ-উপলব্ধি ভগবানে তন্ময়তা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিব। সুতরাং যজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্র রহস্য যে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—*—

যজ্ঞের তাৎপর্য্য

কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, তবে সে কর্ম্ম শিবের কর্ম্ম—যে কর্ম্মে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, যে কর্ম্ম আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ—স্বভাব হইতে সাধিত হয়। জীব ব্রহ্মের পরিণাম বা বিবর্ত্তন। সুতরাং এই পরিণাম বা বিবর্ত্তনজনিত কিছু একটু বিকৃতি জীবের মধ্যে আসিয়া যাইতে বাধ্য—যাহা জীবকে শিব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে—যাহা 'তৎ'পদার্থ ও 'ত্বং'পদার্থের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদভাব সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভেদ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে নাই, কিন্তু আছে বদ্ধের দৃষ্টিতে; ইহার ব্যবহারিক সত্তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জীব যদি সাধনার ফলে এই কাল্পনিক ভেদভাবটা দূর করিয়া শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে জীব ও শিবের মধ্যে এই কাল্পনিক ভেদভাব আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুভূত হইবে না। তখন 'ত্বং'পদার্থ 'তৎ'পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হইবে। যত কিছু সাধনভজন তাহা আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া অনর্থ নিবৃত্ত করিয়া 'ত্বং'পদার্থকে 'তৎ'পদার্থে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য। 'ত্বং'পদার্থ শুদ্ধ হইয়া পরিণামে কতটা পরিমাণে 'তৎ'পদার্থের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় সেইসব বিচার দার্শনিকের হাতে থাকাই ভাল। তখন 'ত্বং' সম্পূর্ণরূপে নিজের সত্তা বিসর্জ্জন করিয়া নিজের পৃথক্ত্ব দূর করিয়া 'তৎ'পদার্থে প্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা নিজের শুদ্ধ সত্তা লাভ করিয়া 'তৎ'পদার্থেরই লীলাস্বীকৃত বিগ্রহরূপে একটু পৃথক্ত্ব বজায় রাখিয়া আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া 'তৎ'এর লীলার সহায় হয়, সেকথা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয়। পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিবেন,

পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন সাধিত হইলে 'ত্বং' ও 'তৎ'এর ভিতরে কতটা ভেদভাব বর্ত্তমান থাকে। আমাদের দরকার জীবভাবাপন্ন 'ত্বং'কে শুদ্ধ করিয়া অন্ততঃ 'তৎ'এর যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া 'ত্বং'এর ভিতর দিয়া 'তৎ'এর ইচ্ছা, শিবের ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণরূপে সফল হয় তাহার চেষ্টা করা। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলে জীবের কর্ম্ম হইয়া পড়িবে শিবের কর্ম্ম, শিব তখন জীবের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবেন। জীব সাধনার ফলে এমন একটা অবস্থা লাভ করিবে যখন তাহার চোখের ভিতর দিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, দিব্যদর্শন আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। এইরূপ, কানের ভিতর দিয়া দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মশ্রবণ, দিব্যশ্রবণ আবির্ভূত হইবার ফলে সব শব্দের মধ্য দিযা শব্দের পরাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি অপ্রাকৃতভাব লাভ করিয়া ভগবদ্ ধ্যানে ভগবদ্ উপলব্ধিতে বিভোর হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের দেহের সব তত্ত্বগুলি হইয়া পড়িবে শুধু একটা যন্ত্র, ভগবান ইহার ভিতরে যন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে তাঁহার লীলার সহায় করিয়া তুলিবেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। ঋষিগণ এই কৌশল অবগত ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞতত্ত্বের ভিতর দিয়া এই সাধনতত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শিবের কর্ম্ম যখন যজ্ঞ তখন সেই অবস্থায় জীবের সকল কর্ম্মও যজ্ঞে পরিণত হইবে। যে কৌশল অবলম্বনে জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পরিণত করা যায় তাহার নাম যজ্ঞ বা যোগ। গীতা কেন 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে রহস্য এখানে চিন্তনীয়। ঋষি বালকদের যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করিতে হইত। তাঁহাদের মধ্যে

কেহ কেহ বদ্ধ সংসারীর ন্যায় কুশ আনিতে গিযা হাত কাটিয়া ফেলিতেন, কেহ কেহ বা হাত কাটার ভয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় অন্যের সংগৃহীত কুশ ভিক্ষা কবিয়া নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেন। আর একদল লোক কুশ আনাব প্রকৃত কৌশল অবগত হইযা এমনভাবে কুশ সংগ্রহ করিতেন যাহাতে কুশও সংগ্রহ হইত অথচ হাতও কাটিত না। সংসারে এইরূপ ত্রিবিধ লোক দেখিতে পাওয়া যায—একদল লোক অভাব পূবণের জন্য কর্ম্ম করিতে গিয়া কর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর একদল লোক কর্ম্মের, সংসারের স্বরূপ না জানিয়া কর্ম্মবন্ধনেব ভয়ে ভীত হইযা কর্ম্ম হইতে বৃথা দূবে থাকিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রে যে ত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইযাছে সে ত্যাগ ভগবৎসৃষ্ট জগতের নয়,—কামনা, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি দ্বারা গড়া বাসনামূলক জীবসৃষ্ট জগতের,—"বাসনা এব সংসারঃ", "যত্র যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্তদা।" দেহ থাকিতে কর্ম্ম হইতে মুক্তি নাই। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেহধারণেব জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা বর্জ্জনের চেষ্টা বৃথা প্রয়াস ছাড়া আর কি? এই দলের লোকেরা কর্ম্মের ভিতরে একটা কাল্পনিক ভেদভাব সৃষ্টি করিয়া কতগুলি কর্ম্মকে অপরিহার্য্য বলিযা নির্দ্দোষ ভাবে বর্ণনা কবিয়া থাকেন। আর একদলেব লোক রাজর্ষি জনকের পথ অনুসরণ করিযা কর্ম্মেব ভিতর দিয়াও অকর্ম্ম দর্শন করেন; তাঁহারা অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইযা শুধু ভগবৎ ইচ্ছা পূবণেব জন্য ভগবৎ তৃপ্তি বিধানের জন্য, লোকসংগ্রহের নিমিত্ত জীবকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য, স্বরূপেব দিকে লইয়া যাইবার জন্য স্বভাব হইতে ভগবৎ লীলার সহায়ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান। ইঁহারা যোগী, প্রকৃত যাজ্ঞিক বলিয়া পরিগণিত। কি করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্য ও

স্বভাব বিদিত হইয়া নিজের অহঙ্কার, সুখস্পৃহা, প্রতিষ্ঠার মোহ, কামনা, বাসনা আসক্তি ত্যাগ করিয়া জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পরিণত করা যায় সেই রহস্য জগতে প্রচার করিযা জীবকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। স্বভাবে আত্মভাবে ভগবৎ-ভাবে ভগবৎ-অনুমোদিত পথে লইয়া যাইবাব অনুকূল কর্ম্মই শিবের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, **কর্ম্মের ভিতরে যাবতীয় বিকৃতি দূর করিয়া অভাবাত্মক কর্ম্মকে স্বভাবাত্মক কর্ম্মে বন্ধনাত্মক কর্ম্মকে মুক্তির অনুকূল আনন্দপ্রাচুর্য্যাত্মক কর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য যতকিছু চেষ্টা যতকিছু ভাবনা চিন্তা যতকিছু কার্য্যকলাপ তাহারই সাধারণ নাম যজ্ঞ।** যজ্ঞের এই ক্রিয়াবহুল বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রধান কর্ম্মগুলিকে দ্রব্যাত্মক, মানসিক বিচারপ্রধান ধ্যানমূলক কর্ম্মগুলিকে ভাবনাত্মক এবং জ্ঞানপ্রধান স্বরূপানুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে কেবলাত্মক যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব যে, সমস্ত যজ্ঞগুলির লক্ষ্য জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পর্য্যবসিত করা, "ত্বং' পদার্থ ও 'তৎ' পদার্থের ভিতরকার কাল্পনিক ভেদভাবকে দূর করা, জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পরিণত করা। আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে বিবিধ মত, যজ্ঞের সাধনপ্রণালী সুন্দরভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা কিছু নূতন রহস্যের উদ্‌ঘাটন নয়। অন্য সব অনুষ্ঠানের ন্যায় যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেও যে অনেক বিকৃতি অনেক কল্পিত প্রথা আসিয়া জুটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই আগন্তুক ময়লা আগন্তুক বিকৃতি দূর করিতে চেষ্টা করিয়া বৈদিক যুগের

আর্য্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানরূপ যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব * বাহির করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

* "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি।" যজ্ঞ শব্দের অর্থই ভগবান বিষ্ণু—অর্থাৎ বিষ্ণু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি--তাঁহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, তাঁহার সব কাজের উদ্দেশ্যই বা কি, কি করিয়া তাঁহাকে জানা যায়, ধরা যায়, পাওয়া যায় তাহা লইয়াই যজ্ঞ-তত্ত্ব। বিশ্--অনুপ্রবেশে--যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতি তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য সাধন করিতেছেন তিনিই বিষ্ণু। অন্যত্র দেখিতে পাই ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি বিষ্ণুঃ। যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু। যিনি জীবজগতে অবস্থিত থাকিয়া জীবজগতের পূর্ণ পরিণতি লাভের সহায় তিনিই বিষ্ণু। যজ্ঞ শব্দের অর্থ যদি বিষ্ণু হয় তাহা হইলে যাহা দ্বারা অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা জীবজগৎ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, ভগবানকে জানিতে, ধরিতে পাইতে পারে তাহারই নাম যজ্ঞ। বিষ্ণুকে জানিতে হইবে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া। অর্থাৎ যাহার ভিতর দিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন তাহার সাহায্যে তাই যজ্ঞকে ভগবানের কার্য্য বলা যায়। ভগবানের কার্য্যকলাপের ধ্যান করিয়া তাঁহার সব কাজের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার কাজের অনুকূলভাবে কাজ করিতে তাঁহার কাজের সহায় হইতে চেষ্টা করার নামই যজ্ঞ। যজ্ঞ যেন ভগবানের স্বরূপ তাঁহার প্রতীক, তাঁহারই মূর্ত্তি।

যজ্ঞ কি

যজ্ঞ সৃষ্ট্যাদি কাজে আনন্দ আস্বাদ করিবার ও আনন্দ আস্বাদ করাইবার জন্য দেবতার আত্মদান এবং দেবতার উদ্দেশ্যে দেবতাকে জীবের দ্রব্য ও ভাব দান; সুতরাং যজ্ঞ পুরুষমেধ ও নরমেধ, অর্থাৎ 'তৎ' পদার্থের 'ত্বং'রূপে সৃষ্টি পবিণতি বা বিবর্ত্তন এবং পুনরায় 'ত্বং'পদার্থের 'তৎ'স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন রহস্য। 'তৎ' এবং 'ত্বং'-এর, পুরুষ প্রকৃতির, প্রাণ ও রযির, অন্নাদ ও অন্নের, spirit and matter এব লীলা রহস্য লইয়াই যজ্ঞতত্ত্ব। ইহা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াত্মক।

যজ্ঞ সিদ্ধের পক্ষে কেবলাত্মক—সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি, সাধকের পক্ষে ভাবনাত্মক—ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিজের ও জগতের প্রতি তত্ত্বে ব্রহ্মের লীলাদর্শন ও লীলার অনুভূতি; প্রবর্ত্তকের পক্ষে দ্রব্যাত্মক—স্থূল দেহের স্থূল পদার্থের সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি করা।

যজ্ঞ—ত্রিবিধ দেহকে শুদ্ধ ও সংস্কারবর্জ্জিত করিয়া ভগবৎ-ভাবে পূর্ণ করিয়া ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিযুক্ত করিয়া সর্ব্বত্র ভগবৎ লীলাদর্শন। ভগবৎ লীলার সহায় হওয়ার জন্য যতকিছু অনুষ্ঠান তাহা সকলই যজ্ঞ নামে পরিচিত। প্রায় সকল অবতারগণ যজ্ঞতত্ত্বের আগন্তুক ময়লাগুলি দূর করিয়া ইহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যোগযজ্ঞ জপজজ্ঞ স্বাধ্যায়যজ্ঞ নামকীর্ত্তনযজ্ঞ সেই সব চেষ্টারই বিভিন্ন পরিণামবিশেষ। এখন দেখা যাক যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র হইতে কিরূপ আলোক লাভ করি।

১। যজ্ঞ ভগবান স্বয়ংঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি, যজতি বিদ্বদ্ভি রিজ্যতে বা স যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ, যিনি সমস্ত পদার্থ সংযোগ করেন এবং যিনি সকল বিদ্বান্ লোকের পূজ্য সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাই যজ্ঞ। জগতের সব তত্ত্বে সব কর্ম্মে ভগবদুপলব্ধি, সব বিভক্তিতে কর্ম্মের সব অঙ্গে সব ক্রিয়ায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি করাই যজ্ঞ। এখানে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' মন্ত্রের রহস্যটি অনুভবনীয়। অগ্নিতে, হবিতে হোতায় ব্রহ্ম দর্শন করিতে হইবে। সব রূপে সব তত্ত্বে সব কাজে যজ্ঞ ভাবনার উপদেশ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। "যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞী যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ" "যজ্ঞভৃৎ যজ্ঞকৃৎ যজ্ঞী যজ্ঞভুক্ যজ্ঞ সাধনঃ"।

যজ্ঞ অর্থই বিষ্ণু,—যজ্ঞ সাধনই ভগবৎপ্রাপ্তি। জীবজগৎ ভগবানের মূর্ত্তি, জীবজগৎ অবলম্বনে জীবের সেবা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করাই যজ্ঞ। ভগবান স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর, অধিযজ্ঞ যজ্ঞের আত্মা।

২। যজ্ঞ বৈদিক ঋষিদের প্রধান অনুষ্ঠানঃ

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যুদ্ধ বিগ্রহ অরাজকতা মহামারী প্রভৃতির হাত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া যে সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইত। যজ্ঞের অনুষ্ঠান যজ্ঞের মন্ত্র যজ্ঞের হবিঃশেষভক্ষণ ছিল এই একতার সাধক। যজ্ঞ জাতির নিদ্রিত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া সকলের সদ্গুণগুলিকে একত্রিত করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সকলকে সমর্থ করিয়া তুলিত। যাহা অহঙ্কার স্বার্থ এবং তজ্জনিত ভেদভাব দূর করিয়া ব্যষ্টিভাবকে সমষ্টিভাবে লীন করিয়া জীবকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব আস্বাদনের যোগ্যতা দান করে তাহার সাধারণ নামই ছিল যজ্ঞ।

৩। যজ্ঞ কর্ম্মের কৌশলঃ—কর্ম্ম হইতেই সৃষ্টি, কর্ম্মদ্বারা জগচ্চক্র চালিত, সুতরাং অন্ততঃ দেহ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। জ্ঞানিগণ যখন কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ মনে করিয়া একটা অস্বাভাবিকভাবে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইতে ব্যস্ত হইলেন, তখন যজ্ঞতত্ত্ব কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম যে তখন বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয়, জীবকে সেই রহস্য দেখাইয়া দিয়া সংসারের প্রচুর কল্যাণ সাধন করে। যজ্ঞ সকাম কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করিবার, অভাবাত্মক কর্ম্মকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার, বন্ধনাত্মক কর্ম্মকে মুক্তির সহায় করিয়া তুলিবার, নীরস কর্ম্মকে রসযুক্ত করিবার, আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ করিবার, প্রেয়কে একাধারে শ্রেয় এবং প্রেয় করিয়া তুলিবার, *জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্ম করিয়া তুলিবার অপূর্ব্ব কৌশল বলিয়া দেয়। কুশও আনিব অথচ হাতও কাটিবে না, সংসারে থাকি।* অথচ আবদ্ধ হইব না, "অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী" হইবার অপূর্ব্ব কৌশল আমরা যজ্ঞতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই। যজ্ঞ মানুষকে প্রভুর ন্যায় হুকুম না করিয়া, পণ্ডিতের ন্যায় যুক্তি না দেখাইয়া, প্রিয়তমার ন্যায় আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ হইতে ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া জ্ঞানাত্মক ভূমিতে লইয়া যায়। যজ্ঞ ভোগের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ত্যাগে, সকামের ভিতর দিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে, সংসারের ভিতর দিয়া ভগবদ্ধামে লইয়া যাইবার অপূর্ব্ব কৌশল। মানুষ যাহা চায়, তাহারই লোভ দেখাইয়া পরম পদ প্রাপ্তির সহায় হয়, নিজসুখ লাভের লোভ দেখাইয়া নিজসুখ যে সকলের সুখের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আস্তে আস্তে তাহা বুঝাইয়া দিয়া জীবকে সকলের

কল্যাণ সাধনে আনন্দ বিধানে লুব্ধ করে। যজ্ঞের ভিতরে আমরা স্বার্থ-পরার্থের অপরূপ সমন্বয় দেখিতে পাই।

৪। যজ্ঞ ঋণশোধাত্মক কর্ম্ম—ত্যাগ (Sacrifice) ঃ – ভগবান আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই একটা ত্যাগের ব্যাপার। ত্যাগ ব্যতীত সমাজ চলে না, জগৎ চলে না। গীতার স্বধর্ম্মতত্ত্ব এই ত্যাগের মহিমা প্রচার করে। আমরা সকল মানুষ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ—সব জীবের সব ভূতের সব দেবতার নিকট ঋণী। সকলের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, সেবা লইয়া তাহাদের জন্য কিছু না করিলে আমাদিগকে চোর বলা যাইতে পারে। আমরা দ্রব্যযজ্ঞ ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া এই ঋণ শোধ করিবার সুযোগ পাই। প্রাচীন হিন্দুর নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহা-যজ্ঞের ভিতরে আমরা এই ঋণশোধের ব্যবস্থা অতি সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। *জীব পোষাকপরা শিব, শ্রীভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ। দেহ* অবলম্বনে দেহীর কাছে যাইতে হয়, জীবের ভিতর দিয়া শিবের দর্শন ও উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ; তাই হিন্দুশাস্ত্রে জীবের সেবাই শিবের সেবা। নিঃস্বার্থভাবে সব জীবের সেবা দ্বারা শিবের সেবা করা সর্ব্বভূতহিতে রত থাকাই ছিল হিন্দুদের প্রধান যজ্ঞ। সকল জীবের ভিতর দিয়া সর্ব্বব্যাপী ভগবানের দর্শন ধ্যান ও সেবাই ছিল হিন্দু জীবনের প্রধান সাধনা। সব অনুষ্ঠানের প্রথমে স্বস্তিবাচন পাঠ করিতে হয়। একজন জীবের নিকটও ঋণী থাকিতে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। তাই সেখানে যাইতে হইলে সেবা দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া সকলের অনুমতি লইয়া সকলের মুখ হইতে একবাক্যে 'সু অস্তু' তোমার এই কার্য্য সফল হউক—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—এই

অনুষ্ঠান সকলের কল্যাণ সাধন করুক—এই বাণী শ্রবণ করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া তারপরে শুভকার্য্য আরম্ভ করা হইত। নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ। অকৃতজ্ঞকে বসুন্ধরাও বহন করা উচিত নয়। "উপকারিণি বিশ্রব্ধে যঃ সমাচরতি পাপম্। তং জনম-সত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি ॥"

৫। **কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ ঃ**—কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ - এই কথার উদ্দেশ্য এই যে বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সব কাজকে যজ্ঞে বা পূজায় পরিণত করা যায়। সম্পূর্ণ জগৎকে নন্দনবনে, সমস্ত বাণীকে বেদে, সমস্ত ভাবকে উপাসনায় পরিণত করিতে চেষ্টা করাই ছিল তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ইদংরূপে প্রতীয়মান সব পদার্থ সব তত্ত্ব যে ব্রহ্মেরই পরিণাম বা বিবর্ত্তন সাধনার পরিণামে সবই গিয়া যে ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়, ইহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সব কর্ম্ম এমনভাবে সাধিত করিবার উপদেশ দিতেন যাহাতে সব কর্ম্ম যজ্ঞে, পূজায়, সাধনায়, উপাসনায় গিয়া পরিণত হয়। যজ্ঞ ব্যাপক অর্থে সব কর্ম্ম, সংকীর্ণার্থে বিধিপূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্রব্যের আহুতি—দ্রব্যত্যাগ। কর্ম্ম দ্বিবিধ—ভগবানের কর্ম্ম ও জীবের কর্ম্ম। ভগবানের কর্ম্ম পুরুষমেধ, জীবের কর্ম্ম নরমেধ। ভগবানের কর্ম্ম সৃষ্টি ও স্থিত্যাত্মক, জীবের কর্ম্ম লয়াত্মক। এই উভয় কর্ম্ম লইয়াই সাধিত হয় যজ্ঞকাণ্ড। ভগবানের নিজকে নিজে আস্বাদ করিবার জন্য, নিজকে তাঁহার প্রিয় জীবের নিকট আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই যে জগৎ জীবরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন, আত্মবিস্মৃতির ভান, আত্মদান অভিনয়, লুকোচুরি খেলা বা লীলা,—এবং এই যে জীবের পক্ষে চিত্ত শুদ্ধ শান্ত করিয়া ভগবানের রহস্য ভেদ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহারা অনুভূতি-

লাভ—তাঁহার লীলায় যোগদান— ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রহস্য—ইহারই নাম যজ্ঞতত্ত্ব। গীতার 'সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃসৃষ্ট্বা' কথাটি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বেদের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যজ্ঞ বায়ুর ক্রিয়া, প্রাণের এজন—অগ্নিসোমের খেলা। যজ্ঞ শক্তি-সাতত্য (conservation of energy and persistence of Force), যজ্ঞ বিমর্ষশক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণ, যজ্ঞ দেবতার নৃত্য, যজ্ঞ ছন্দতত্ত্ব। আবার যজ্ঞ ভগবৎ ক্রিয়া-শক্তির অব্যক্তাবস্থা (potential state) হইতে ব্যক্তাবস্থায় (Kinetic stateএ) আগমন। পরে আবার অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাগমন। যজ্ঞ কর্ম্মচক্র, ধর্ম্মচক্র ও জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন।

৬। **যজ্ঞ লীলাবিশেষঃ** যজ্ঞ প্রাণ ও রয়ির, অগ্নি ও সোমের, অন্নাদ ও অন্নের, শক্তি ও শক্তিমানের, শিবশক্তির, কৃষ্ণরাধার, রামসীতার লীলাবিশেষ। ব্রহ্মের জীবরূপে, পিতার পুত্র রূপে, একের বহুরূপে, অবিভক্তের বিভক্তরূপে, অসীমের সসীমরূপে, তৎ পদার্থের ত্বং-পদার্থরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তনই পুরুষমেধ যজ্ঞ এবং জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি, পুত্রের পিতায় লীন হওয়া, বহুকে একরূপে, সসীমকে অসীমরূপে 'ত্বং'কে 'তৎ' রূপে পুনরুপলব্ধি নবমেধ যজ্ঞ। এই উভয় তত্ত্ব লইয়া যে লীলা-খেলার অভিনয় তাহা লইয়াই হইল যজ্ঞতত্ত্ব। এই লীলায় তটস্থ শক্তি জীবের কর্ত্তা বা ভোক্তা না সাজিয়া বৃথা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া ভগবৎ লীলা দর্শন করার নামই ভাবনাত্মক যজ্ঞ। * ভাবনাত্মক যজ্ঞে ভগবান ভিতরে বাহিরে বসিয়া আমাদের জন্য কি করিতেছেন তাহার উপলব্ধি করাই প্রধান কাজ। এই

* এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের আলোচনার ভিতরে দ্রষ্টব্য।

অভিনয় ক্রিয়াত্মক। তাই জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য। এই লীলা ত্যাগাত্মক বলিয়া যজ্ঞও ত্যাগপ্রধান। যজ্ঞ দ্বৈতাদ্বৈতের খেলা ; এক দিকে ব্রহ্মের সিসৃক্ষা ও বহুরূপে প্রকাশ, অপর দিকে জীবের মুমুক্ষুত্ব—দ্বৈতভাব ঘুচাইয়া নিবিড় ঐক্যসাধনের চেষ্টা, ইহাই জীবব্রহ্মের রসের খেলা, দোললীলা, ঝুলনযাত্রা। ইহার না আছে আদি, না আছে অন্ত। যজ্ঞ অসীমের সসীমরূপে লীলা এবং পুনরায় অসীমে প্রত্যাবর্ত্তন ; যজ্ঞ মুক্তের বদ্ধভাবে খেলা এবং পুনরায় মুক্তিলাভ ; শিবের জীবভাবে অভিনয় (পরিণতি বা বিবর্ত্তন) এবং পুনরায় শিবত্বলাভ। যজ্ঞ কর্ম্মবিশেষ—পুরুষের কর্ম্ম (ভগবানের কর্ম্ম) পুরুষমেধ এবং জীবের কর্ম্ম, নরের কর্ম্ম নরমেধ যজ্ঞ। পুরুষ অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব হইয়াও লীলার ছলে আপনাকে যেন বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জীবের পূর্ণতা লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। জীবের জন্য এই ত্যাগাত্মক কর্ম্ম পুরুষমেধ। জীব যদি ভগবানের সেই উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া তাঁহার কাজের সহায় হইতে চেষ্টা করে, নিজের ও সর্ব্বজীবের পূর্ণতা লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয় তবে তাহার কর্ম্ম আস্তে আস্তে নরমেধ যজ্ঞে পরিণত হইবে। এই যজ্ঞই ত্যাগাত্মক কর্ম্ম—সব কামনা, বাসনা, আসক্তি আদি ত্যাগ করিয়া সংযমের পথ দিয়া পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। পুরুষমেধ যজ্ঞের একটা অনুভূতি লাভের জন্য ঋষিগণ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি কাজের লক্ষ্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি—কোন একটী জীবের ভিতরকার সব তত্ত্ব জানিলে, জানিতে পারিলে সব জীবের সব তত্ত্বগুলির রহস্য উদঘাটিত করা যায়। মনুষ্যদেহে কতগুলি তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই তত্ত্বগুলি কোথায় কিভাবে অবস্থিত, কি কি কার্য্যসাধনে নিযুক্ত সেই তত্ত্বগুলির ভিতর দিয়া জীবকে পূর্ণতা দান করিতে, নিজের ভাবে

পরিভাবিত করিতে কিভাবে ব্যস্ত সেই তত্ত্বগুলি আবিষ্কৃত করা হইয়াছে। ভগবানের এই ক্রিয়ারহস্য লইয়া পুরুষমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত। জীব যদি ভগবানের এই কার্য্যে বাধা না দিয়া তাঁহার কাজের সহায় হইতে চেষ্টা করে. সব জীবকে ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত ভগবন্ময় করিয়া ভগবৎ কার্য্য সাধনে সহায় করিয়া তুলিতে পারে, তবেই নরমেধ যজ্ঞ সুসাধিত হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য জীবকে ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সংযত, শুদ্ধ, শান্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা, তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে ভগবান ভগবৎ-শক্তি কোন্ তত্ত্বে কোন্ চক্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কি কার্য্য সাধন করিতেছেন। জীব সংস্কারের বশে অজ্ঞানতার প্রভাবে সেই ভগবৎকার্য্য সাধনে নানাভাবে বাধা দিয়া থাকে—বাধামুক্ত হইয়া অবাধ গতি লাভ করা, ভগবদিচ্ছা পূরণে সহায় হওয়াই নরমেধ যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য। আদর্শ নর জগজ্জীবের হিতার্থ এই কাজে ব্রতী হইতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞ বিকৃত হইয়া পশু হিংসায় নর-বলিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি এই যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া ইহাকে শোধন করিয়া প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

৭। যজ্ঞ ভগবদারাধনা—যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, ভগবৎপ্রাপ্তি সাধিত হয় তাহাই যজ্ঞ।

(ক) যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাধনম্ –(রামানুজভাষ্য গীতা ১৬।১)

(খ) যজ্ঞঃ পরমেশ্বরারাধনম্—যজ্—দেবপূজায়াম্ (নীলকণ্ঠ)।

(গ) ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেন ইতি যজ্ঞঃ—(গিরি)।

হইয়া সব দেবতাগণকে আপ্যায়িত করেন; ফলে মনপ্রাণ দেহাদি সব আনন্দময় হইয়া ওঠে। দেবতাদের খাদ্যও সোম; দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নির সাহায্যে সোম অর্পণের নাম যজ্ঞ।

৯। যজ্ঞ স্বধর্ম্মপালন—স্বধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম (স্বর্জ্জাতাবাত্মনে); আত্মার বিকাশের অনুকূল ধর্ম্ম; ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল ধর্ম্ম। ভগবান সচ্চিদানন্দ, সুতরাং যে ধর্ম্ম সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের বর্দ্ধক—যে ধর্ম্ম ইহাদের পরিণতির সহিত পূর্ণ একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মানুষকে ভগবানের কাছে লইয়া যায় তাহা স্বধর্ম্ম। তারপরে আত্মা অৎ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অৎ সাতত্যগমনে। আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যে ধর্ম্ম আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মার সকল প্রকাশগুলিকে ভগবৎ বিভূতি, ভগবৎ মূর্ত্তি মনে করিয়া সর্ব্বজীবের হিতসাধনে ব্যস্ত তাহা স্বধর্ম্ম। সুতরাং স্বধর্ম্ম মানুষকে নিজের ভগবৎপ্রাপ্তির এবং অন্য সকল জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতা লাভের যে সহায় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বধর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ধর্ম্মের ভিতরে আমরা পাই নিজের পূর্ণ পরিণতি লাভের ব্যবস্থা এবং বর্ণ্য ধর্ম্মের ভিতরে রহিয়াছে সমাজের, দেশের সকল জীবের পূর্ণ পরিণতির সহায় হইবার নির্দ্দেশ। বর্ণাশ্রম নামের মধ্যে বর্ণকে প্রথমে রাখার ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, আশ্রম ধর্ম্ম অপেক্ষা বর্ণ্য ধর্ম্মের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা হইয়াছে অর্থাৎ সকলের হিতে যে আমাদের হিত এই ভাবটা বদ্ধমূল করিয়া দিবার দিকে ছিল ঋষিদের প্রধান দৃষ্টি।

গীতা স্বধর্ম্মপালনের দিকেই সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। যাহারা জাতিভেদের প্রকৃত রহস্য না জানিয়া জাতিভেদ দূর করিতে সচেষ্ট

তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং স্বধর্ম্মই বা কি। হিন্দুগণ প্রথম হইতেই ব্যষ্টি সমষ্টির গূঢ় তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবের ধর্ম্মকে আশ্রম ধর্ম্ম এবং বর্ণ ধর্ম্মে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ধর্ম্মের ভিতরে আমরা ব্যষ্টি জীবের পূর্ণ পরিণতির বিধান দেখিতে পাই। বর্ণ ধর্ম্মের লক্ষ্য হইয়াছে সমষ্টিগত ধর্ম্মের দিকে (Duty towards others) অর্থাৎ সমাজের জন্য জগতের জন্য আমি কি কাজ করিতে আসিয়াছি, আমার কি কাজ করিতে হইবে সেই দিকে। বর্ণ ধর্ম্ম আমার সমাজের নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া দিবে, আর সেই বর্ণ ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইবে আমার গুণ কর্ম্ম অনুসারে। গুণ আমার জন্মগত শক্তি (Qualities with which a man is born) ; ইহা পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে উত্তরাধিকারী সূত্রে (hereditary) প্রাপ্ত ধর্ম্ম বা ভগবদ্দত্ত শক্তি (talents)। আর্য্য ঋষিগণ এই তিনটীর ভিতরে একটী আশ্চর্য্য সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। এই তিনটীই সমান ভাবে সত্য। কর্ম্মফল অনুসারে আমরা বিভিন্ন যোনিতে জন্মলাভ করি ; ভগবৎ কৃপায় আমরা সেই পূর্ব্ব কর্ম্মের ফললাভের যোগ্যতা লাভ করি। সুতরাং গুণ আমাদের জন্মগত সামর্থ্য বা শক্তি। তারপরে সেই শক্তিকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া চালিত করিলে তখন বুঝিতে পারিব আমরা সমাজের কি কাজ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। সেই যোগ্যতা অনুসারে সমাজে স্থিতিলাভ করিয়া আমরা যদি সমাজের কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাহা হইলে যে আমরা সমাজের উন্নতির সহায়ক হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক অর্থগত বংশগত সামর্থ্যগত যোগ্যতা অনুসারে ঋষিদের প্রদর্শিত যোগ্যতার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং

মানুষের স্বধর্ম্ম আত্মবিকাশের জীবহিতসাধনের অনুকূল ধর্ম্ম যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইয়াই ছিল আশ্রম ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যে আমরা সংযত শুদ্ধ শান্ত হইয়া নিজের স্বরূপ দর্শনে নিজের জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাধন ভজন সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষালাভ করিতাম। গার্হস্থ্য জীবনে যত রকম অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত সব সম্ভাবনার সঙ্গে নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতাম এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে। "অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী" যে কি তত্ত্ব তাহা আমরা এখানে বুঝিতে পারিতাম। অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া ভগবদিচ্ছা পূরণের জন্য আমরা কর্ম্মযোগের শিক্ষা এখানে লাভ করিতাম। মানুষের যাবতীয় বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি, এবং তাহাদের ভিতরে কি করিয়া একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে সে শিক্ষা আমরা এই আশ্রমে লাভ করিতাম। এখানে আমাদের তৈয়ার করা হইত আদর্শ গৃহী হইবার জন্য। তারপরে উপযুক্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আমরা কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতাম। এই প্রবেশের প্রথম কাজ ছিল বিবাহ করা। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাহা শিখিয়াছি সেই পরোক্ষ শিক্ষাকে আমরা কর্ম্মের ভিতর দিয়া—প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইতাম, এখানে আমাদের জীবনটা আদর্শভাবে গড়িয়া উঠিত। যাহা শিখিয়াছি তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার আমরা এখানে সুযোগ পাইতাম। ইহার পরে বানপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়া আমরা দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যতা উপলব্ধি করিয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আদরে বরণ করিতে শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা ছিল

কতকটা বর্ত্তমান সময়ের পেন্সনের অবস্থার মত ; তবে বিশেষত্ব এই ছিল যে এখানে আমরা স্ত্রীপুত্র পবিবার বন্ধুবান্ধব ইহারা যে প্রকৃতপক্ষে আমার নয়, ইহারা যে আমার সঙ্গে যাইবে না এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাদের উপর সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়া সংসারের অতীত শান্তিধামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিতাম। পরে সন্ন্যাস আশ্রমের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া কামনা বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া আমরা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতধামে যাইবার সুযোগ লাভ করিতাম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে শিক্ষা যে অভিজ্ঞতা যে বৈরাগ্য পরমপদ লাভের সহায় আশ্রমধর্ম্মের মধ্য দিয়া আমরা সে বিষয়ে সৎশিক্ষা লাভ করিতাম।

সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে মানুষের আদর্শজীবন লাভের, তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনা করিয়া পরমপদ লাভের সহায় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যজ্ঞদ্বারা যে ফললাভ হয় স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা ঠিক সেই ফলগুলি পূর্ণভাবে সাধিত হয় বলিয়াই প্রাচীন ঋষিগণ স্বধর্ম্মপালনকে একটি প্রসিদ্ধ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। *

---

* ধর্ম্ম যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে—দেহকে আত্মীয় স্বজনকে সমাজকে পৃথিবীকে জীবমাত্রকে পতন হইতে রক্ষা করে কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত করে আসল ধর্ম্মস্বরূপের নিকটে লইয়া যায়। ধারণাদ্ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ……ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে পালন করে ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করে পালন করে। পাশ্চাত্য জগতে যাহাকে Duty and responsibility বলে তাহার স্বরূপই এখানে চিন্তনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণ লোকে মনে করে সমস্ত দায়িত্বজ্ঞান হইতে কর্ম্মকাণ্ড হইতে অস্বাভাবিকভাবে যে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে সেই ধার্ম্মিক। ত্যাগ করিতে হইবে সদ্গুণ রাশিকে নয়—নিজের আসক্তি প্রতিষ্ঠার মোহ, ভোগেচ্ছা ও স্বার্থকে।

১০। ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গ্রহণে যজ্ঞ ভাবনাঃ—শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি যে পরা অবস্থা হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয় পথে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার পরা অবস্থায় গিয়া পহুঁছিতেছে এই অনুভূতি লাভ করিয়া ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং আমাদের দেখা শুনা আদি সব কাজে তাঁহার সহিত যোগসূত্রটা মিলাইয়া দিয়া তিনিই যে সব দেখিতেছেন, সব করিতেছেন, সব স্রোতই যে তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আবার গিয়া তাঁহাতে পর্য্যবসিত হইতেছে এই নাদ বিন্দুর খেলা অনুভব করাও যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত। 'পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা'—বিষয়গ্রহণকে পূজায় পরিণত করা—সব কাজকে পূজায় পর্য্যবসিত করা যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত। আমরা জপযজ্ঞের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের (afferent ও efferent current এর) ভিতর দিয়া নরমেধ ও অশ্বমেধযজ্ঞ আস্বাদন করিবার ত্বং এবং তৎ-এর লীলা দর্শন করিবার সুযোগ পাই।

১১। বিষয়কে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়কে প্রাণে, প্রাণকে মনে, মনকে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানকে আনন্দে, আনন্দকে আত্মায় আহুতি দেওয়ার যে ব্যবস্থা উপনিষদাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত।

১২। কার্য্যের ভিতর দিয়া মূলকারণে পৌঁছিবার চেষ্টাও যজ্ঞ। একবার মূলকারণে পৌঁছিয়া গিয়া কার্য্যকারণের লীলাদর্শন ও তত্ত্বানুসন্ধান—কিভাবে কারণ হইতে কার্য্যের আগমন হয় এবং পুনরায় কার্য্যের মূল কারণে গিয়া পর্য্যবসান হয়।

১৩। যজ্ঞ—ব্যষ্টি সমষ্টির তত্ত্বানুশীলনঃ—ব্যষ্টিসমষ্টির সম্বন্ধ অবগত হইয়া—ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে আহুতি দিয়া সমষ্টির কার্য্যের সহায় হওয়াও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। ইহা ব্যস্ত-সমস্ত হোমভাবে বাণত।

১৪। যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ ঃ—যজ্ঞের ফলে অগ্নির সাহায্যে দেবগণের তৃপ্তিসাধন, পুনরায় দেবতার দ্বারা জীবের সব তত্ত্ব আপ্যায়ন।

১৫। পাঙ্‌ক্তো বৈ যজ্ঞঃ (শ, ব্রা)—দেবতা হবির্দ্রব্য মন্ত্র ঋত্বিক্ এবং দক্ষিণা এই পাঁচটীর একত্র সমাবেশেই যজ্ঞ সাধিত হয়। বলা বাহুল্য ইহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত।

সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল—একাগ্রতার সাধক আত্মস্থানমূলক শক্তিদায়ক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। প্রাচীন ঋষিগণ সাধারণ জীবের জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রাধান্য দিলেও যজ্ঞকে কেবল অগ্নিতে ঘি ঢালায় পর্য্যবসিত করেন নাই।

— ০ —

(৯)

যজ্ঞের প্রয়োজন

ভগবৎস্বরূপ ও সাধনরহস্য বুঝিতে পারিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যজ্ঞের কতটা প্রয়োজন। যাহা জীবনের লক্ষ্য যাহার দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় কেহই তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারেন না। মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি বা পূর্ণতা লাভ। আমরা দেখিয়াছি যজ্ঞ দ্বারা সেই লক্ষ্য সুচারুরূপে সুসিদ্ধ হয়। তাহার পরে অভ্যুদয় (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) ও নিঃশ্রেয়স্ (মুক্তি) যাহা উপনিষদের মতে জীবনের লক্ষ্য, যজ্ঞের মধ্যে তাহার প্রাপ্তির ব্যবস্থাও দেখা যায়। মানুষ চায় দুঃখের নিবৃত্তি ও আনন্দের প্রাপ্তি যাহার ফলে লাভ হয় স্বভাবে স্থিতি। হবনক্রিয়ার শুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের চিত্ত হইতে কাল্পনিক অভাব দূর করিয়া সেই শুদ্ধ চিত্তকে ভগবদ্ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়া ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া পূর্ণতা লাভে সাহায্য পাই।

সামাজিকভাবে যজ্ঞের উদ্দেশ্য একত্বস্থাপন, অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি। যজ্ঞ কার্য্যের ভিতর দিয়া বহুত্বের ভিতর দিয়া কারণ তত্ত্ব ও একত্ব উপলব্ধির সহায় হয়। তামসিক অহংকার সব ভেদভাবের দুঃখ-কষ্টের কারণ ; যজ্ঞ দ্বারা সেই অহং ভাব দূর হইয়া সর্ব্বত্র একটা অদ্বৈতানুভূতিজনিত পরম শান্তির ভাব স্থাপিত হয়, তাই যজ্ঞের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যজ্ঞ সব ভেদভাব ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ আদি দ্বন্দ্বভাব—এমন কি দ্বৈতভাব পর্য্যন্ত দূর করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন মৈত্রীভাব আনয়ন করে, প্রেমের প্রচার সর্ব্বভূতে প্রাণ ও রয়ির শিবশক্তির লীলা

আস্বাদন করিবার যোগ্যতা দান করে। যজ্ঞ জীবজগৎ যে ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ, তাঁহারই বিশ্বরূপ এই ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন ব্রহ্মধ্যান, শিবসেবাজ্ঞানে জীবসেবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা দান করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিয়া তোলে। যজ্ঞের ভিতরের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি পূর্ণতালাভ ভগবৎপ্রাপ্তি ; বাহিরের উদ্দেশ্য সমাজে একতা স্থাপন, সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, ব্যষ্টি যে সমষ্টিরই অঙ্গ সমষ্টির কল্যাণে যে ব্যষ্টির কল্যাণ এই তত্ত্ব অনুভব করাইয়া ব্যষ্টি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থে আহুতি দেওয়া। বৈদিক যুগে সমাজের স্থিতি ও পরিণতির সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানকেই যজ্ঞরূপে গ্রহণ করা হইত। যজ্ঞ সমাজের বন্ধন সমাজের কল্যাণ সাধনের ভিতর দিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক এই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার সহায় হইত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যুদ্ধবিগ্রহ মহামারী আদি দূর করিবার জন্য সকলে দলবদ্ধ হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত।

যজ্ঞের আহুতির ভিতর দিয়া দেশের বায়ু শোধিত হইয়া যাইত। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ভিতরে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইত। ইড়া ভক্ষণের ফলে (যেমন খৃষ্টের রক্তমাংস ভক্ষণের ভিতর দিয়া) সকলের ভিতরে একটা একতা স্থাপনের দেবভাব আনয়নের পথ সুগম হইয়া যাইত। পঞ্চমহাযজ্ঞ জাতির সমাজের জীবসেবার সর্ব্বত্র ভগবৎ-দর্শনের যে কতটা অনুকূল তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। দ্রব্যময় যজ্ঞের ভিতর দিয়া স্বার্থপর ধনী শক্তিমান জীবকে অতি সুন্দর কৌশলে জীবসেবায় সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের অধিকার দান করিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞের অধিকারী করিয়া তোলা হইত। সকামী অজ্ঞাতসারে নিষ্কামী, লোভী ত্যাগী দাতা হইয়া উঠিত।

মনে রাখিতে হইবে যেমন পূজার মন্ত্রগুলি লইয়া ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসনের ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া উঠে, তেমনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালী হবনের মন্ত্রগুলি এবং তাহার ভাব লইয়া ধ্যান ধারণা ও সমাধির ব্যবস্থা থাকিলে মানুষ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভাবনাত্মক এবং সর্ব্বশেষে কেবলাত্মক যজ্ঞে গিয়া পৌঁছিতে পারে, তখনই যজ্ঞের প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। এইজন্য চাই সংযম, চাই ত্যাগ, চাই যোগসাধনা, যাহার ফলে সিদ্ধি আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। যজ্ঞের ক্রমতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সাধারণ জীবকে কি করিয়া পূর্ণতা ভগবৎপ্রাপ্তির দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহার একটা সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাই। যজ্ঞ চিত্তশুদ্ধির সহায়, যজ্ঞ দ্বারা আমরা ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনের পূজাজ্ঞানে সকলের ভিতর দিয়া ভগবানের সেবার যোগ্যতা লাভ করি। যজ্ঞ পূর্ণতালাভের একতাস্থাপনের অদ্বৈতানুভূতির ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সহায়। মনুষ্য জীবনে উন্নতি ও শান্তি লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার সব বিধি-ব্যবস্থা যখন যজ্ঞতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই, তখন যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যজ্ঞ হইতে আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া ইহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়া ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজের, সমাজের, দেশের, পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করিতে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

-*-

যজ্ঞের প্রকার ভেদ ও অধিকারী বিচার

অধিকারী ভেদে রুচিভেদে কর্ম্মভেদে যজ্ঞের ভেদ সাধিত হয়। জীব যখন অনন্ত তখন যজ্ঞও অনন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বৃক্ষ সংখ্যায় অনন্ত হইলেও যেমন বিভিন্ন জাতি ধরিয়া বৃক্ষকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, সেইরূপ যজ্ঞ অনন্ত হইলেও অধিকারী ভেদে ইহাকে কয়েকটি ভেদে বিভক্ত করা চলে, তবে সে সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন।

১। যজুর্ব্বেদে দ্রব্যাত্মক, সামবেদে ভাবনাত্মক বা মিশ্র, ঋক্-বেদে কেবলাত্মক বা জ্ঞানযজ্ঞের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞকে দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক ভেদে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে।

২। গীতার কর্ম্মযোগ (যজ্ঞ), ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগকে বেদের দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মকেরই অনুরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া গীতায় দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ ভেদে যজ্ঞের ভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়যজ্ঞকে ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতরে ধরিলে গীতোক্ত যজ্ঞকেও বেদের ন্যায় দ্রব্যাত্মক ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক এই তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

৩। শ্রৌত ও স্মার্ত্তভেদেও যজ্ঞের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ইহা ছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক ভেদেও যজ্ঞের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্য অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনা ও

পঞ্চমহাযজ্ঞই প্রধান। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি নৈমিত্তিক যজ্ঞগুলি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

৫। জাতিভেদ অনুসারেও যজ্ঞভেদ দৃষ্ট হয়। এখানে স্বধর্ম্ম-পালনের কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে জপযজ্ঞ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্যের পক্ষে হবির্যজ্ঞ এবং শূদ্রের পক্ষে পরিচর্যাত্মক যজ্ঞ দৃষ্ট হয়। "আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ স্যু র্হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ। পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণঃ॥ বিশ্বরূপ বরাহের দেহাংশ-ভেদে জাতি বিভাগের ন্যায় (ব্রাহ্মণঃ অস্য মুখমাসীৎ ইত্যাদি) যজ্ঞের বিভাগও দৃষ্ট হয়।

৬। যুগভেদে যজ্ঞবিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে ধ্যানযজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে হোমাদি প্রধান দৈবযজ্ঞ এবং কলিতে দানযজ্ঞ অথবা সংকীর্ত্তনযজ্ঞ। "দানমেকং কলৌযুগে", "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ"। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামকীর্ত্তনই কলিযুগের যজ্ঞ। যজুর্ব্বেদসংহিতায় পনের প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ প্রভৃতি। আপস্তম্ব মতে যজ্ঞ দ্বিবিধ,— জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক, শ্রৌত ও গৃহ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদকে অবতার বর্ণনার প্রসঙ্গে বরাহ সুযজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়। সমগ্র বিশ্বে বিশাল ও ধারণাতীত মূর্ত্তি ধরিয়া যে ব্যবস্থা ক্রিয়া করিতেছে সেই ব্যবস্থাকে ছোট আকারে উপলব্ধি করা ও নিত্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করাই ছিল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সমস্ত বিশ্বব্যাপী চলিতেছে একটা মহান যজ্ঞ, অগ্নিই বিশ্ববিবর্ত্তনের প্রধান শক্তি। পরে কপিল আসিয়া দ্রব্যযজ্ঞকে জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত করিলেন। তবে সেই যজ্ঞই চলিতেছে বাহিরে নয়—ভিতরে। চতুঃসন আসিয়া আত্মযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পৃথু রাজবেশে, রামচন্দ্র একাধারে রাজা ও ভিখারীর

বেশে, কৃষ্ণ অনেকটা রাজবেশে যজ্ঞের গতি স্বধর্ম্মপালনের দিকে লইয়া চলিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ রাজ্যে পদাঘাত করিয়া কঠোর তপস্বীরূপে সংযম ও সেবার দিকে যজ্ঞের গতি ফিরাইলেন। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তন করিলেন কীর্ত্তন যজ্ঞের।

তন্ত্রশাস্ত্র জগতের সব তত্ত্বগুলিকে, তৎ এর বিভূতিগুলিকে তৎ-এর বিভিন্ন প্রকাশকে সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। সাংখ্য ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের প্রতিতত্ত্বে অগ্নির, প্রাণতত্ত্বের, ভগবানের, পরম দেবতার লীলাদর্শন অর্থাৎ রয়ি ও প্রাণতত্ত্বের মহিমা অনুভব করাই যখন যজ্ঞের উদ্দেশ্য তখন যজ্ঞকে সাধারণতঃ এই পঁয়ত্রিশ বা চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করাই স্বাভাবিক।

অধিকারী বিচার ঃ - শাস্ত্র সকলের জন্য। কাহাকেও বাদ দিতে গেলে তাহার চলে না। মা যে সকলেরই মা। সুপুত্র কুপুত্র কেহই মায়ের স্নেহ হইতে বঞ্চিত নয়। সকল লোক একভাবের নহে। সকলের ধারণাশক্তি, অনুভব শক্তিও সমান থাকে না, রোগ নানাপ্রকার। রোগীর অবস্থাও একপ্রকারের নহে, তাই শাস্ত্র দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা-পত্রের ভেদ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ভেদ অনন্ত হইলেও পণ্ডিতগণ সব ভেদকে অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকের জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ, মধ্যমশ্রেণীর জন্য মিশ্র বা ভাবনাত্মক যজ্ঞ, উত্তম অধিকারীর জন্য—জ্ঞানাত্মক যজ্ঞ বিহিত। ইহার উপরে তুরীয়াবস্থার জন্য শাস্ত্রে কোনরূপ বিধি-নিষেধের উল্লেখ নাই। তাঁহারা যাহা করেন তাহাই পূজা, তাহাই যজ্ঞ। তাঁহাদের যজ্ঞকে কেবলাত্মক যজ্ঞ বলা যায়। জ্ঞানাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের মধ্যে ভেদ খুব কম বলিয়া উভয়কে সমান

ভাবে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানাত্মক যজ্ঞকে অনেকেই কেবলাত্মক যজ্ঞ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১। যাহাদের ধারণাশক্তি কম, যাহারা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব, যাহারা সংসার সুখে মগ্ন, ঘোর স্বার্থপর যাহারা স্থূল বিষয়জনিত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান ছাড়া আর কিছু জানে না তাহাদিগকে উপরে তুলিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বিষয়ের মধ্য দিয়াই তুলিতে হইবে। তাহাদের জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ বিধেয়। তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগের প্রণালী—ভোগের উপকরণ—তাহাদের ভোগ যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই তাহাদের জন্য ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের। তাহাদের আদর্শ দেবতা রাখা হইল মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট দেবতা—যাঁহাদের জীবন বল, বীর্য্য, ভোগ, শক্তি ভোগের উপাদান সবই চিরস্থায়ী। যাঁহারা স্বর্গে বসিয়া কেবল ভোগসুখ লইয়া ব্যস্ত। যাঁহাদের তুষ্টিবিধানে আশীর্ব্বাদে সুখলাভ এবং অসন্তুষ্টিতে অভিসম্পাতে দুঃখলাভ অনিবার্য্য, যাঁহাদের নিকট কিছু গোপন রাখা যায় না। যাহাতে ধনী, বিলাসী, পদস্থ, অত্যাচারী ব্যক্তিগণ দেবাতদের ভয়ে নিজকে যথাসম্ভব সংযত রাখিতে চেষ্টা করে, এবং অজ্ঞাতসারে উপরের স্তরে আস্তে আস্তে উঠিতে থাকে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক দ্রব্য-বহুল সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। তাহাদের উপাস্য নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট জ্ঞান ও শক্তিশালী দুষ্টের-দমন-ও-শিষ্টের-পালনকারী দেবতাগণ। ইহকাল ও পরকালের সুখের চাবী রাখা হইল তাঁহাদের হাতে। ঋষিদের এই ভাবে নিম্নাধিকারীকে আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে উপরে তুলিবার কৌশল দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ধনের ও শক্তির যথাসম্ভব ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা। নামের জন্য সুখের জন্য লোককে এইভাবে

জাঁকজমকের সহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেওয়া হইত। দ্রব্য শব্দের অর্থ যাহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, গলাইয়া দেয়, আকৃষ্ট করে অর্থাৎ যাহা লোভনীয়। ভগবান সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। দ্রব্য বা পদার্থ তাঁহার বিভূতি প্রকাশমূর্ত্তি, যাহার ভিতরে থাকিয়া ভগবান লোভ দেখাইয়া মানুষের মন আকর্ষণ করেন। আমাদের আকৃষ্ট হওয়ার মূলেও রহিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। দ্রব্যকে পদার্থ বলে। পদার্থ—যাহা পরম পদের প্রকাশ বা বিগ্রহ—যাহা পরম পদের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। অর্পণের ক্রিয়া ও মন্ত্রগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় আত্মীয়স্বজন ইহারা কেহই আমাদের নহে। ইহারা সকলেই তাঁহার, প্রিয়তমের—এইজন্য ইহারা আমাদের প্রিয়। "সর্ব্বং ত্বদীয়ং ইতি মে প্রিয়মেব সর্ব্বম্।" দেবতারা ভগবানের প্রতিবিম্ব ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত, ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিমান। জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, তাহাদের বাঞ্ছা পূরণে সুদক্ষ। দেবতাদিগকে দ্রব্যার্পণের ভিতর দিয়া আমরা আস্তে আস্তে সেই আদি দেবের নিকট গিয়া পৌঁছিবার সুযোগ পাই। নিম্নাধিকারীকে আস্তে আস্তে তাহাদের অজ্ঞাতসারে উপরে তুলিয়া উচ্চাধিকার দান করার কৌশলটি অতি চমৎকার। শ্রেণী-বিভাগ হইলেও গুণকর্ম্ম অনুসারে উপরে উঠার প্রণালী নির্ভর করে সাধনার উপরে।

—ঃ০ঃ—

দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞ

দ্রব্যাত্মক বা পদার্থাত্মক যজ্ঞঃ দ্রব্য শব্দের অর্থ যাহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, আকৃষ্ট করে, লোভ দেখায়—যাহা লইয়া সাধারণ মানুষ ব্যাপৃত থাকে—বাহ্যিক স্থূল পদার্থ, যাহা স্বরূপে সারদ্রব্য ব্রহ্মতত্ত্ব হইলেও বাহিরে জীব-জগৎরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত। এইরূপ পদার্থ শব্দের ভিতরকার 'পদ' শব্দের অর্থ বিষ্ণুর পরমপদ, সার পদার্থ, ব্রহ্মবস্তু। 'অর্থ'—তাঁহার প্রকাশ বিভূতি মহিমা। ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছায় জীবজগৎরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইলেন ; এই পরিণতি বা বিবর্ত্তনের বাহিরের অংশ লইয়াই দ্রব্য বা পদার্থতত্ত্ব। ইহাদের কাজ মানুষকে লুব্ধ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ভগবানের কাছে লইয়া যাওয়া। ব্রহ্মের সৃষ্টি পরিণতি বা বিবর্ত্তন শুধু জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ কবিবার জন্য।

দ্রব্য বা বিষয়ের ভিতর দিয়া বিষয়ীর নিকট পদের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টাঃ—আমরা স্থূলে সীমাবদ্ধ ; স্থূল ছাড়া সূক্ষ্মের অনুভূতি লাভ করিতে সূক্ষ্মের কল্পনা করিতেও অসমর্থ। তাই বৈদিক ঋষিগণ আমাদিগকে স্থূলের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে হাত ধরিয়া স্থূলের তত্ত্ব অনুভব করাইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম কারণ ও গুণাতীত তত্ত্বে লইয়া যাইতে সচেষ্ট। আমাদের মন বিষয়সুখে মুগ্ধ ও জড়িত, তাই তাহারা বিষয়সুখকে এমনভাবে ভোগ করিতে শিক্ষা দিলেন যাহার ফলে আমরা আস্তে আস্তে বিষয়ের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে বিষয়ীর দিকে

গিয়া উপস্থিত হইতে পারি। যাহার মন যে তত্ত্বে সীমাবদ্ধ তাহাকে সেই তত্ত্বের উপাসনার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে পর পর তত্ত্বগুলি ভেদ করিয়া আমাদিগকে পরিশেষে তত্ত্বাতীত পরমপদের দিকে লইয়া যাইতে ঋষিগণ ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাই সাধারণ জীবের জন্য ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের। এই দ্রব্যকে পদার্থ বলে। পদার্থের অর্পণের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পদার্থের স্বরূপ পরমপদ দেখাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত পরম-পদের দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই সাধারণ জীবের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদার্থ অর্পণের ভিতরে আমরা পদার্থের স্বরূপ অর্পণের প্রকৃত রহস্য দেখিতে পাই। সব দ্রব্য যে তাঁহার, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, আত্মীয়স্বজন ইহাদের কেহই যে আমাদের নয়, সবই যে তাঁহার, তাঁহার বলিযাই ইহারা যে আমাদের এত প্রিয়, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতরে এই তত্ত্বের উপলব্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইসব দ্রব্য বা পদার্থ অর্পণ করিতে হয়, আহুতি দিতে হয় দেবতাদের নিকটে।

সাধারণ মনুষ্য ভগবানের প্রকৃত দেবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না; তাই তাহাদিগকে ভগবানের প্রতিবিম্ব অবলম্বনে ভগবানের কাছে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রতিবিম্ব অবলম্বনে বিম্বের কাছে গিয়া উপস্থিত হওয়া—তটস্থ লক্ষণের ভিতর দিয়া স্বরূপ লক্ষণের নিকট পৌঁছানই দেবতা পূজার, মূর্ত্তি পূজার, প্রতীক পূজার উদ্দেশ্য। দেবতাদিগের মূর্ত্তি এমনভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া সাধারণ লোক লুব্ধ হইয়া তাঁহার কাছে যাইতে চেষ্টা করিবে। দেবতারা ভগবানেরই প্রতিবিম্ব, ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত, ভগবৎশক্তিতে-শক্তিমান। আমাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য তাঁহারা কতকটা সুন্দর চিত্তাকর্ষক আদর্শ মনুষ্যরূপে বর্ণিত, আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণে সুদক্ষ। আবার তাঁহারা

কতকটা ঈশ্বর—আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা—কল্যাণ-সাধনে তৎপর। তাঁহারা একাধারে কতকটা শ্রেয় এবং প্রেয়রূপে আনন্দদানে, বাঞ্ছা পূরণে সুদক্ষ। শ্রেয়রূপে উন্নতিবিধানে তৎপর। এই দেবতাদের ভিতর দিয়া যাহাতে আমরা ক্রমে সেই আদিদেবের নিকটে গিযা পৌঁছিতে পারি দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রষ্টা-দৃশ্য উভয়ের পারস্পরিক সাধনাঃ—দ্রব্যের স্বরূপোপলব্ধির ভিতরে আমরা দুইটি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাই,—একটা দ্রষ্টার সাধকের দিক হইতে—অপরটি দ্রব্যের দিক হইতে। সাধনার ফলে আমরা দ্রব্যের ভিতরে দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপের ভিতরে অগ্রসর হইবার শক্তি লাভ করি; আবার দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে আমাদের নিকট দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ আস্তে আস্তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। সিদ্ধি নির্ভর করে এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পরস্পর ক্রিয়ার উপরে—দৃশ্যের আত্মপ্রকাশ এবং দ্রষ্টার সাধনজনিত অন্তর্দৃষ্টির উপরে। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতরে আমরা দেখিতে পাই যজমান, হোতা অধ্বর্য্যু প্রভৃতির শুদ্ধ ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা। হবনীয় দ্রব্যের ভিতরে এমন কতগুলি দ্রব্য গ্রহণ করা হয় যাহা সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, যাহার সঙ্গে আমরা কতকটা সুপরিচিত—যাহা ভিতরকার ভাবের উদ্দীপক। আসল কথা এই যে, আমাদের ভিতরকার প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের প্রকৃত আমি আমাদের পরা ভাব—পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীভাবে আবৃত। দৃশ্য দ্রব্যগুলিও এই আবরণগুলিতে আবৃত। আমরা শুধু বৈখরী জগতে বাস করি, বৈখরী লইয়া ব্যস্ত। দ্রষ্টার সাধকের কাজ হইবে ক্রমে তাহার ভিতরকার স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত

স্বরূপে পরা অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করা এবং দৃশ্যের, হবনীয় দ্রব্যগুলির কাজ হইবে মানুষকে তাহার বৈখরী রূপের দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া ক্রমে তাহার পরা স্বরূপের দিকে লইয়া যাওয়া। এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যজমান ও হবনীয় দ্রব্যের আত্মপ্রকাশের উপরে নির্ভর করিবে যজ্ঞতত্ত্বের সিদ্ধিলাভ। যজ্ঞের সময় হবনীয় দ্রব্যগুলি তাহাদের সব স্তর ভেদ করিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইবে; দ্রষ্টা যজমানও নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া হবনীয় দ্রব্যের স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট থাকিবে। দাতা (giver) ও গ্রহীতা (receiver) ঠিক হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

প্রতীক বস্তুর ভিতর দিয়া পরম তত্ত্ব পরম পদের উপলব্ধি:—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে এবং সাধারণ পূজা-বিধির ভিতরে দ্রব্যগুলি মন্ত্রগুলি অর্পণ-প্রণালীগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাহাতে তাহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি স্তরে স্তরে আমাদের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পায়। ফুল তাহার সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ প্রকাশের ভিতর দিয়া আমাদের ভিতরকার সৌন্দর্য্য ও গুণাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে ঐসব সৌন্দর্য্য যে সেই পরম সুন্দরের মহিমা প্রকাশ করে এবং আমাদের ভিতরকার সদ্‌গুণ ও ভাবরাশিও যে সেই পরম সুন্দরেরই বিকাশ সেই ভাব ফুটিয়া উঠে। প্রতীক অবলম্বন করা হয় শুধু তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য। তত্ত্ব প্রকাশ পাইলে আর প্রতীকের ততটা প্রয়োজন থাকে না। তারপরে যজমান্ ঋত্বিক হোতা আদিকে এমন কতগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যাহার ফলে তাঁহার ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ এবং সেই স্বরূপের লীলারহস্য যজ্ঞক্রিয়ার

ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। অগ্নির আবাহন, দ্রব্যের শোধন, অর্পণের মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদির ভিতরে এমন কতগুলি রহস্য আছে যাহার ফলে সাধকের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে অগ্নির প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইয়া তাহাকে ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়। বাহ্যিক আহুতি প্রদানের মন্ত্রগুলি এমনভাবে সজ্জিত যাহাতে সাধকের ভিতর দিয়া প্রকৃত ত্যাগ রহস্য, দেবতা ও সাধকের ভিতরকার প্রকৃত আদান-প্রদান-রহস্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। দ্রব্যের বিশেষণগুলিও বিশেষ্যকে, তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বগুলিকে আস্তে আস্তে প্রকাশ করিতে থাকে। সংযত শুদ্ধ গ্রহীতা গ্রহণীয় পদার্থের ভিতরে লুক্কায়িত সব তত্ত্বগুলিকে গ্রহণ না করিযা ছাড়েন না। গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থও প্রাণের মানুষ পাইলে তাহার নিকট আর কিছুই গোপন করে না। তারপর মন্ত্রশক্তির উচ্চারণ করিবার প্রণালী এবং মুদ্রাদির প্রভাবে যজমানের মন দ্রব্যাত্মক হইতে স্বাভাবিকভাবে ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট হয়।

দ্রব্য বা পদার্থের অর্পণ তত্ত্বঃ—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ প্রথমস্তরের লোকের জন্য। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের ভাবনাত্মক যজ্ঞ এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে, প্রথম স্তরের কার্য্যগুলি সুসাধিত হইলে সাধকের চিত্ত তখন আপনা হইতেই দ্বিতীয় স্তবে গিয়া উপস্থিত হয়। পাদ্য সমর্পণের মধ্য দিয়া ইষ্টদেবকে স্নান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে শুদ্ধ হইয়া স্নান করিবাব ব্যবস্থা দৃষ্ট হয। তারপবে স্নানের মন্ত্রগুলির মধ্যে সাধকের চিত্তের শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিজের স্নান, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের স্নান পর্য্যন্ত গিয়া ক্রমে ইষ্টের স্নানে পর্য্যবসিত হয়। পুষ্পাদি সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরকার যাবতীয় সদ্‌গুণগুলি জাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে সেইসব সদ্‌গুণগুলিও যে

ভগবানেরই বিভূতি ছাড়া আর কিছু নয় তাহা অনুভব করাইয়া সেই-গুলিকে ভগবৎ-তৃপ্তি সাধনে, ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণে লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। যজ্ঞের উপকরণ দ্রব্য, যজ্ঞের মন্ত্র, যজ্ঞের সাধন প্রণালী আমাদিগকে যজ্ঞের ভিতর দিয়া মূল কারণসত্তায় লইয়া যায়।

সর্ব্বত্রই পূজারীকে ইষ্টের দিকে, সাধককে সাধ্যের দিকে, জীবকে শিবের দিকে লইয়া গিয়া জীব ও শিবের ভেদভাব দূর করিয়া অন্ততঃ জীবকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ভগবল্লীলার সহায় করিয়া দিবার একটা সুন্দর ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভগবান আমাদের ভিতরে বাহিরে কিভাবে লীলারত তাহা বুঝাইয়া দিয়া সাধককে ভগবদ্ ভাবে পরিভাবিত করিয়া জীব জগৎ কিভাবে ভগবানের পরিণতি বা বিবর্ত্তন তাহা বুঝাইয়া দিয়া সাধককে সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা দান করে। তখন প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্ব সাধকের অনুভবে আইসে। তারপর কেবলাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভগবানের লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করা হয়। তখন অনুভূত হয়, সবই যেন তাঁহার রস-বিগ্রহ, সবই যেন চিনিময় আস্বাদ করা যায়। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ মন্ত্র তখন সাধকের অনুভবে আইসে। এইভাবে ভগবানই যে সব—তিনি ছাড়া যে আর কিছুই নাই এই তত্ত্ব অনুভবে আসিয়া সাধককে কেবলাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়।

ভাবনাত্মক যজ্ঞঃ—ভাবনাত্মক যজ্ঞ অনেকটা মানসিক পূজার ন্যায়। আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিবার সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে দৃষ্ট হয়। আমাদের হৃদয়কে কামনা-বাসনা-আসক্তি স্বার্থ নিজ-সুখস্পৃহা অহঙ্কার প্রতিষ্ঠার মোহ এবং যাবতীয় সংস্কার কল্পনা-জল্পনা রহিত করিয়া চিত্তকে শূন্যে পরিণত করিবার সুন্দর ব্যবস্থা এখানে লক্ষিত

হয়। তাহার পরে, সেই শূন্যে চিত্তকে যাবতীয় ভগবদ্‌ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, ও ভগবদ্ধ্যান ও ভগবৎ-সেবার যোগ্যতা প্রদান করা হয়। তখন নিজের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্ব ভূতের ভিতরে বসিয়া ভগবান কিভাবে লীলারত আমরা সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করি।

ভাবনার তাৎপর্য্য:—ভাবনার অর্থ চিন্তন—ধ্যান মনন ও নিদিধ্যাসন—যাহার ফলে সাধক তাহার ইষ্টভাবে পরিভাবিত হইয়া তৎ-সারূপ্য প্রাপ্ত হইতে পারে (ভজেৎ ভ্রমরকীটবৎ)। ধ্যাতা ভাবনার ফলে ধ্যেয়রূপে পরিণতি লাভ করে। আমরা জানি, ছানার গোল্লাকে রসে ভাবনা দিয়া কিরূপে রসগোল্লা তৈয়ার করা হয়; কবিরাজগণ কিভাবে দ্রব্যবিশেষকে রসবিশেষে ভাবনা দিয়া সেই দ্রব্যকে রসাত্মক করিয়া তোলে। রস দ্রব্যের পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে রসময় করিয়া তোলে তাহাই ভাবনা দেওয়া। লৌহের চুম্বক সান্নিধ্যে চুম্বকরূপে পরিণতিও ভাবনাত্মক যজ্ঞের দৃষ্টান্ত। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন—এমন ভাবে জগতের প্রতিতত্ত্বে ঢুকিয়া গেলেন যে জগৎ তখন ভগবৎ-বিধান দ্বারা পূর্ণরূপে পরিভাবিত হইয়া গেল। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্—জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সবই ভগবান দ্বারা পরিভাবিত; তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া সকলের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। সকলকে ভগবৎ ভাবে পরিভাবিত করিয়া তোলাই হইল তাঁহার সাধনা; ইহার নাম ভগবানের ভাবনাত্মক যজ্ঞ। তিনি নিজে প্রকাশ পাইতে না চাহিলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে প্রকাশ করে। আমাদের ভগবানকে জানিতে ও পাইতে যে প্রবৃত্তি এবং চেষ্টা তাহারও মূলে রহিয়াছে ভগবানের

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা। লুকোচুরী খেলাই যে তাঁহার স্বভাব।

সেইরূপে আবার আমাদের ভাবনাত্মক যজ্ঞ হইবে ভগবান্ কিরূপে ব্যষ্টি-ভাবে আমাদের প্রতিতত্ত্বে, সমষ্টি ভাবে জগতের প্রতিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া আমাদের ও জগতের সব তত্ত্বগুলিকে তাঁহার ভাবে পরিভাবিত করিয়া তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছুক সেই রহস্য অবগত হইয়া তিনি আমাদের ভিতর দিয়া যে কর্ত্তব্য সাধন করিতে ইচ্ছুক তাঁহার সে কার্য্য তাঁহার ইচ্ছামত সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার লীলার সহায় হওয়া। আমাদের ভিতরে ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া আমাদের প্রতিতত্ত্বে ভগবানের লীলা দর্শন করিয়া সেই তত্ত্বগুলিকে ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত করিয়া তুলিব। তখন আমাদের দেহ প্রাণ মন ভগবৎ-লীলাভূমিতে প্রকৃত বৃন্দাবনধামে পরিণত হইয়া যাইবে। তখন ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া আমাদের আর অপর কার্য্য থাকিবে না। আমাদের মানসিক পূজা অষ্টকালীয় লীলা চিন্তন ইত্যাদি এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের সহায়। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত; তিনি কৃষ্ণরসে ডুবিয়া কৃষ্ণরসে পরিভাবিত হইয়া ভাবনার ফলে কৃষ্ণময়ী হইয়া গিয়াছিলেন,— 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলী মাধাই।' তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের শব্দ স্পর্শ-রূপ আদির দ্বারা এমনভাবে পরিভাবিত হইয়াছিল যে, তখন তাঁহার চোখ কৃষ্ণের রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইত না, কানও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইত না। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণের শব্দস্পর্শাদি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করিতে পারিত না, মনও কৃষ্ণের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিত না; কৃষ্ণগত প্রাণা শ্রীরাধা তখন সম্পূর্ণরূপে

কৃষ্ণময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'রূপে ভরল দিঠি' গানটির ভিতর দিয়া এই ভাবের সুন্দর একটি পরিচয় লাভ করি। যজ্ঞের চিন্তা করিতে করিতে যজমান এইরূপে যজ্ঞের ভাবে পরিভাবিত হইয়া যান যে তখন সাধক নিজেই যেন যজ্ঞময় পুরুষে পরিণত হইয়া পড়েন। তখন যজ্ঞের সমস্ত রহস্য সমস্ত তত্ত্ব তাহার জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাঁহার সমস্ত জীবন সব কাজ যজ্ঞ রহস্য প্রচার করিতে আরম্ভ করে।

ভাবনাত্মক যজ্ঞের মূল লক্ষ্য :—সবতত্ত্বে সর্ব্বভূতে সর্ব্ব-কার্য্যে ভগবৎ-লীলা দর্শন, ভগবৎ-লীলানুভূতিই ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। এই যজ্ঞের ফলে গ্রহউপগ্রহের গতির ভিতরে, সৃষ্টি-স্থিতি লয় ব্যাপারে ষড়্‌বিধবিকারের খেলায় অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের ভিতরে—শিশুর খেলায়, যুবতির সোহাগে, মায়ের স্নেহে, রক্তের গতিতে, প্রাণের ক্রিয়া ও বিষয়গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবৎ লীলা দর্শন করিবার ব্যবস্থা দেখাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রধান কাজ। তখন বিষয়োপভোগরচনা পূজায় পরিণত হয়, শয়নে প্রণাম, বিহারে প্রদক্ষিণ, আহারে অন্ননিবেদন ক্রিয়া সাধিত হইয়া সমস্ত জগৎ নন্দনবনে, সমস্ত কর্ম্ম আরাধনায় পরিণতি লাভ করে।

সর্ব্বত্র যজ্ঞ দর্শন :—সর্ব্বব্যাপী এক বিশাল ব্রহ্মসত্তা কারণ রূপে থাকিয়া কিভাবে সব কার্য্যে সব পদার্থে সব নামরূপে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত তাহার জ্বলন্ত অনুভূতিলাভই ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। সব পদার্থে ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব এবং সব ক্রিয়ায় ব্রহ্মের প্রাণশক্তির, ক্রিয়া-শক্তির, কর্ত্তৃত্বানুভূতি (সর্ব্বত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন) সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করার নামই ভাবনাত্মক যজ্ঞ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক আশ্চর্য্য কৌশলে সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকে নিষ্কাম ভাবনাত্মক যজ্ঞে

পর্য্যবসিত করিয়াছেন। তাহার পরে সবই যে এক ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি সেই তত্ত্ব দেখান হইয়াছে। সেখানে যজ্ঞের উপাস্য অগ্নি আদিতে যজ্ঞীয় মন্ত্রে ও সামগানে, যজ্ঞের উপকরণে—সর্ব্বত্রই এক প্রাণশক্তির অনুভব করিতে আমরা আদিষ্ট। একই প্রাণশক্তি হইতে কিভাবে সব পদার্থ অভিব্যক্ত, একই প্রাণশক্তি কিভাবে কণ্ঠ তালু জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে আহত হইয়া বিবিধ মন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয় সুন্দরভাবে তাহা দেখান হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ আকাশের নক্ষত্রে, চন্দ্র-তারকায়, বৃষ্টিবাদলে, নদীর প্রবাহে, বায়ুর গতিতে, আগুনের তাপে, পাখীর গানে, বালকের হাসিতে, ফুলের শোভায়—সর্ব্বত্র সামগান শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র যজ্ঞদর্শন করিয়া যজ্ঞেশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের নিকট সব জীবই যেন সামগানে রত। সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবতারাও সেই এক প্রাণশক্তির কথাই মনে করাইয়া দেয়—উদ্দেশ্য ছিল সকল বস্তুর এক মৌলিক একত্ব সর্ব্বত্র অদ্বৈতানুভূতি জাগ্রত রাখা। বাহিরে ভিতরে কিভাবে একই প্রাণশক্তি লীলারত মধুবিদ্যায়, দেবগণের কলহে, বৈশ্বানর বিদ্যায় সেই একই তত্ত্ব সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যচন্দ্রাদিকে একই বিরাট চৈতন্যের অবয়বরূপে এবং আমাদের চক্ষুকর্ণাদি আধ্যাত্মিক অঙ্গগুলিকে উহাদের অংশরূপে উহাদের সহিত অভেদরূপে ভাবিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গন্যাস প্রভৃতি তত্ত্ব এই রহস্যই প্রচার করে। ফলে ব্যষ্টি দেহ ব্যষ্টিভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়া একটি সুন্দর বিশ্বরূপ জাগিয়া উঠে। এই বিশ্বকেও তখন বিরাট পুরুষের অঙ্গ বলিয়া মনে হয়। স্বাতন্ত্র্যভাব দূর হওয়ার ফলে অসুরভাবের পরিবর্ত্তে দেবভাবের স্ফুরণ হয়। যে প্রাণশক্তি আধিদৈবিক

সূর্য্যাদিতে সমষ্টিভাবে অভিব্যক্ত সেই প্রাণশক্তি যে ব্যষ্টি দেহের আধ্যাত্মিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া অসীম ও সসীমের মধ্যগত ভেদভাব দূর হইয়া একটি সুন্দর দেবভাব উৎপন্ন হয়। ব্যস্ত-সমস্ত হোম এই ভাব উপলব্ধির সহায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদেও এই ভাবের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের লীলা উপলব্ধি করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য। আমরা কিরূপে ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া আছি, ব্রহ্মরস কি করিয়া আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মভাবে পরিভাবিত করিতে সচেষ্ট, ব্রহ্মরসকে কিভাবে আমাদের প্রতিতত্ত্বে অবাধিতভাবে কাজ করিতে দেওয়া যায় তাহাই ছিল ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীক উপাসনা :-- বেদান্তের প্রতীক উপাসনাও এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের মহিমা প্রকাশ করে। প্রতীক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গ অবয়ব। নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টের আরোপ দ্বারা সাধন করিতে করিতে কিভাবে কার্য্যবর্গে কারণ-সত্তার অনুভূতি দৃঢ় হয়, 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ' বেদান্ত দর্শনের এই সূত্রে আমরা তাহার আভাস পাই। দেহের পঞ্চকোষে, দেহের প্রতিতত্ত্বে ব্রহ্মানুভূতি লাভ হইয়া গেলে তখন আর প্রতীকের দরকার থাকে না; তখন সকল অবলম্বন গিয়া এক ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীক উপাসনার মূল ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। আদিত্য আকাশাদি বিশেষ্যে প্রদত্ত বিশেষণ-গুলি (আকাশ হইতে সব জাত ইত্যাদি) ব্রহ্মভাবদ্যোতক; বিশেষণ-গুলি জড়বর্গে অনুস্যূত কারণসত্তার দ্যোতক। কার্য্যবর্গের যে আর একটা স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সবই যে এক কারণ সত্তায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়।*

---

* এই প্রসঙ্গে কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'উপনিষদের উপদেশ' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

ভাবনাত্মক যজ্ঞের সাধন প্রণালী ঃ— ভাবনাত্মক যজ্ঞের ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যায়। সমস্ত তত্ত্বের ভিতরে ব্রহ্মসত্তা এবং সমস্ত কার্য্যেব ভিতরে একই প্রাণশক্তির ক্রিয়া উপলব্ধ হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞেব সাধন প্রণালীর ভিতবে আমবা এই তত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। সেখানে আমবা সব পদার্থে সব ক্রিয়া-কলাপের ভিতবে যজ্ঞতত্ত্ব আস্বাদ করিবাব উপদেশ পাই। চিৎশক্তির আবুঞ্চন ও প্রসারণের ভিতরেও যজ্ঞ ভাবনা করিবার ব্যবস্থা দেখা যায।

১। **সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে যজ্ঞ ভাবনা** ঃ—একই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন তালে স্পন্দিত হইযা কিভাবে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সব পদার্থ সৃষ্টি করিযাছেন তাহা চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ বাক্য মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলি যে আধিদৈবিক সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতিব রূপান্তর মাত্র, আধিদৈবিক শক্তিগুলিই জীবদেহে ইন্দ্রিযাকাবে অভিব্যক্ত, একই প্রাণের কারণাংশ সূর্য্য চন্দ্রাদিতে তেজোরূপে এবং প্রাণিদেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয-রূপে ব্যক্ত এবং পঞ্চভূতাদিও যে একই প্রাণেব কার্য্যাংশের বিকাশ, ধ্যানের সাহায্যে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। একই প্রাণশক্তি যে গ্রহ-উপগ্রহাদি, আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়াদি, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক সর্ব্ব পদার্থে পরিণত ও লীলারত এই তত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে। শ্রীভগবান প্রাণরূপে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, জল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী আদির ভিতরে থাকিয়া কিভাবে আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, আমরা তাহাদের নিকট কতটা কৃতজ্ঞ এই উপকার ও প্রত্যুপকার রহস্য চিন্তা করিতে আমরা উপদিষ্ট।

২। **প্রকৃতির সব কাজে যজ্ঞ ভাবনা** ঃ—ভগবান যজ্ঞের সঙ্গে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই যজ্ঞের বিরাম নাই। জীব জগৎ যজ্ঞ না করিয়া থাকিতে পারে না। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, নরগণ, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, এমন কি গ্রহউপগ্রহ, অন্তরীক্ষ, আকাশ-বায়ু, অগ্নিজল, বৃক্ষলতা, নদনদী সকলেই যজ্ঞ লইয়া বিব্রত, সকলেই আপন আপন নির্দ্ধারিত যজ্ঞ করিতে বাধ্য। ভাবনাত্মক যজ্ঞের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি, সব কাজ তাহা হইতে আসিতেছে, আবার তাহাতে গিয়া লীন হইতেছে। তাঁহার এই লীলার অনুভূতি ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

৩। **সর্ব্বভূতে যজ্ঞভাবনা** ঃ—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কৃষক কুলি-মজুর সব প্রাণী—এমন কি শত্রুর ভিতরে বসিয়াও ভগবান কত রূপে কত ভাবে আমাদের সেবা করিতেছেন, আমরা কিরূপে তাহাদের প্রত্যুপকার করিতে পারি এই চিন্তার ভিতর দিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞের অনুশীলন করিবার ব্যবস্থা আছে।

৪। **দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনে যজ্ঞভাবনা ও নিজের ভিতর যজ্ঞদর্শন** ঃ—আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কে সৃষ্টি করিয়াছেন, কে ইহাদের ভিতর দিয়া আমাদের বিষয় গ্রহণের সহায় হইতেছেন, কে আবার বিষয়াকারে আমাদের গ্রাহ্য হইয়া আমাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন, আমরা কিভাবে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিতে পারি, তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি, কি উপায়ে সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যের ভিতরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। কে আমাদের চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন, মনের ভিতর বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, ইহার অনুভূতি লাভ করিতে হইবে। দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনের ভিতরেও যজ্ঞ ভাবনা করিতে হইবে।

৫। (ক) **নিঃশ্বাস - প্রশ্বাসে যজ্ঞ-ভাবনা ঃ** — একই প্রাণশক্তি কোথা হইতে কেন কিভাবে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়া আমাদের জীবিত রাখিয়াছে, কিভাবে এইসব কাজ তাঁহার ইচ্ছামত সাধিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা সফল করিবার সহায় হইতে পারে এই তত্ত্বের অনুচিন্তনও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। জপযজ্ঞও ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রাণবায়ু পরা অবস্থা হইতে আসিয়া পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরীর ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়া আবার বিপরীত ক্রমে গিয়া পরায় পর্য্যবসিত হইতেছে, কূটস্থে বসিয়া এই তত্ত্বের উপলব্ধি করার ব্যবস্থা আছে। অজপা জপ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(খ) **ভোজনাদি ব্যাপারে যজ্ঞের ভাবনা ঃ**--আমাদের ভোজ্যরূপে কে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কাহার ইচ্ছায় কাহার শক্তিতে ইহা আগত, আমাদের ভিতরে বসিয়া কে ভোজন করিতেছেন, কে এই সব ভুক্ত দ্রব্যকে রক্তে বীর্য্যে ওজে এবং সুধায় পরিণত করিয়া আমাদের সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন, কিভাবে আমাদের প্রত্যেক গ্রাস অন্ন প্রাণের নিকট, ভগবানের নিকট আহুত হইতে পারে, অর্থাৎ আমাদের মুখের ভিতরে বসিয়া তিনিই যে আহার করিতেছেন, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ভিতরে আমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের আহারক্রিয়ার ভিতরে ভুক্ত দ্রব্যের যে রস, রক্ত, বীর্য্য, ওজ ও সুধায় পরিণতি তাহা এই যজ্ঞের ফল। সাত্ত্বিক অন্ন সাত্ত্বিক ভাবে ভোজন এই পরিণতির সহায়। আমাদের সব আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া যে একটি মহান যজ্ঞ সাধিত হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(গ) **অন্তর্য্যামিস্মরণে যজ্ঞ ভাবনা** ঃ—কে আমাদের ভিতরে বসিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে, সুখী করিতে, তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইতে ব্যস্ত, এই জন্য তিনি কত ভাবে কত চেষ্টা করিতেছেন, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা যাহাতে ভালভাবে জীবিত থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাও যজ্ঞ।

(ঘ) **কর্ত্তৃত্বাভীমান ত্যাগে যজ্ঞ-ভাবনা**—আমাদের সব কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, আমরা কিভাবে চলিলে তাঁহার এই প্রকাশ সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয় তাহার অনুচিন্তনও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। আমাদের রূপগ্রহণ যে চক্ষুর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমাদের কার্য্য-কলাপ যে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের প্রেম ও আনন্দ যে আমাদের চিত্তের ভিতর দিয়া তাঁহারই প্রকাশ, এমন কি আমাদের এই যন্ত্রগুলিও যে তাঁহারই সৃষ্ট লীলার উপকরণ, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার হইতে চেষ্টা করাও এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত। তিনিই যে একাধারে যন্ত্র ও যন্ত্রীরূপে লীলারত এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

(ঙ) **বাল্য-যৌবন - বার্দ্ধক্য - মৃত্যুতে যজ্ঞ- ভাবনা**—আমাদের এই বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্য—এমন কি মৃত্যুর ভিতর দিয়াও কে আমাদিগকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাহার অনুভূতি লাভের চেষ্টা করা এবং যাহাতে আমাদের এই গতি পূর্ণভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হয় তাহার চেষ্টা করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত।

(চ) **জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যজ্ঞভাবনা**—আমাদের জাগ্রতের বিষয় গ্রহণে, নিদ্রায় স্বপ্নে, সুষুপ্তির আনন্দানুভূতিতে, প্রাণ-মনের আত্মাহুতিতে যজ্ঞভাবনা করিতে হইবে। শব্দস্পর্শাদি যে পরা অবস্থা হইতে আসিয়া আবার পরা অবস্থায় পর্য্যবসিত হইতেছে, অর্থাৎ বিষয়রূপে ভগবান এবং বিষয়ের গ্রহিতারূপেও ভগবান এই তত্ত্ব আস্বাদ করিতে হইবে।

(ছ) **ইন্দ্রিয়াদির বিষয়-গ্রহণে যজ্ঞভাবনা**—আমাদের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গ্রহণের ভিতরে প্রাণাগ্নিহোত্রের চিন্তা করিতে করিতে সব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও ক্রিয়াগুলি ব্রহ্মোপাসনায় পর্য্যবসিত হইবে। অধ্যাত্মযোগ অহংগ্রহোপাসনা অনুভবে আসিবে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি সহজ হইয়া পড়িবে। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (কঠ)। তখন সমস্ত শান্ত হইয়া গিয়া ব্রহ্মোপলব্ধিতে পর্য্যবসিত হইবে। দহর বিদ্যায় আমরা হৃদয়ে স্থির হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মের লীলাদর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করি। তখন সব ব্যবহারিক কার্য্য পারমার্থিক কারণতত্ত্বে লীন হইবে। বলয় দেখিয়াও সুবর্ণের বোধ ভাসিবে; কার্য্য দেখিয়াও কেবল কারণ সত্তা ফুটিয়া উঠিবে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যে তাঁহা হইতে আসিতেছে এবং তাঁহাতে গিয়া লয় পাইতেছে, এই অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ।

৬। **নাম রূপের ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসানে যজ্ঞভাবনা**—নামরূপ যে ব্রহ্মসত্তায় বিবর্ত্তিত এবং ইহারা যে ব্রহ্মসত্তায় স্থিত থাকিয়া আবার ব্রহ্মসত্তায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে সচেষ্ট, ইহার অনুভূতি লাভও এই যজ্ঞের অন্তর্গত।

৭। প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মে পৌঁছিবার চেষ্টা করা এবং প্রকৃত আমির

ভিতরে অহংগ্রহোপাসনার ভিতরেও যজ্ঞভাবনা করিতে হইবে। বেদান্তের প্রতীক উপাসনাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ।

৮। সব পদার্থকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে ব্রহ্মের মহিমা ব্রহ্মের বিভূতি তাঁহারই লীলাস্বীকৃত বিগ্রহরূপে অনুভবের চেষ্টাও যজ্ঞ। সমস্ত বস্তু সমস্ত বিশ্ব যে ব্রহ্মের বিশেষণ, এই বিশেষণগুলির ভিতর দিয়া যে সেই বিশেষ্য মূল ব্রহ্মবস্তু আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন এই অনুভূতিও ভাবনাত্মক যজ্ঞ।

৯। যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে যজ্ঞীয় উপকরণ দ্রব্যে, যজ্ঞীয় মন্ত্রে যজ্ঞ-সাধক হোতাদের ভিতরে ব্রহ্মভাবনার ব্যবস্থা আছে। ইহারা সকলে যে কারণরূপ ব্রহ্মের কার্য্যরূপ ঘনীভূত অবস্থামাত্র তাহা চিন্তা করিতে হইবে। ব্রহ্মই যেন লীলার ছলে এই সব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের ভিতরেও দ্রষ্টারূপে তিনি বর্ত্তমান। এইভাবে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ মন্ত্রের উপলব্ধি লাভ করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ।

১০। ঋগবেদে সব দেবতার দ্বিবিধ রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কার্য্যরূপ কারণরূপের প্রতীক। সর্ব্বত্র কার্য্যরূপ অবলম্বনে কারণরূপে যাইবার উপদেশ দেখা যায়। কারণরূপ বিষ্ণুর পরমপদ কার্য্যরূপ তাহার অর্থ বা বহিঃপ্রকাশ। পদার্থ অবলম্বনে পরমপদে গিয়া পৌছিবার চেষ্টাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। আমরা এই যে জগৎ দেখিতেছি ইহা কার্য্য—এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ইহার কারণরূপে কিভাবে সব পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া সব করিতেছেন তাহার অনুভূতি লাভ করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করে। সব অস্তিত্ব ব্রহ্ম হইতে আসিয়া

আবার ব্রহ্মে গিয়া পর্য্যবসিত হইতেছে, এক অবিভক্ত সত্তা কিভাবে সব বিভক্তির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আবার গিয়া সেই এক অবিভক্ত তত্ত্বে লীন হইতেছে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

কেবলাত্মক যজ্ঞ—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ যেমন উপযুক্ত অনুশীলনের ফলে আপনা হইতে গিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞে পর্য্যবসিত হয়, ভাবনাত্মক যজ্ঞও সেইরূপ সব পদার্থের সব কাজের ভিতরে মূল এক কারণ-সত্তার লীলা দর্শন করাইয়া সর্ব্বত্র এক অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তার দিকে লইয়া যায়।

যজুর্ব্বেদে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রাধান্য, সামবেদ ভাবনাত্মক যজ্ঞের তত্ত্ব লইয়া বিব্রত। ভাবনাত্মক যজ্ঞের পরে অনুভবে আসে কেবলাত্মক যজ্ঞ। ঋগ্‌বেদ এই কেবলাত্মক যজ্ঞ লইয়া বিভোর। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সেই একই ভগবান যে সব হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি ছাড়া যে আর কেহ বা কিছু নাই, সবই যে তাঁহার লীলাস্বীকৃত বিগ্রহ এই তত্ত্ব আমরা আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। এখানকার আহুতির প্রধান মন্ত্র "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি। এখানে আমরা আস্বাদ করিতে পারি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" একমাত্র চিনিই যেন বর্ত্তমান। সেই চিনিই যেন বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে সর্প-ব্যাঘ্র আদি বিভিন্ন জীবরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত। এখানে ইদং দৃষ্ট হইলেও সেই ইদং ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নহে। ইহা যেন রসেরই, ব্রহ্মেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন। এই পরিণতি বা বিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হয় শুধু আমাদের অনুভূতি লাভ করার জন্য। আসলে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্—তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই—সারতত্ত্ব

যে বাক্যমনের অগোচর পরম সত্য—এই তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের ব্যবস্থা। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞ আরাধনা উপাসনা সাধন ভজন মূলে একই তত্ত্ব। কেবলাত্মক যজ্ঞে সবই ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। সবই যেন তাঁহার রসবিগ্রহ—সবই অমৃতময় চিনিময়। তখন যাহা কিছু আস্বাদ করা হয় সবই যেন রসের ঘনীভূত মূর্ত্তি। ইদং (যত কিছু দৃশ্য) সর্ব্বং (সে সব) ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া তখন আর যে কিছুই অনুভবে আসে না। ইদং লোপ পাইলে—অহং-এ পর্য্যবসিত হইলে আর যে কথা থাকে না, ভাষা থাকে না। তখনই সাধক রাধারাণীর ন্যায় ভগবৎ-ভাবে বিভোর। তখন সিদ্ধের যে অবস্থা লাভ হয় সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিবহাঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বৈব স্থিতিরস্য মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃপ্রাণাঃ শরীরং গৃহম্
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরঃ
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনা॥

শয়নে প্রণামজ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।

যত শুন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে
মা যে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
আহার কর মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মারে॥

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ শুদ্ধি-প্রধান, ভাবনাত্মক যজ্ঞ ভক্তি-প্রধান– ইহাই সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণার অনুকূল ; কেবলাত্মক যজ্ঞ জ্ঞান-প্রধান, ইহাই সিদ্ধের অনুভূতি। যজ্ঞের মধ্যে ভাবনাত্মক যজ্ঞেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যখন নিজে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-ধ্যানে বিভোর হইয়া যায়, তখন তাঁহার সব তত্ত্বগুলি ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত হইয়া যায়। তখন সে নিজে ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত হইয়া প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক তত্ত্বে, প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানের লীলা দর্শন করিতে করিতে ভগবন্ময় হইয়া পড়ে।

—ঃ—

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

প্রাচীন কালের বৈদিক অনুষ্ঠান যজ্ঞ এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন যজ্ঞগুলি একটা অতি উন্নত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলেও তাহার ভিতরে যে কালের প্রভাবে অনেক আগন্তুক ময়লা আসিয়া জুটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনেকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড যে শুধু একটা বাহ্যিক শুষ্ক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। এমনকি অনেকগুলি যজ্ঞের মধ্যে নানারূপ হিংসার ভাব প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই,—যাহার ফলে করুণার অবতার ভগবান বুদ্ধ যজ্ঞাদি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সাধনতত্ত্ব যে কতগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইবার জিনিষ নহে, ইহা যে একান্তই একটা মানসিক সংযম ও শুদ্ধির ব্যাপার তাহা সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে সংযম স্বার্থত্যাগ ও সেবাধর্ম্ম যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে শ্রৌতযজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বসিল। এই সময় হইতে ঋণশোধাত্মক কর্ম্ম এবং জীব-সেবা প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিল।

আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে মহাভারতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিশিষ্টভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। অনেক শ্রেষ্ঠ সাধক পণ্ডিতের মতে আমরা নিত্য

পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সকল যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্যগুলি অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়া যাইবে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈববলির্ভৌ তো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

১। **ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ**ঃ—জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রচার আচরণ ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঋষিদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে—যে সকল ঋষি ও পণ্ডিতগণ জ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানের বহুল প্রচারের দ্বারা এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া সেই সবঋষিদের শ্রদ্ধা ও পূজা করিতে হইবে। আমরা যেমন তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের নিকট হইতেও তদ্রূপ যাহাতে সকলে সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যাহাতে দিন দিন জ্ঞান পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই ঋষিদের শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ এবং ভগবৎ-সকাশে তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করিয়া আমাদের ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

২। **পিতৃযজ্ঞ**ঃ—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সুসন্তান উৎপাদনের দ্বারা বংশের গৌরব রক্ষণ ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আমাদের পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ভিতরে আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং সজ্জন ও দীনদুঃখীদের ভোজন ও দক্ষিণা দানের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া তাহাদের শুভ ইচ্ছার ফলে আমরা তাঁহাদের (পিতৃপুরুষদের) তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকি। সুসন্তান উৎপাদন এবং তাহাদিগকে সৎ-

শিক্ষা প্রদান করিয়া আমরা বংশের গৌরববৃদ্ধির সহায় হইয়া পিতৃগণের আনন্দবিধানের সহায় হই। মা বাপের নিকট আমাদের ঋণ কিছুতেই শোধ হইবার নহে; তথাপি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের আত্মার শান্তির জন্য ভগবৎ সকাশে প্রার্থনা দ্বারা এবং তাঁহাদের সুখ-শান্তির কারণ হইয়া কতক পরিমাণে পিতৃঋণ শোধ করিতে সমর্থ হই। বলা বাহুল্য, এইসব কাজগুলি শ্রাদ্ধ ও তর্পণের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **দৈবযজ্ঞ**ঃ—দেবতা ভগবৎ-প্রতিবিম্ব, প্রকৃতির বিভিন্নতত্ত্বে অধিষ্ঠিত ভগবৎ-চৈতন্য। (দেবতাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। আমাদেব ব্যষ্টিদেহের প্রতিতত্ত্বে এবং জগতের সব তত্ত্বে ভগবৎ-চৈতন্য কিভাবে লীলারত সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া সেই তত্ত্বগুলি যাহাতে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া পূর্ণ শক্তিযুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিয়া আমরা দেবগণের তৃপ্তিবিধান করিতে পারি। তখন দেবগণও তৃপ্ত হইয়া আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন। মনে রাখিতে হইবে দেবগণ সমষ্টিভূত জগতের বিভিন্নতত্ত্বে অধিষ্ঠিত চৈতন্য,—যাহার ব্যষ্টিগত ভাব লইয়া আমাদের দেহস্থ বিভিন্নতত্ত্ব উৎপাদিত হইয়াছে, যেমন, সূর্য্য হইতে আমাদের চক্ষু, চন্দ্র হইতে আমাদের মন। সমষ্টির কল্যাণসাধনে যে আমাদের ব্যষ্টিগত জীবের কল্যাণ সাধিত হইয়া যায় এই তত্ত্ব এখানে চিন্তনীয়। বৈদিক ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে হোমাদি ক্রিয়াব ফলে সমষ্টিভূত চৈতন্যরূপ দেবগণের অভাব পূরণ হইয়া থাকে, তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। সূর্য্যের তৃপ্তি সাধনের ফলে আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আনন্দগিরি বলেন, যজ্ঞে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যগুলিতে অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞীয় ধূম-আদি বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মিপথে উত্থিত হইয়া জলীয় বাষ্পসহ

মিলিত হইয়া ইহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে; তাই যজ্ঞকে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিরোধক বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানমতে যজ্ঞীয় বাষ্প মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বৃষ্টি বর্ষণের সহায় হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে হবনীয় দ্রব্য, হবনীয় কাষ্ঠগুলি বিষনাশক, বায়ুশোধক এবং পৃথিবীর উর্ব্বরতা সম্পাদক। সুতরাং দৈবযজ্ঞ দেবগণের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য আয়ুঃ ও সুখবর্দ্ধনের সহায় হয়।

৪। **ভূতযজ্ঞ** ঃ—পশুপক্ষী ও উদ্ভিদাদির সেবা। প্রাচীন ঋষিগণ জীবমাত্রকে পোষাকপরা শিব মনে করিতেন। আমরা যে, সকল জীবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই তত্ত্ব তাঁহারা অতি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা জীবের সেবাকে শিবের সেবা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

৫। **নৃযজ্ঞ** ঃ—স্বধর্ম্মপালন দ্বারা নিজের দেশের ও জীবের উন্নতি ও শান্তির সহায় হওয়া। নৃযজ্ঞ আসলে জীবের সেবা। প্রাচীন কালে মনুষ্যজাতি এত অভাবপীড়িত ছিল না; জীবিকা-অর্জ্জনে, আত্মরক্ষায় প্রায় সকলেই সমর্থ ছিল; তাই অতিথির সেবাকেই নৃযজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

মোটের উপরে সৃষ্টির রাজ্যে আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে, উন্নতিলাভে অসমর্থ; তাই সকলের নিকটেই আমরা ঋণী। যাঁহাদের দ্বারা আমরা উপকৃত তাঁহাদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। দৈবযজ্ঞের অভাবে আমরা স্বাস্থ্যহীন, আয়ুহীন, অর্থহীন, অন্নহীন, ব্যাধি-দুঃখের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছি। ঋষিযজ্ঞের অভাবে আমাদের

জ্ঞান কূপবদ্ধ, উন্নতিহীন এবং শ্রীহীন। এখন কেবল প্রাচীনা বৃদ্ধাদের অঞ্চল ধরিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধের ন্যায় আমরা চালিত ; সব সভ্যজাতির নিকট পদানত ও লাঞ্ছিত। পিতৃযজ্ঞের অভাবে সভ্যতার আদর্শ ঋষিদের বংশধরগণ আজ সভ্যসমাজে বংশের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত। নৃযজ্ঞের অভাবে আমরা স্বার্থপর, চিন্তাব্যাধি-দুঃখ-হতাশে পূর্ণ। ভূত-যজ্ঞের অভাবে (দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি খাদ্য-শস্য, ফলমূল ভোজনের অভাবে) আমরা দুর্ব্বল, রুগ্ন, অল্পায়ু ও স্বধর্ম্মপালনে অসমর্থ। দৈব-যজ্ঞ এখন লোকদেখান বাহ্য পূজায়, ঋষিযজ্ঞ অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনে, পিতৃযজ্ঞ এখন আভিজাত্যের অচ্ছুতধর্ম্মের হিংসাদ্বেষে আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধাদিতে, নৃযজ্ঞ ধনীর বৃথা তুষ্টিবিধানে, ভূতযজ্ঞ ঘোড়া, কুকুরাদি পালনে পর্য্যবসিত।

—:০:—

পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ

ব্যাকরণগত অর্থঃ পুরুষমেধ ও নরমেধতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে পুরুষতত্ত্ব ও নরতত্ত্ব; তাহার পরে বুঝিতে হইবে মেধতত্ত্ব। পুরুষ—যিনি পুরীতে সমষ্টিদেহে শায়িত, অবস্থিত, লীলারত। নর—যিনি আমাদের ব্যষ্টিদেহে অবস্থিত থাকিয়া কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-অভিমানমুক্ত হইয়া কর্ম্মফল-ভোগ করিতেছেন। পুরুষের কর্ম্ম সাধিত হয় স্বরূপে থাকিয়া আনন্দ প্রাচুর্য্যাৎ নরের কর্ম্ম হয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অভাবাৎ।

মেধ শব্দ মিধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মিধ্ ধাতুর অর্থ বধমেধ আসঙ্গেষু ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। মেধঃ যজ্ঞঃ ইতি জটাধরঃ। অর্থাৎ বধ করা, বধ্য হওয়া, ধারণাশক্তি—যাহা বিকৃতির মধ্যেও প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া রাখে, বিস্মৃত হইতে দেয় না এবং যাহা বিভক্তির ভিতরে অবিভক্ত ভাব বজায় রাখিয়া পুনরায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইবার সহায় হয়; অর্থাৎ যাহা অবিভক্তকে লীলার ছলে বিভক্ত করিয়া হোতা হবনীয় দ্রব্যাদি রূপে পরিণত করিয়া পরিশেষে আহুতি ক্রিয়ার ভিতর দিয়া গিয়া তাহার অবিভক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করায় সেই ক্রিয়ার নাম মেধ। যজ্ঞ দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া জটাধর প্রভৃতি মেধ শব্দকে যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই মেধ ক্রিয়া যেমন ভগবানে প্রযোজ্য তেমনি

জীব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ; তাই যজ্ঞের ভিতরে পুরুষমেধ ও নরমেধ এই ভেদ দেখা যায়। সুতরাং পুরুষমেধ শব্দের অর্থ পুরুষের নিজকে জানার জন্য আস্বাদ করিবার জন্য আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য একটু আত্ম-বিস্মৃতির ভাণ এবং তাহার ফলে নিজের একত্ব ভুলিয়া, নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া বহু সাজিয়া ত্রিপুটীর ভিতর দিয়া সব বিভক্তির ভিতর দিয়া জীব-জগদ্রূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন ; এবং নরমেধ শব্দের অর্থ নরের জীবের ভিতরকার সব আগন্তুক মলিনতা দূর করিয়া হবন ক্রিয়ার ভিতর দিয়া সব দ্বৈতভাবকে শিবে আহুতি দিয়া নিজের প্রকৃত অদ্বৈত-স্বরূপ উপলব্ধি করা—যাহার ফলে জীবজগৎ গিয়া তখন ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়। জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। জীব তখন শিবের লীলার সহায় হইয়া শিবের লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করে।

শাস্ত্রের অভিমত :—বেদের পুরুষসূক্ত প্রভৃতির বর্ণনা হইতে আমরা পুরুষমেধের আভাস প্রাপ্ত হই। সেখানে এক অখণ্ড পুরুষ কিভাবে খণ্ডিত হইয়া অনন্তভাগে বিভক্ত হইয়া জীব-জগদ্রূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইলেন, তাহার একটা সুন্দর আভাস পাই। জীবের সাধ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের মধ্যেও আমরা তেমনি জীবের বহুত্বভাব দূর করিয়া স্বধর্ম্ম পালনের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব আস্বাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, অশ্নাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি অশ্বঃ, মিধ্যতে স্নিহ্যতে প্রাপ্যতে ইতি মেধঃ। এই অশ্বমেধ ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন ধ্যান ও সেবা করিয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাষ্ট্রং বৈ অশ্বঃ ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে আপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপ বৈশ্যের স্বধর্ম্ম

কৃষিগোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবাত্মক স্বধর্ম্মপালনকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রসিকশেখর আনন্দময় শ্রীভগবান নিজের আনন্দে নিজে এত বিভোর যে তিনি নিজে যেন এই আনন্দ নিজের ভিতরে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তাই সেই আনন্দের কতকটা যেন বাহিরে উছলিয়া পড়িল। এই বাহিরে উছলিয়া পড়ার নামই হইল আমাদের অভিধানে সৃষ্টি। তাই সৃষ্টিকে বলা হয় বৃদ্ধি—নামরূপ যুক্ত হওয়া। আমাদের লীলাময় শ্রীভগবান যেন নিজের আনন্দপ্রাচুর্য্যহেতু মায়ার পোষাক পরিয়া লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন। কেন করিলেন তাহা তিনিই জানেন, আর তিনি যাহাকে জানান সেই জানে। দার্শনিক ভাষায় নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত অবিভক্ত অসীম নিরাকার পরমাত্মা এই যে সগুণ সক্রিয় ব্যক্ত বিভক্ত সসীম সাকাররূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইলেন ইহার নাম সৃষ্টি—ইহারই নাম পুরুষমেধ যজ্ঞ। ইহার দ্বারা তিনি স্নেহবশে লীলার ছলে জীবের গ্রাহ্য, জীবের আস্বাদ্য হইয়া পড়িলেন। যেভাবে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যেভাবে জগৎ চলিতেছে, আবার যেভাবে জগৎ গিয়া তাঁহাতে লীন হইবে সেসব লইয়াই তাঁহার যজ্ঞ। এ যজ্ঞের বিরাম নাই।

জীবের যজ্ঞ ভগবানের যজ্ঞেরই অনুকরণমাত্রঃ— চলিতেছে জগদ্‌ব্যাপী একটা যজ্ঞ--আত্মত্যাগ, আপনাকে উৎসর্গ করা। ভগবানের এই ত্যাগটা হইতেছে আপনাকে প্রকাশ করার জন্য, আপনাকে পাওয়ার জন্য—আপনাকে আস্বাদ করার জন্য—আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য—আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ। পুরুষ এই যজ্ঞ করেন, তাই তাঁহার সৃষ্ট জগতে সকলেই এই যজ্ঞ করিতে বাধ্য। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব হইতে আরম্ভ করিয়া একটা পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই এই যজ্ঞ করিয়া যাইতেছে। বাধ্য হইয়া

এই যজ্ঞ করিলে তখন ইহা হয় বন্ধন, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ এই যজ্ঞ করিলে তখন ইহাই হয় মুক্তির সহায়—ইহাই গিয়া লীলায় পর্য্যবসিত হয়। পুরুষ করেন যজ্ঞ, জীব করে কর্ম্মভোগ। এই কর্ম্মভোগকে যজ্ঞে পরিণত করা, জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পরিণত করা, ইহাই নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য। পুরুষমেধকে ভগবৎ-বিধানকে জানিয়া বুঝিয়া তাহার তালে তালে কর্ম্ম করিতে পারিলে—অর্থাৎ জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পর্য্যবসিত করিতে পারিলেই নরমেধ যজ্ঞ সাধিত হইয়া যায়, নরের কর্ম্ম তখন সার্থক হয়, পূর্ণতা লাভ করিয়া শিবের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। কর্ম্ম করিতে হইলেই দাতা গ্রহীতার দরকার। ভগবান দাতা—তাই জীব হইয়া পড়িলেন গ্রহীতা। জীব যখন ভগবানের সন্তান তখন তাহারও উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের ন্যায় কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকে, বাপের ন্যায় দান করিবার সাধ হয়। তাই সে বাপকে নকল করিতে বাপের কর্ম্মের সহায় হইতে চেষ্টা করে। মা ছেলের মুখে তুলিয়া দেন রসগোল্লা, ছেলে তখন মাকে নকল করিতে গিয়া মায়ের মুখে পাথরের নুড়ি দিয়া বলে, 'মা নসগোল্লা খাও'; মা ও তখন ছেলের ভিতরে এই দেওয়ার প্রবৃত্তিটা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করেন। জীবের কর্ম্ম, জীবের সাধনা এইরূপ ভগবৎকর্ম্ম ভগবৎ-সাধনার নকল মাত্র। আসল যজ্ঞ আসল সাধন-ভজন করেন শ্রীভগবান, জীব করে তাঁহার নকল,—রাখিতে যায় বাপের কর্ম্মের ভিতরে নিজের একটু কর্তৃত্বাভিমান, বাপের কর্ম্মে নিজের সামর্থ্য অনুসারে একটু সাহায্য করিয়া বাপের লীলায় সহায় হইতে। লুকোচুরি খেলিতে হইলে একজনের কর্ম্ম হয় যেমন লুকানো, অপরের কর্ম্ম হয় তেমনই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা। ভগবান লুকান

আবার প্রকাশ পাইবেন বলিয়া, তাই তাঁহার মধ্যে থাকে একটা প্রকাশ পাইবার ইচ্ছা ; তাই তো জীবের পক্ষে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয়। তাই নিরাকারের আকার-গ্রহণ, নির্গুণের সগুণভাবে আত্মপ্রকাশ—ইহাই পুরুষমেধ যজ্ঞ। আবার জীবের পক্ষে আকারের ভিতর দিয়া নিরাকারকে খুঁজিয়া বাহির করা, সগুণের ভিতর দিয়া নির্গুণকে ধরিবার চেষ্টা—ইহাই নরমেধ যজ্ঞ।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহাই পুরুষে আরোপ করিয়া আমরা পুরুষের যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তিনি যেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। নিজেই সব হইলেন। তিনি ভিন্ন যখন আর দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, তখন লীলা করিতে হইলে নিজেরই যে সব হইতে হইবে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান অধিকরণ সবই তিনি হইলেন। তাই তাঁহাকে একাধারে উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলা হয়। তাহার এই বিবর্ত্তন পরিণাম বা সৃষ্টি ব্যাপার লীলাকৈবল্য একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞের যজমান ঋত্বিক্ হোতা অধ্বর্য্যু উদগাথা ব্রহ্ম এমন কি ইড়া সোম আদি হবন দ্রব্যরূপে তিনিই বিবর্ত্তিত হইলেন। নিজেই যেন ঋষি, পিতৃ, সাধ্য, দেবতাদি সব হইয়া বসিয়াছেন। এইসব রূপের ভিতর দিয়াই তাঁহার যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। তিনি যজ্ঞ করেন, তাই এ জগতের সকলেই যজ্ঞে রত। এই যজ্ঞ লইয়াই দেবাসুরের যুদ্ধ—এই যজ্ঞের ফলেই অসুরগণ পরাজিত। আবার যজ্ঞ অর্থ ত্যাগ—তাই এই যজ্ঞের বিরাট পুরুষ নিজেকেই ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। তিনি আপনাকেই আপনি ত্যাগ করিতে বসিলেন। ইহার মধ্যে নিজের কোন মতলব নাই—কোনওরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই—ইহা যে লীলা-কৈবল্য। তিনি

যজ্ঞ নিয়া ব্যস্ত, তাই দেবতা-ঋষিপিতৃগ্রহউপগ্রহ পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন—সকলেই জীবহিত সাধনে ব্যস্ত।

পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ—প্রকারভেদ :—(এক ও বহু) একের বহু হওয়া যেমন পুরুষমেধযজ্ঞ, আবার সাধনা দ্বারা বহুর ভিতরে একের উপলব্ধি সেইরূপ নরমেধযজ্ঞ। নরমেধযজ্ঞ নর সাধনা দ্বারা শুদ্ধ শান্ত হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি করে। সমষ্টির ব্যষ্টিভাবাপত্তি পুরুষমেধ, আবার ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে আহুতি দিয়া সমষ্টির জ্ঞানলাভ নরমেধ। অসীমের সসীমভাবে প্রকাশ; আবার সসীমের অসীমত্ব উপলব্ধি; তরঙ্গের উত্থান (সৃষ্টি), আবার তাহার পতন ও লয়; অদ্বৈতের দ্বৈত, আবার দ্বৈতের অদ্বৈতে উপলব্ধি (Evolution এবং Involution)। জগতে দুইটি ব্যাপার নজরে পড়ে, প্রথমটি পুরুষমেধ—পুরুষের ত্যাগ—জীবভাবপ্রাপ্তি-লীলা; দ্বিতীয়টি নরমেধ—নরের সাধনা—নরের আত্মোপলব্ধি—নরের ভগবৎ-প্রাপ্তি। জীবের হিতার্থে ভগবান যেমন যজ্ঞ করিতেছেন, আমরাও তদ্দর্শনে রূপকে সূর্য্যে, মনকে চন্দ্রে বুদ্ধিকে বিষ্ণুতে, অহঙ্কারকে রুদ্রে হবন করিয়া আমাদের ব্যষ্টিভাব দূর করিতে চেষ্টা করিব; অর্থাৎ আমাদের সব তত্ত্ব ভগবানের সবতত্ত্বে মিলাইয়া দিয়া (হবন করিয়া) বিরাট পুরুষদেহে আমাদের দেহ মিলাইয়া দিয়া তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিব।

অবিভক্ত ও বিভক্ত--অবিভক্তের বিভক্তি (তুলনীয় ছিন্নমস্তা-তত্ত্ব), একের বহুরূপ ধারণ, আবার বিভক্তির মধ্য দিয়া অবিভক্তকে একত্বকে আস্বাদন।

কারণ ও কার্য্যঃ—পুরুষমেধ যজ্ঞে আমরা দেখিতে পাই এক মূল কারণের বহু কার্য্যরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন, আবার নরমেধ যজ্ঞে দেখিতে পাই সিদ্ধপুরুষের কার্য্যের ভিতর দিয়া মূল কারণতত্ত্বের অবধারণ বা উপলব্ধি।

তৎ ও ত্বং, অহং ও ইদংঃ—পুরুষমেধ যজ্ঞে আমরা পাই 'তৎ' পদার্থের 'ত্বং' পদার্থে পরিণতি বা বিবর্ত্তন ; আবার নরমেধ যজ্ঞে পাই 'ত্বং'-পদার্থের ভিতরে 'তৎ'-পদার্থের উপলব্ধি ; একবার স্বর্গচ্যুতি (Paradise Lost) আবার স্বর্গারোহণ (Paradise Regained)। পুরুষমেধে আদি 'অহং'—এর 'ইদং'-রূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন ; নরমেধে 'ইদং'-তত্ত্বের 'অহং'-রূপে পর্য্যবসান।

পিতা ও পুত্রঃ—পুরুষমেধ দ্বারা স্বর্গীয় পিতা, যীশু পুত্রে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হন; আবার নরমেধ যজ্ঞে পুত্র যীশু কাঁচা আমির আহুতি দান করিয়া পাকা আমির ভিতর দিয়া নিজে পিতায় পরিণত বা বিবর্ত্তিত হন। এই জন্যই বলা হইয়াছে,—Be perfect as your Father which art in heaven is perfect ; I and my Father are one. সেই পরম পিতা নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য জগৎ সৃষ্টি করিলেন, অনাদি বাসনার ফলে তাঁহার জীবরূপী প্রিয় সন্তানগণ সংসারে আসিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া নানাবিধ দুঃখকষ্টে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমাদের স্বর্গস্থ পিতা জীবের দুঃখ মোচন করিয়া জীবকে তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য আপন অভিন্নস্বরূপ অবতারগণকে জগতে পাঠান—নিজেই অবতাররূপে পুত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হন।

স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া সগুণ হইয়া দুঃখপূর্ণ জগতে আগমন, জগতের কষ্টস্বীকার, ইহাই তাঁহার ত্যাগ, ইহাই তাঁহার যজ্ঞ। আর আমাদের যজ্ঞ

হইবে তাঁহার শিক্ষা-উপদেশ অনুসারে আমাদের কল্পিত কামনা বাসনা সংস্কারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, তাঁহার বিধান মতে চলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সেই স্বর্গধামে চলিয়া যাওয়া। এই জাগতীয় সংস্কার দূর করা, স্বার্থ দূর করা, কল্পিত দুঃখমিশ্রিত সুখভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন করাই হইবে আমাদের যজ্ঞ। বাপ যজ্ঞার্থে দেহ স্বীকার করেন, দেহে আবদ্ধবৎ প্রতীয়মান হন ; ছেলে যজ্ঞের ফলে নিজের অহঙ্কারকে তামসিক দেহকে ত্যাগ করিয়া crucify করিয়া বিদেহ মুক্তি লাভ করেন। (তুলনীয় -- Crucify thy lower self for the realisation of the higher self).

লুকোচুরিঃ—পুরুষমেধদ্বারা গোপীর মনচোরা রাধারমণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে লুক্কায়িত হইলেন ; নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা রাধারাণী ও গোপীগণ সেই লুকান চোরকে বাহির করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন,— তাঁহার লীলার সহায় হইলেন। তিনি নিজের এক অরূপরূপ গোপন করিয়া বহুরূপী সাজিয়া অভিনয়ের জন্য যখন আমাদের কাছে আসিয়াছেন, তখন আমাদের কাজ আমাদের সাধনা হইবে সেই বহুরূপীর ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলা।

নরমেধ সাধনার মন্ত্র 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। যজ্ঞ দ্বারা অভাবাত্মক কর্ম্মকে স্বভাবে পরিণত করা হয়, কর্ম্ম বালনৃত্যবৎ আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ—লীলাকৈবল্যরূপে সুসাধিত হয়। এই যজ্ঞের ফলে আমরা নিজে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া ভগবৎ-বিধান ভগবৎ-অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিজকে ভগবানের হাতের একটি যন্ত্রমাত্র অনুভব করিয়া তাঁহার লীলার সহায় হই। তখন তিনি যে তালে এ যন্ত্রকে চালাইতে চান সেই তালেই চলিতে আরম্ভ করি। তখন ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া

জীবনের আর কোনও কাজ থাকেনা, তাঁহার প্রিয়তম জীবের সেবায় কল্যাণ ও শান্তি বিধানে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। এখানে বলি দেওয়া হয় জীব-ভাবকে—কামনা-বাসনা-আসক্তিকে। যজ্ঞ দ্বারা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতত্বলাভের সোপান আবিষ্কার করি।

পুরুষমেধ ভগবানের জীবজগদ্রূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন; আর নরমেধ জীবের সব আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার ভিতরকার লুক্কায়িত ভগবত্তা উপলব্ধি। একটি শিবের জীবরূপে পরিণতি বা বিবর্ত্তন, অপরটি নরের শিবত্বে পর্য্যবসিত হওয়া।

—:০:—

বেদান্তে যজ্ঞ

বেদান্ত বেদের অন্ত, অর্থাৎ সার ভাগ। বেদের সার তত্ত্বগুলি লইয়া বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রধান অংশের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের ভিতরে একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া বেদান্তসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। বেদে এবং উপনিষদে— সুতরাং বেদান্তে ব্রহ্মের দ্বিবিধরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন **দ্বাবেব ব্রহ্মণোরূপে** সগুণো নির্গুণশ্চ···ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চ। ভগবানের একটি রূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন, অসীম অব্যক্ত অনন্ত ইত্যাদি। অপর রূপটি সগুণ সক্রিয় সাকার, সসীম ব্যক্ত ও সান্ত। আসলে দুইটি তত্ত্বই ঠিক; যিনি অসীম সীমার ভিতর দিয়া তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন, না করিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে বুঝিতে পাইতে পারিত না। এইজন্য প্রেমিক সাধুগণ তাঁহার উভয়াত্মক লীলারস আস্বাদ করিতে ব্যস্ত। তন্ত্র শাস্ত্রও শিবের বুকের উপরে **বিমর্শ শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণ** লইয়া বিভোর। যাঁহারা ভগবানের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত তত্ত্ব লইয়া বিভোর তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের যজ্ঞতত্ত্ব লীলারহস্য স্থান না পাইলেও তাঁহারা যে চিত্তশুদ্ধির সহায়ভাবে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা উভয় তত্ত্বের ভিতরে একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া কখনও সমরসে মগ্ন, কখনও লীলারসে বিভোর তাঁহাদের ভিতরে প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্বের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীধর, মধুসূদন

প্রভৃতি বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ লীলারস বিস্তারের জন্য পাগল। যজ্ঞতত্ত্ব এই রসিক ভাবগ্রাহী ভাবমগ্ন সহৃদয় পাঠকের নিকটেই আদৃত হইবে মনে হয়। বেদান্তে আমরা দ্বিবিধ দলেরই লোক দেখিতে পাই। একদল অব্যক্ত তত্ত্ব লইয়া বিভোর, অপর দল অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াও অদ্বৈতের দ্বৈতভাব লইয়া সমাহিত। অব্যক্তের পথ যে সমধিক ক্লেশকর তাহা গীতাকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আসল তত্ত্ব যে দ্বৈত বা অদ্বৈতে সীমাবদ্ধ নহে তাহা অনেকেই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥

সেদিনও ঠাকুর রামকৃষ্ণ গাহিয়া গিয়াছেন, সারতত্ত্ব দ্বৈত, অদ্বৈত এবং তাহারও উপরে। এখন দেখা যাক, বেদান্তীদের মুখ হইতে আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে কখন কিরূপ উল্লেখ পাই।

উপনিষৎ এবং বেদান্তের গ্রন্থগুলি সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের বিরোধী হইলেও যে তাহারা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক নিষ্কাম ভাবনাত্মক যজ্ঞের বিরোধী নহে তাহা আমরা নিম্নলিখিত বচনগুলি হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। "ত্বং পদের লক্ষ্য শুদ্ধ জীব-আত্মা হোমকর্ত্তা; বিশ্বাসরূপা বৃত্তি হোমকর্ত্তার পত্নী, তত্ত্বাগ্নিদ্বারা গৃহপতি জীবের শরীররূপ গৃহ (দেহাত্মবুদ্ধিরূপ আবরণ) দগ্ধ হইয়া মুক্তির সহায় হয়।" "শরীর সমিধ বক্ষ বেদী লোমকূপ কুশ, গ্রথিত দর্ভমুষ্টি তাহার শিখা, হৃদয় তাহার যূপ……এবং ব্রহ্মযজ্ঞের এক হাত অহিংসাদি যমসাধনা, অপর হাত শৌচ সন্তোষ আদি নিয়মসাধনা; এই দুই হাতকে সম্পুষ্ট (দ্বৈত ত্যাগ অদ্বৈত গ্রহণের অনুকূল) করিয়া এক অখণ্ড এক রসে পর্য্যবসিত করিয়া

মহাবাক্যের আবৃত্তি করিবে।” উপনিষদের এই বাক্যগুলির মধ্যেও আমরা যজ্ঞতত্ত্বের একটা আভাস দেখিতে পাই। তারপরে ‘বোধসারের’ ‘দ্বে আহুতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্রবিধানতঃ। মমতাং প্রথমং হুত্বাহন্তাং চ জুহুয়াত্ততঃ ॥’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী অগ্নিহোত্রবিধান অনুসারে ব্রহ্মে ‘মমতা’ নামক প্রথম আহুতি এবং ‘অহন্তা’ নামক দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে। যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং ইত্যাদি বাক্যেও দ্বৈতবুদ্ধিকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে আহুতি দানের ব্যবস্থা দেখা যায়। আবার ‘তৎ’-পদার্থে নেতি নেতি সাধনার দ্বারা ত্বং-পদার্থের আহুতি বিধেয়। “ব্রহ্ম হইতে সব আসিয়াছে, আবার ব্রহ্মে গিয়া সব পর্য্যবসিত হইতেছে” ইহা জানিয়া ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ মন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। “জ্ঞানযজ্ঞে স কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই যজ্ঞীয় পশু” ইত্যাদি বাক্যের ভিতরে আমরা ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের বেশ সুন্দর একটা আভাস প্রাপ্ত হই। ইহা ছাড়া জ্ঞানীর সাধ্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। “জ্ঞাননিষ্ঠা ক্ষমা সত্যং বিবেকঃ পরিপূর্ণতা। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ সম্মতা ব্রহ্মবাদিনাম্।” “ব্রহ্মাস্মি” এই মহাবাক্যে সহজ প্রীতি, সুখদুঃখ সহন সামর্থ্য, সত্যভাষণ, আত্মানাত্মবিবেক, সর্ব্বদা নিজের পূর্ণত্বে নিশ্চয়বুদ্ধি (অদ্বৈতভাবে সদা অবস্থান) এই পাঁচটি ভাবে সর্ব্বদা অবস্থানের চেষ্টাই জ্ঞানীর পক্ষে পঞ্চমহাযজ্ঞ।

আসল কথা, যজ্ঞের আগন্তুক মলিনতা দেখিয়া ক্রিয়াবহুল সকাম যজ্ঞের নিন্দা করিলেও কোনও জ্ঞানী চিত্তশুদ্ধির সহায় এবং ব্রাহ্মীস্থিতির অনুকূল কোন ক্রিয়াকেই বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতে পারেন না।

যজ্ঞ শব্দকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরকার সাত্ত্বিক রূপটি গ্রহণ করিয়া চিত্তশুদ্ধির সহায় এবং ব্রহ্মানুভূতির

অনুকূলভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া বেদান্তদর্শন অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যজ্ঞের উপকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্করের "আত্মবোধ" ও "অপরোক্ষানুভূতির" সাধন শ্লোকগুলির ভিতরে আমরা ভাবনাত্মক যজ্ঞের বেশ সুন্দর একটা আভাস দেখিতে পাই। বেদান্তের অধিকারী হওয়ার জন্য যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে আমরা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের এবং অধিকার লাভের পরে অনুষ্ঠেয় মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির ব্যবস্থার ভিতরে আমরা ভাবনাত্মক যজ্ঞের এবং জ্ঞানের উদয় হইলে যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে আমরা কেবলাত্মক যজ্ঞের মত একটা বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এমন কি জ্ঞানলাভের পরেও দেহরক্ষার জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের জ্ঞান প্রচারের জন্য ভাবনাত্মক যজ্ঞের এবং জ্ঞানীর জীবনযাত্রার ভিতরেও আমরা একটা কেবলাত্মক যজ্ঞের পরিচয় পাই। তখনকার অবস্থানটা অনেকাংশে স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ভগবৎ-লীলাদর্শনের ন্যায় মনে হয়। সুতরাং জ্ঞানী যে যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নন একথা সহজেই বলা যাইতে পারে।

—ঃ—

(১৫)

গীতায় যজ্ঞ

বৈদিক যুগের প্রথমে ছিল কর্ম্মজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়; জ্ঞান ছিল কর্ম্মের উৎসাহদাতা ও চালক এবং কর্ম্ম ছিল জ্ঞানানুমোদিত। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের মধ্যে একটা বিচিত্র সামঞ্জস্য। এ যুগটাকে সংহিতার যুগ বলা চলে। জ্ঞানচালিত কর্ম্মে বৃদ্ধি পাইল কর্ম্মের মাহাত্ম্য, প্রচার হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের মহিমা। যজ্ঞ হইয়া পড়িল প্রতিষ্ঠার এবং উপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই যুগকে যজ্ঞবহুল ব্রাহ্মণের যুগ বলা যাইতে পারে। লোকে বুঝিল এই কর্ম্মের অপব্যবহারের মূলে রহিয়াছে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং অজ্ঞানের প্রভাব। তাই কর্ম্মের বাড়াবাড়ি অপব্যবহার এবং অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য দেখা দিল জ্ঞানপ্রধান উপনিষদের যুগ। এই উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একটা সুন্দর মূর্ত্তি; ইহার মধ্যে প্রাধান্য ছিল জ্ঞানের। তখন দেশের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল, জীবনযাত্রা অতি সামান্য পরিমাণে নির্ব্বাহ হইত; তাই মানুষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল জ্ঞান লইয়া; প্রচার হইল জ্ঞানের মহিমা ক্রমে দেখা দিল কর্ম্মের অনাদর। কর্ম্ম রহিয়া গেল অপেক্ষাকৃত নিম্ন অধিকারীর জন্য। যাঁহারা উচ্চ অধিকারী তাঁহারা জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত। অনেকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। আসিয়া পড়িল কর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা, কর্ম্মহীন সন্ন্যাসযুগের প্রাদুর্ভাব। অতি সামান্য কারণে

কর্ম্ম ছাড়িয়া লোকে চলিল জ্ঞানপ্রধান সন্ন্যাসের দিকে। এই যুগে স্বধর্ম্মনিরত আদর্শ নর অর্জ্জুনের ভিতরেও আমরা কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। কর্ম্ম তখন মনে হইত একটা বন্ধনের কারণ, একমাত্র জ্ঞানই ছিল মুক্তির সহায়; এই সময়ে প্রচারিত হইল গীতার ধর্ম্ম যাহার ভিতরে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্ত্তমান থাকিলেও যাহা দেশকে রক্ষা করিযাছিল একটা অস্বাভাবিক কর্ম্মত্যাগ এবং সন্ন্যাসের প্রবৃত্তির হাত হইতে। গীতা দেশকে একটা অস্বাভাবিক কর্ম্মভীতি এবং তামসিক ত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করিয়া দেশের প্রচুর কল্যাণসাধন করিয়াছেন। যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, সেই কর্ম্মই কৌশলে কৃত হইলে মুক্তির সহায় হইয়া পড়ে কর্ম্ম জীবনের নিত্যসহচর। কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহও কঠিন—এমন কি প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা অবশ্য করণীয় তাহার ভিতরকার অনিষ্টকর অংশকে যিনি বর্জ্জন করিয়া তাহাকে মুক্তির, ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায় করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহার দানকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। গীতা কাহারও অবমাননা করেন নাই, সকল কল্যাণকর প্রথারই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি দেশের বেশী অনিষ্টের যাহা কারণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার দিকে ছিল গীতা-কারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি। জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও জ্ঞানকে কর্ম্মের চালকরূপে গ্রহণ করিলেও এমন কি জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম পূর্ণতালাভে অসমর্থ একথা মানিলেও (সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে) অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞার্থ ভগবৎ তৃপ্তি বিধানের জন্য জীবের হিতসাধক কর্ম্ম যে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায় হইয়া থাকে এই তত্ত্বের দিকে গীতাকারের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

পরিমাণে লক্ষিত হয়। তাই কর্ম্ম জগৎসৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান, কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্ম অবশ্য করণীয়. এই কর্ম্ম যজ্ঞের ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এই দিকেই ছিল গীতার প্রধান দৃষ্টি। আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য গীতাকার যজ্ঞঃ শব্দকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা।

আমরা গীতার মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের নবম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতি হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে সপ্তবিংশতি শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও পঞ্চম শ্লোকে যজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাই। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যজ্ঞ অনাদি, যজ্ঞ উন্নতির সহায় কল্যাণসাধক। যজ্ঞই কর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়া যজ্ঞ চলে না। জগতে একটা কর্ম্মচক্র চলিতেছে—অথচ কর্ম্ম কি করিলে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায় হয়। সিদ্ধাবস্থায়ও কর্ম্ম থাকিতে পারে, এমন কি ভগবান নিজেও কর্ম্মত্যাগ করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে—যজ্ঞের প্রকার ভেদ। তন্মধ্যে জ্ঞান সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করে, কর্ম্মের কুফল হইতে রক্ষা করে, জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, যজ্ঞও স্বর্গলাভের সহায়; মন্মনা, মদ্ভক্ত হইয়া মদ্‌যাজী হইতে হইবে। সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ অধিকারী ত্রিবিধ যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যজ্ঞ বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধির সহায়।

গীতার উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কোথায় গিয়া গীতার পরিসমাপ্তি সাধিত সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। স্বধর্ম্মত্যাগী পরধর্ম্মগ্রহণেচ্ছু অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া

স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গীতার উৎপত্তি। অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প অর্জ্জুন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের হিংসার ভয়ে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিরত হইলে তাহাকে আত্মার স্বরূপ, ধর্ম্মের স্বরূপ, স্বধর্ম্ম পালনের শ্রেষ্ঠত্ব, নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্তি দেওয়াই ছিল গীতার প্রধান কার্য্য। গীতার শেষে কৃষ্ণ বলিলেন, "মামনুস্মর যুধ্য চ" এবং অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন, "করিষ্যে বচনং তব।" ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি কেন গীতায় স্বধর্ম্মপালনের দিকে এত বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন।

যজ্ঞ আস্তে আস্তে কেবল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আগুনে ঘৃতাহুতিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষৎ এই সকলকে গৌণ করিয়া জ্ঞানের মুখ্যত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। গীতাকার যজ্ঞ শব্দকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, তবে জীবের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুকূল কর্ম্মই যজ্ঞ। যজ্ঞ পূজা আরাধনা সাধন ভজন উপাসনা সমান-অর্থক। মহাভারত অহিংসাধর্ম্ম বিস্তারের পর হইতে পশু-হিংসাত্মক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে দান ধ্যান প্রভৃতির দ্বারাই যজ্ঞ করিবার বিধান দিলেন (শান্তিপর্ব্ব)। ক্রমে শ্রৌত যজ্ঞ শিথিল হইয়া স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ঋণ শোধ করা ও জীবের সেবা করার দিকে ছিল ইহার প্রধান দৃষ্টি। দান সত্য দয়া অহিংসা সর্ব্বভূতের হিতসাধন আদি উপনিষৎ ও স্মৃতিসম্মত যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইল। সংসার পরিচালনার জন্য হোমাদির সাহায্যে দৈবযজ্ঞ এবং জীবসেবার জন্য অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া ত্যাগাত্মক সেবাযজ্ঞ বিহিত হইল। ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা ঋষিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যোগযজ্ঞের মধ্যে কেহ যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-আদি

সাধনে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞে বিভোর। কেহ বা বিষয়ের ভিতর দিয়া বিষয়ীর ধ্যানে সমাহিত। ধ্যাননিষ্ঠগণ ইন্দ্রিয়প্রাণাদির কর্ম্ম নিরোধপূর্ব্বক আত্মায় সমাহিত থাকিতে সচেষ্ট। বলা বাহুল্য ইহারা নিরোধাত্মক লয়যোগের সাধক। কেহ বা প্রাণায়াম-আদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-অনুষ্ঠানে রত, কেহ রেচক-প্রধান, কেহ পূরক-প্রধান, কেহ কুম্ভক প্রধান যজ্ঞ লইয়া তৎপর। কেহ আবার আহারাদি সংযমপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিরত। ইহাদের সকলকেই গীতা যজ্ঞে রত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই সব সাধনাও যজ্ঞেরই অন্তর্গত। যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়াতে পর্য্যবসিত নহে। জীবের অনুষ্ঠিত সব যজ্ঞ সেই বিরাট যজ্ঞেরই অংশ। অংশের কাজগুলি পূর্ণরূপে সাধিত না হইলে জগদ্‌ব্যাপী যজ্ঞ হৃদয়ঙ্গম হয় না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র যজ্ঞেশ্বর, অধিযজ্ঞ তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

যজ্ঞ আত্মসমর্পণের ক্রমমাত্র। সত্তার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আসে দ্রব্যযজ্ঞ। তাঁহার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। দ্রব্য-অর্পণ-শব্দের অর্থ—দ্রব্য যে তাঁহার, তাহা উপলব্ধি করিয়া দ্রব্যের উপরে আমিত্বভাব স্বামিত্ববোধ দূর করা। ক্রমে নজরে পড়ে আমিত্বের দিকে, তপোযজ্ঞের দ্বারা আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া আমিকে শুদ্ধ করা হয়। তখন আমার প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন আমরা যে তাঁহারই, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যোগের সাহায্যে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করি। তখন আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহার শক্তি পূর্ণভাবে কাজ করিতে থাকে। তখন অনুভবে আসে যে আমাদের যাহা কিছু সব তাঁহার,—তাঁহার শক্তিই আমাদের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। পরে স্বাধ্যায় যজ্ঞে আমরা 'স্ব'কে আমাদের

আত্মাকে অধ্যয়ন করিয়া জানিয়া প্রতিকর্ম্মের মূলে তাঁহাকে বাহির করিয়া তাঁহার এক পরম অখণ্ড সত্তার সন্ধান পাই। তখন আমাদের জীবত্ব যে তাঁহার শক্তির বিকাশ, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার দর্শনাদি শক্তির প্রকাশ, আমাদের বুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তির প্রকাশ—ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের জীবত্বভাব দূর হইয়া যায়, আত্মনিবেদন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।' যজ্ঞের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের সব তত্ত্ব, আমাদের আত্মা তাহাতে নিবেদন করিয়া দেই, এসব যে তাঁহারই বিকাশ তাহ অনুভব করি। তখন তিনি আবার আমাদিগকে তাঁহার লীলা সহায় করিবার জন্য সব তত্ত্বগুলিকে ফিরাইয়া দেন, ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ। ভক্তসাধকগণ তখনকার আমিকে তাঁহার লীলার সহায়ক দাস আমি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মহাত্মা তিলক অতি সুন্দর যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে আত্মৌপম্যবুদ্ধিদ্বারা অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বজীবের হিতসাধনরূপ ভগবৎ-আরাধনাই গীতা ও মহাভারতের প্রকৃত যজ্ঞ। গীতাকার অতি আদরের সহিত এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গীতার উদ্দেশ্য জীবনকে যজ্ঞময় করিয়া তোলা।

(১) প্রথম দেখান হইল কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, (২) তাহার পরে দেখান হইয়াছে ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল কার্য্যই যজ্ঞ। অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য, জীবের কল্যাণসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত সব কর্ম্মই যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইল। (৩) যজ্ঞ নিয়ত কর্ম্ম (যে কর্ম্ম সাধনার জন্য ভগবান আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন)। (৪) যজ্ঞ স্বধর্ম্মপালন, (৫) যজ্ঞ জীবসেবা, (৬) যজ্ঞ লোক সংগ্রহের চেষ্টা, (৭) যজ্ঞ ত্যাগাত্মক কর্ম্ম (Sacrifice)। ত্যাগ ব্যতীত সমাজ চলেনা।

আমরা সকলের জন্য কর্ম্ম করিব, সকলে আমাদের জন্য কর্ম্ম করিবেন, এই পরস্পর সাহায্যের ফলে জগচ্চক্র সুচারুরূপে চলিতে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রপ্রণেতা বলেন, নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে পরিমিত না করিলে অন্য লোকের স্বাতন্ত্র্যলাভ হয় না। যজ্ঞ (নিজস্বাতন্ত্র্যরূপস্বার্থত্যাগ) না করিলে লৌকিক ব্যবহারও চলে না। যজ্ঞ (ত্যাগই) সমাজ রচনার মূলাধার। ত্যাগই অমৃতের সোপান, 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'। সমষ্টি প্রকৃতির সব স্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য-দেবতা। আমরা ব্যষ্টি জীব দেবতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিব, দেবতারা আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে তাঁহাদের সব ভাব ও শক্তিদ্বারা আপ্যায়িত করিবেন। নীচের তত্ত্বগুলি উপরের তত্ত্বগুলির তৃপ্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে। উপরের তত্ত্বগুলি আপ্যায়িত হইয়া আমাদের নীচের তত্ত্বগুলিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবে—তাহাদের কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহিত করিবে। ফলে জগৎ-চক্র সুন্দরভাবে চলিতে থাকিবে। গীতাকার চক্রের উপমা দিয়া যজ্ঞের স্বরূপ দেখাইতে সচেষ্ট। জগৎ-চক্রের চালক স্বয়ং ভগবান। সেই ভগবান হইতে অক্ষর, অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। ইহাদের সকলের আপ্যায়নের দ্বারা জগৎ-চক্র সুচারুরূপে চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য ঋণশোধের দিকে, ত্যাগের দিকে, স্বধর্ম্মপালনের দিকেই ছিল গীতাকারের প্রধান লক্ষ্য। এই কাজগুলি গীতায় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গীতাকার যে কোনও ভাল কর্ম্মকে অস্বীকার করেন নাই, সব জাতীয় সাধন-প্রণালীকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনবোধে একটু শোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেনমাত্র, অর্থাৎ সব কর্ম্মকে ভগবৎপ্রাপ্তির

অনুকূল করিয়া তুলিয়াছেন। যজ্ঞের প্রকারভেদের মধ্যে তাহার বেশ সুন্দর একটা পরিচয় প্রাপ্ত হই।

গীতা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং জ্ঞানযজ্ঞ ভেদে যজ্ঞকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। গীতা পতঞ্জলির প্রাণায়াম আদি যোগের ক্রিয়াগুলিকেও বাদ দেন নাই। কোন কোন জায়গায় জপযজ্ঞের প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন (যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি ১০।২৫)। আমরা জপযজ্ঞকে যোগযজ্ঞের অন্তর্গত মনে করিতে পারি। গীতাকার বারবার জ্ঞানযজ্ঞের প্রাধান্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই বলিয়া কোথাও কর্ম্মযোগকে ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন নাই; বরং জ্ঞান দ্বারাই যে কর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করে তাহা দেখান হইয়াছে (সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে; পরিসমাপ্যতে=পূর্ণতা প্রাপ্ত হয)। জনকাদি মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সিদ্ধমহাত্মাদেরে গীতা পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তাঁহারা যজ্ঞের অতীত—যজ্ঞ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লোকসংগ্রহের জন্য, লোককে সৎপথে আনিবার জন্য, জীবসেবার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে। এমন কি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্মত্যাগ করেন নাই, স্বধর্ম্মপালনে রত তাহার উল্লেখ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

—:০:—

তন্ত্রমতে যজ্ঞ

তন্ত্রের যজ্ঞ বুঝিতে হইলে তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তন্ত্র শব্দের ব্যাকরণ গত অর্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই, তন্ ধাতু হইতে তন্ত্র শব্দ সাধিত। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার।

তন্যতে বিপুলমর্থং তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতম্।
ত্রাণঞ্চ করোতি যস্মাৎ তস্মাৎ তন্ত্রমুদাহৃতম্॥

যাহাদ্বারা সতা।বস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অর্থের ভিতর দিয়া বিভূতির ভিতর দিয়া বিপুলরূপ ধারণ করে, যাহা জীবজগদ্‌রূপ বিবিধ দেহের ভিতরে যন্ত্রতন্ত্রমন্ত্রের ভিতর দিয়া আপন মহিমা প্রচার করে, প্রকৃত তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা দান করে, যাহার সাহায্যে আমরা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই, তাহারই নাম তন্ত্র। এই তন্ত্রকে বেদের ন্যায় অপৌরুষেয় বলিয়া তান্ত্রিকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহার অপর একটি নাম আগম, যাহা শিবের মুখ হইতে বাহির হইয়া ভগবতীর কানের ভিতর দিয়া আত্মা পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছিল। জীবের হিতের জন্য জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য শিব ইহার প্রচার করিয়াছিলেন। কালের স্রোতে অনেক সিদ্ধ মহাত্মা যে ইহার বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদান্তের ন্যায় তন্ত্রের মধ্যেও আমরা অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈতরূপ বিভাগের পরিচয় পাই। সকলে একই তত্ত্বকে সর্ব্বাংশে একই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, একথা বলা যায় না। দ্বৈতবাদী তন্ত্রের মধ্যে দ্রব্যাত্মক, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ভাবাপন্নের ভিতরে ভাবনাত্মক যজ্ঞ এবং অদ্বৈতবাদীর ভিতরে আমরা কেবলাত্মক যজ্ঞের আভাস পাই। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র রহস্য আবিষ্কার করিয়া তন্ত্র শাস্ত্র জগতের প্রচুর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। চরম সত্য যে যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্রের ভিতর দিয়া কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে যে আমরা কিভাবে চরম সত্যে গিয়া পৌছিতে পারি তাহার একটা সুন্দর কৌশল আমরা ইহার ভিতর দেখিতে পাই।* তন্ত্রের পশ্বাচার শুদ্ধিপ্রধান দ্রব্যাত্মক ভাবে পূর্ণ; বীরাচার দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞে প্রভাবিত হওয়ার প্রণালী এবং দিব্যাচার কেবলাত্মক ভাবের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। তন্ত্রের ভিতরে বৈদিক ভাবের প্রভাব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তবে বৈদিক ভাবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিভাব আবির্ভূত হইয়াছিল তন্ত্র অনেক সময় সেই ভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী তন্ত্রে বৌদ্ধ প্রভাবও বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রে যজ্ঞের উপকরণ এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালীর মধ্যেও যে বৈদিক যজ্ঞ হইতে অনেকটা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়বিশেষে হবনীয় দ্রব্য অর্থাৎ ইড়ার স্থানে বিবিধ মুদ্রা ও ভর্জ্জিত দ্রব্যাদি এবং সোমের স্থানে মদ্যাদি আসিয়া যে দেখা দিয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন কৌলগণ দ্রব্যপানে হোমবুদ্ধি ও বীর্য্যাধানে আহুতি বুদ্ধি করিয়া

* পূজা পুস্তকে যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র রহস্য দ্রষ্টব্য।

থাকেন। আবার যামলে দেখিতে পাই 'হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানমাত্মনা' অর্থাৎ দ্রব্যপানরূপ হোমদ্বারা চিতিশক্তির উপরে উঠিয়া পরমাত্মায় সমাহিত হইতে হইবে। এইখানেই আমরা পঞ্চতত্ত্বের প্রাধান্য দেখিতে পাই। তবে ইহার মধ্যেও যে একটা সুন্দর আধ্যাত্মিক সাধন তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। তন্ত্রে পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার ভেদে তাহাদের সাধন ভেদ এবং অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি ভেদও দৃষ্ট হয।

তন্ত্রের ভিতরে যোগের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। মূলাধার চক্রে (যন্ত্রে) দ্রব্যযজ্ঞ, মণিপুরে তপোযজ্ঞ, অনাহতে ভাবনাত্মক যজ্ঞ, আজ্ঞায় জ্ঞানযজ্ঞ এবং সহস্রারে কেবলাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র দেখিতে পাই, মূলাধারে পাদ্য, মণিপুরে অর্ঘ্য, অনাহতে ধূপ, আজ্ঞায় দীপ, সহস্রারে নৈবেদ্য অর্পণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আবার ইহাও দেখিতে পাই,

ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তাবাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহম্ ॥

অর্থাৎ সুষুম্না মার্গে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ হবিঃ দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া সেই আত্মাগ্নিতে আমি আহুতি প্রদান করিতেছি। অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির সাহায্যে আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে পৌঁছিতে চাই।

যজ্ঞের কুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মশক্তি নাদরূপে স্ফুরিত হয়, পরে সেই নাদ বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিরেখায় ত্রিকোণযোনিতে পরিণত হয়। সেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপা ত্রিশক্তিরূপিণী যোনিই জগজ্জীবের উৎপত্তি স্থান। ইহাই যোগশাস্ত্রের "অকথ আদি

ত্রিরেখাত্মক চক্র”,—ইহাই গীতার “মহদ্ ব্রহ্মযোনি” এবং আগমের “চিৎকুণ্ড”। আমাদের হবনকুণ্ড এই চিৎকুণ্ডের প্রতীকমাত্র। বলা বাহুল্য, ইহা ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত।

তন্ত্র ষট্‌চক্রকে ছয়টি কুণ্ডরূপে বর্ণনা করিয়া মূলাধারে ক্ষিতি, স্বাধিষ্ঠানে অপ্, মনিপুরে তেজ, অনাহতে মরুৎ, বিশুদ্ধাখ্যে ব্যোম এবং আজ্ঞায় জীবাত্মাকে আহুতি দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে পঞ্চতন্মাত্র এবং তদুৎপন্ন পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এবং জীবাত্মাকে—এক কথায় সমস্ত ইদং তত্ত্বকে শিবে পূর্ণাহন্তায় আহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মতান্তরে পঞ্চকুণ্ডে পঞ্চকোশ—পঞ্চকোশের বৃত্তিসমূহ এবং ষষ্ঠকুণ্ডে জীবাত্মাকে হবনায় দ্রব্যরূপে আহুতি দিবার উপদেশ দেখা যায়। আসল কথা, অহমগ্নিতে তৎ পদার্থে) যাবতীয় ইদং পদাথ (ত্বং-পদার্থ) নিবেদন করিয়া তত্ত্বমসি তত্ত্ব উপলব্ধি করাই তন্ত্রোক্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের অঙ্গীভূত এবং সেই দিকেই তন্ত্রের বেশী দৃষ্টি ছিল।

মনুষ্যদেহের বিভিন্নতত্ত্বে ভগবৎ-লীলা দর্শনই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ আমাদের ভিতরে পরমাত্মা জীবাত্মা চিত্ত তত্ত্ব অহংতত্ত্ব বুদ্ধি-তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব ইন্দ্রিয়তত্ত্ব এবং ইহাদের কার্যক্ষেত্ররূপে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বর্তমান। যেমন বাতির ভিতর দিয়া জ্যোতির প্রকাশকে আমরা বাতি জ্বলন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি, ঠিক সেইরূপ আমাদের বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া ভগবৎপ্রকাশকে আমাদের জানা আনন্দ করা কর্ম্ম করা প্রভৃতি নামে আমরা মিথ্যা প্রয়োগ করিয়া থাকি। ঋষিগণ আমাদের এই সব ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া কি ভাবে ভগবৎ-চৈতন্য প্রকাশ পাইতেন সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎ-লীলা

দর্শনে বিভোর হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের মতে ভগবান কি ভাবে আমার চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন, কানের ভিতর দিয়া শুনিতেছেন, মনের ভিতর দিয়া বিচার করিতেছেন, চিত্তের ভিতর দিয়া আনন্দ আস্বাদ করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করাই ছিল তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন। 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ' ইত্যাদি শ্রুতি ইহার সাক্ষী। আমার দেখাকে তাঁহারা বলিতেন এই চক্ষুর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, এইরূপ আমার শোনা আমার কানের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমার বলা আমার মুখের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমার জ্ঞান আমার বুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর দিয়া তাঁহার উপলব্ধি—'আমার আনন্দ আমার চিত্তের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ,—এককথায় আমার দেখা শোনা কাজ করা' বিদ্যা বুদ্ধি শান্তি এসমস্তই তাঁহার কৃত এই দেহের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার বিবর্ত্তন তাঁহার লীলা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমার এই দেহ যন্ত্রটি তাঁহারই স্বহস্তে নির্ম্মিত তাঁহার লীলাক্ষেত্র। ইহার ভিতর দিয়া তিনি তাহার নিজের সব তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতেছেন ; তিনি ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আর কিছুই নাই।

যজ্ঞ অর্থ তাঁহারই এই বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ বা লীলা ; সুতরাং এই দেহের ভিতরে যতগুলি অবয়ব বা তত্ত্ব আছে যজ্ঞ বা তাহার ক্রিয়া—লীলা প্রকাশও সংখ্যায় ততটি হওয়া স্বাভাবিক। এ সব যে তাঁহারই, আমার বলিতে ইহার মধ্যে যে কিছুই নাই এই তত্ত্বের উপলব্ধি যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সংসারটা কল্পিত অহংকারের প্রভাবমাত্র ; ইহার বৃথা অভিমান দূর করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। তাই যজ্ঞকে ত্যাগাত্মক বলা হয়।

তন্ত্রমতে অগ্নি স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমশিব, পূর্ণাহন্তা—এবং অগ্নির পাঁচটি শিখা যথাক্রমে স্বাতন্ত্র্য, নিত্যতা, পূর্ণতৃপ্তি, সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা —ইহাদের নিকট যথাক্রমে অধীনতা, অনিত্য দেহাদিভাব, কামনা তৃষ্ণা,

অহংভাব ও অল্পজ্ঞতাকে আহুতি দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার পরশুরামের কল্পসূত্রে দেখিতে পাই, "সর্ব্বং বেদ্যং হব্যং, ইন্দ্রিয়াণি স্রুচঃ, শক্তয়ো জ্বালাঃ, স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা।" বহ্নি স্বয়ং শিব, শিবভাবাপন্ন পূর্ণশুদ্ধ পরিচ্ছিন্ন চিদ্ভাবাপন্ন-জীব হোতা, হবি সমস্ত ইদংপদার্থ বা বিষয়, স্রুক্ ইন্দ্রিয়। যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর করিয়া শিবভাব প্রাপ্ত হইবার জন্যই যজ্ঞ বিহিত। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই,—

অন্তর্নিরন্তরম্ অনিন্ধনমেধমানে
মোহান্ধকার-পরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত-মরীচি-বিকাশভূম্নি
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্ ॥

"ইন্ধনশূন্য হইয়াও নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত, মোহরূপ অন্ধকারের বিনাশক, অদ্ভুত কিরণজাল বিস্তারকারী কোন এক অনির্ব্বচনীয় সংবিৎ-রূপ অগ্নিতে আমি শিবাবশিষ্ট সমস্ত বিশ্বকে আহুতি দিতেছি।" বলা বাহুল্য এখানে স্বয়ং শিব অগ্নি, তন্ত্রোক্ত ৩৫টি তত্ত্ব হব্য এবং শিবভাবাপন্ন সাধক স্বয়ং হোতা, ইহা কেবলাত্মক যজ্ঞের মহিমা প্রকাশ করে।

তন্ত্রমতেও অগ্নি হবনীয় দ্রব্যকে শুদ্ধ করিয়া এবং ক্রমান্বয়ে রক্ত, বীর্য্য, ওজঃ ও সুধায় পরিণত করিয়া সেই সুধাকে শিবে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের অবরোহণরূপ যজ্ঞ এবং জীবের আরোহণ-রূপ যজ্ঞের ভিতর দিয়াও আমরা বৈদিক পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের একটা আভাস পাই—যাহার অপভ্রংশরূপে কদর্য্য বলিপ্রথার এইরূপ বাহুল্য সমাজে দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, বৈদিক যজ্ঞকে তন্ত্র অনেকটা দেশকাল পাত্রের অনুকূল করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনের সহায় হইয়া-ছিলেন। পরের আগন্তুক বিকৃতির জন্য প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক দায়ী নহেন।

মানুষ উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে সংস্কারের বশে অভ্যাসের দোষে যে সব অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলির মধ্যে শুধু একটা কুৎসিৎ ভাব আরোপ করিতে বসিয়াছে, যে কাজগুলি না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না, সে কাজগুলির ভিতরকার প্রকৃত রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া সে কাজগুলিকে এমন ভাবে অনুষ্ঠান করিবার তন্ত্রশাস্ত্র, এমন একটা পথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—যাহাতে সে সব কাজগুলিও পতনের ও বন্ধনের কারণ না হইয়া উন্নতি ও মুক্তির সহায় হয়। এই দানের প্রকৃত মর্ম্ম মানুষ একদিন হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইবে। তন্ত্রমতে ব্যষ্টি জীবদেহে জগতের সমষ্টি-দেহের সব তত্ত্ব বর্ত্তমান। দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্নচক্রে ভগবতীর অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে অবস্থিত; সেই সব শক্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া পূর্ণ বিকশিত করিয়া না তুলিলে পূর্ণ স্বরূপকে পূর্ণভাবে আস্বাদ করা অসম্ভব। তারপরে ব্যষ্টিদেহকে সমষ্টিদেহে আহুতি দিয়া ভগবানে পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে ব্যষ্টিজীব ঈশ্বরে তন্ময়তা লাভে সুযোগ পান। তাঁহাকে দেখিতে হইলে সাধনা দ্বারা চোখের দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন এবং পরে দিব্যদর্শন লাভ করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য চাই দিব্যদর্শন, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য চাই দিব্যশ্রবণ, তাঁহাকে জানিবার জন্য চাই দিব্যজ্ঞান। মনে রাখিতে হইবে ভগবানের প্রিয়সখা অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও তাঁহার জ্যোতিঃ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। বেদান্ত যাহাকে বাক্য মনের অতীত মনে করিয়া কতকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তন্ত্রমতে তাঁহাকে এতটা জানা যায় এবং পাওয়া যায় যাহার কোটি ভাগের একভাগও আমরা পৃথিবীর কোন জিনিষকে, কোন মানুষকে পাইতে পারি না। তবে সে জন্য চাই অপ্রাকৃত ধামের অপ্রাকৃত শক্তি এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়। উপনিষদ্ 'স চক্ষুঃ অচক্ষুরিব' ইত্যাদি বাক্যে তাহার

সামান্য একটু আভাস দিয়াছেন মাত্র। কি করিয়া সব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত করা যায় তাহার অপূর্ব্ব রহস্য আমরা দেখিতে পাই তন্ত্রশাস্ত্রে।

বেদান্তমত এবং তন্ত্রমতের ভিতরে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। জ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্মহ্রদে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকা; অনেক তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবের লক্ষ্য ভগবৎ-লীলার সহায় হওয়া। অনেক জ্ঞানী ব্রহ্মহ্রদে ডুবিয়া আর উঠিতে চান না—সেখানে পৌঁছানই তাঁহার শেষ লক্ষ্য। তন্ত্র চান অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া আবার লীলার ছলে অদ্বৈতের দ্বৈতাবস্থায় লীলারস আস্বাদ করিতে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে 'বোধসারের' সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি—

দ্বৈতং মোহায় বোধাৎপ্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

অর্থাৎ, জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে যে দ্বৈতবুদ্ধি তাহা শুধু মোহের হেতু; কিন্তু তারপরে মনীষাদ্বারা যখন প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখনকার লীলার জন্য কল্পিত যে দ্বৈত তাহা অদ্বৈত হইতেও সুন্দর।

তন্ত্রশাস্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি লইয়াই হইয়াছে তান্ত্রিক যজ্ঞ; সুতরাং তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। জগতে গীতার দান ও তন্ত্রের দান অতুলনীয়।

—ঃ০ঃ—

বর্ত্তমান কালোপযোগী যজ্ঞ

যজ্ঞ যখন কল্যাণসাধনের ভগবৎপ্রাপ্তির এতটা সহায় তখন সকলে যাহাতে যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এই যজ্ঞ যাহাতে সকলের পক্ষে সম্পাদন করা সহজ হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

যজ্ঞ কি, যজ্ঞ দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়, যজ্ঞ কেন করা হয়, যজ্ঞ কিভাবে আমাদের চিত্ত শুদ্ধির, উন্নতির, কল্যাণের, ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয় এ তত্ত্ব ভালভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। যজ্ঞের মন্ত্রগুলিকে এমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত সুখবোধ্য, হৃদ্য, সহজসাধ্য করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহার দিকে লোকের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময় যজ্ঞ এমনভাবে সাধিত হওয়া দরকার—যাহা দ্বারা মানুষের বর্ত্তমান প্রয়োজনগুলি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, যাহা দেহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্যবর্দ্ধক, যাহা কর্ম্মে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিদায়ক, যাহা মনকে জ্ঞানে, প্রেমে ও আনন্দে মধুর করিয়া তুলিতে সমর্থ যাহা সমাজের, দেশের ও জীবমাত্রের একান্ত হিতকর, যাহা সকলের উন্নতি ও শান্তির সহায়, যাহা দেখিয়া লোকে যজ্ঞ করিতে লুব্ধ হইবে, যাহা ব্যয়-বহুল ও শ্রমসাধ্য নহে, যাহাতে বেশী সময় নষ্ট না হয়, যাহার অনুষ্ঠানে সকলে আনন্দ পায়। যজ্ঞ এমনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার যাহা দ্বারা হাওয়া শুদ্ধ হয়, চিত্তের সদ্ভাব জাগ্রত হয়, যাহা সব অশান্তি-অভাব দূর করিয়া

শান্তি আনয়ন করে, যাহা একতাবর্দ্ধক, কল্যাণসাধক, মুক্তির ও ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়, যাহার অনুষ্ঠানে ঈর্ষ্যাদ্বেষ দূর হইয়া মানুষের মনে একটা সদ্ভাব আনয়ন করে, পরস্পরের ভিতরে একটা একতা স্থাপন করিয়া সমাজের, দেশের, জগজ্জীবের উন্নতির ও শান্তির সহায় হয়।

যজ্ঞ যাহাতে সহজসাধ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যজ্ঞকে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন করিতে হইবে। প্রাচীনকালের যজ্ঞাঙ্গ ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি-গুলি যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে। উদ্দেশ্যটা ঠিক থাকিবে অথচ বাহুল্য ও বিকৃতি সহজ ও সুন্দরভাবে বর্জ্জিত হইবে। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ইত্যাদির স্থানে একজন অগ্নিরক্ষক (ব্রহ্মা) এবং দুই তিন জন হোতা থাকিবে।

অগ্নি চয়নের সময়, অগ্নি স্থাপনের সময় প্রাণায়াম ষট্‌চক্র ভেদ পঞ্চ-কোশবিবেক আদি তত্ত্ব সকলে মিলিয়া চিন্তা করিবে। দেহের প্রতি তত্ত্বে ভগবৎ শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

ভগবৎ-শক্তির, ভগবজ্জ্যোতির আবির্ভাবের জন্য সমবেত প্রার্থনা করিবে। 'আবিরাবীর্ম্ম এধি'—আদি মন্ত্র পাঠ করিবে পূজার দ্রব্যাদি শোধনের সময় ইড়া ও সোম দেবতাকে আবাহন করিবে। ইড়া—যজমান-পশুর স্থানে চাউল আটা পেস্তা বাদাম কিসমিস ঘি চিনি দ্বারা নির্ম্মিত পিষ্টক ব্যবহার করা হইবে। সোমাদির স্থানে দুগ্ধাদি ব্যবহৃত হইবে। ইহারা যে যজমানের—ইড়া ও সোমের প্রতীক তাহা যেন সকলে বুঝিতে পারে। ইহা ছাড়া ধূপ ধুনা আদি সুগন্ধ দ্রব্যও আহুতি দিতে হইবে। পিষ্টক

দুগ্ধ ঘি ও ফলাদি অর্পণ করিয়া যজ্ঞাবশেষ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিবে এবং সেই সময় একতাবর্দ্ধক "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং", "অপাম সোমমমৃতা অভূম"—আদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পূর্ণাহুতিকে পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা যে সব মন্ত্রের, সব তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের ফলে ভগবানে পূর্ণ আত্মনিবেদন, ভগবানের হাতের যন্ত্র হইয়া জীব সেবায় জীবন উৎসর্গীকরণ, তাহা যেন সকলে বুঝিতে পারে। এই সময় "ময়ার্প্যতে তচ্চরণেঽয়মাত্মা" "মাং পশ্য চালয় বিভো সততঞ্চ রক্ষ পূর্ণা ভবত্বন্যদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা", "সর্ব্বং ত্বদীয়মিতি মে প্রিয়মেব সর্ব্বং তৎপ্রীতয়ে সততমেব নিযোজয়ানি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে। ভাবনাত্মক যজ্ঞের স্থানে এক এক তত্ত্ব চিন্তা করিয়া ভিতরে বাহিরে কি ভাবে সর্ব্বদা যজ্ঞ সাধিত হইয়া যাইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। আরতির আগে আরতি যে কেন কিভাবে আত্মনিবেদন পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন তাহা যেন সকলে বুঝিতে পারে।

এই যজ্ঞবিধি ও তাহার তাৎপর্য্যের মধ্য দিয়া শুধ যজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইল। সময়ের ও শক্তির যোগ্যতার অভাবে ইহার মধ্যে অনেক অভাব ত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি কৃপালু পাঠকগণ ইহাকে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে একটা সুন্দর আকার দান করিতে চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

---

* শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজের একনিষ্ঠ ভক্ত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের [যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চিঠি সংকলন করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন] 'যজ্ঞের কাল' সম্বন্ধে লিখনটুকু এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১। দৈনিক

প্রাতে যজ্ঞ করিলে সায়াহ্নের মধ্যেই তার ফল পাওয়া যায়। সায়ংকালে যজ্ঞ করিলে (পরদিন) প্রাতের মধ্যেই তার ফল পাওয়া যায়। সেই ফলটি সৌমনস্ (আনন্দ)। তাই ঋষিরা প্রতি প্রাতঃ সায়ং যজ্ঞানুষ্ঠান প্রশস্ত মনে করিতেন।

(ক) প্রাতঃ প্রাতঃ গৃহপতির্ নো অগ্নিঃ
সায়ং সায়ং সৌমনস্য দাতা।
বসোর্ বসোর্ বসুদা ন এধি
ইন্ধানাস্ ত্বা শতং হিমা ঋধেম ॥

(অথর্ব) আঙ্গিরস বেদ—১৯-৫৫-৪

প্রাতে প্রাতে (প্রতিপ্রাতে) অগ্নিকে গৃহপতিরূপে (পরিবারের রক্ষকরূপে) উপাসনা করিলে, তিনি সায়ংকালেই তাহার ফলে আনন্দ দেন। এই আনন্দ সর্ব্ববিধ বস্তুর (সম্পদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ইহার দাতা হইয়া, হে অগ্নে, তুমি এস। তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা যেন শতটি শীতকাল (বত্সর) ভালভাবে কাটাইয়া দিতে পারি।

(খ) সায়ং সায়ং গৃহপতির্ নো অগ্নিঃ
প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনস্য দাতা।
বসোর্ বসোর্ বসুদা ন এধি
বয়ং ত্বেন্ধানাস্ তন্বং পুষেম ॥

(অথর্ব) আঙ্গিরস বেদ ১৯ ৫৫-৩

সায়ংকালে অগ্নি গৃহপতিরূপে অর্চ্চিত হইলে (পরদিন) প্রাতঃকালেই তিনি আনন্দের দাতা হন। সর্ব্ব সম্পদের শ্রেষ্ঠ এই সম্পদ্ দানের জন্য, হে অগ্নে, তুমি এস। তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা তনুকে (আত্মাকে) পুষ্ট করিব।

মধ্যাহ্নেও যজ্ঞ বিধেয়।

(গ) দুহে সায়ং দুহে প্রাতর্ দুহে মধ্যন্দিনং পরি।
দোহা যে অস্য সংযন্তি তান্ বিদ্ম অনুপদস্বতঃ॥
(অথর্ব) আঙ্গিরস বেদ ৪-১১-১২

যজ্ঞরূপ ধেনুকে সায়ংকালে দোহন করিবে, প্রাতে দোহন করিবে আবার মধ্যাহ্নেও দোহন করিবে। যাহারা এরূপ দোহন করেন তাহাদিগকে উপদস্-বত্ (ক্ষয়শীল) হইতে হয় না।

কেহ কেহ দৈনিক পাঁচবার যজ্ঞের পক্ষপাতী।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ কঠোপনিষদ্ ১-৩-১

ব্রহ্মবিদ্‌গণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ বা তিনবার নাচিকেত (অগ্নি) জ্বালেন। কেহ বা পাঁচবার অগ্নি জ্বালেন। [হিন্দুরা তিনবার, পার্শীরা পাঁচবার।]

২। পাক্ষিক (দর্শ-পৌর্ণমাস)

কালক্রমে দৈনিক যজ্ঞানুষ্ঠান দুঃসাধ্য মনে হইতে থাকিল। তাহাদের জন্য, পক্ষে একবার অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞের বিধান দেওয়া হইল।

অগ্নিহোত্রং চ জুহুয়াত্ সায়ং প্রাতর্ যথাবিধি।
দর্শেন চৈব পক্ষান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥
কূর্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড)-২৪-১

৩। নৈমিত্তিক

পাক্ষিক যজ্ঞও যাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না তাহারা কোনও নিমিত্ত —যথা, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা, কিংবা উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি পর্ব্ব, কিংবা পারিবারিক কোনও শুভ (অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি) ঘটনা—অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই বৈদিক উপাসনা পদ্ধতিটিকে একেবারে লুপ্ত হইতে দিবেন না।

—:•:—

যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা—ঋত্বিক্ ও অধ্বর্যুবৃন্দ *

বলা বাহুল্য যাহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাদের প্রত্যেককে শুদ্ধ হইয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, যজ্ঞে ব্রতী হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় তাহাদিগকে সংযত থাকিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। যিনি যে কাজের ভার নিয়াছেন সেই ভাবে পরিভাবিত হইযা থাকিতে সচেষ্ট থাকিতেন—তিনি সে কাজে তন্ময়তা লাভ করিতেন। যাত্রা বা থিয়েটার করিবার সময় প্রহ্লাদ আদি অভিনেতৃগণ যদি আপন আপন পাঠ মুখস্থ করিয়া আপন আপন ভাবে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে নকল ভাবগুলি আসল ভাবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দকে যে মোহিত করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠাতার মধ্যে—১। অধ্বর্য্যু—ইনি বেদীর উপর কুশ প্রভৃতি গুছাইয়া সব ঠিক করিয়া রাখিবেন, পুড়োডাশ আদি প্রস্তুত ও অগ্নিসংরক্ষণ ইহার প্রধান কার্য্য। এইসব অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি এমনভাবে সংগৃহীত, সুসজ্জিত যাহার উচ্চারণের ভিতর হইতে সমস্ত দেহতত্ত্বগুলি, ভিতরকার অগ্নিসোমের ক্রিয়াগুলি, রহস্যগুলি আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া ঋত্বিককে প্রকৃত যজ্ঞসাধনের অধিকার দান করে। ইনিই প্রকৃত যজ্ঞকর্ত্তা। ইহার ভাব ও কাজ দেখিয়া সকলের পক্ষে যজ্ঞতত্ত্ব বুঝা সহজ হইয়া পড়ে। ইনি হইয়া পড়েন মূর্ত্তিমান যজ্ঞ। যাঁহার চোখ মুখ কথা ভাব ও কাজ প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্বকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

---

* যজমান অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা যজ্ঞ করাইবার ব্যবস্থা আছে তাহার নাম ঋত্বিক্। বিভিন্ন ক্রিয়াভেদে ঋত্বিকের বিশেব বিশেষ নামকরণ যথা,—অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, হোতা, অগ্নীধ্র ইত্যাদি।

২। হোতা—ইঁহার কাজ দেবতাদিগকে আহ্বান করা। মনে রাখিতে হইবে যে অগ্নি স্বয়ং দেবতাদের হোতা। ইনি বহুদিন যাবৎ সংযত ও শুদ্ধ হইয়া নিজের ভিতরে অগ্নিদেবতার ধ্যান করিতে থাকিলে এমনভাবে ইঁহার সব তত্ত্বগুলি অগ্নিময় হইয়া পড়ে যে তখন আর দেবতাগণ ইহার আহ্বানে যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৩। ব্রহ্মা—ইনি বেদমন্ত্রে হইতেন সুপারগ, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যানে সুদক্ষ। সমস্ত কাজ ঠিকভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না ইহার তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হইত ইহার হাতে।

৪। উদ্‌গাথা—যজ্ঞের সময় সামগান করিতেন।

৫। যজমান—যজমানো বৈ পশুঃ। যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতাই ছিল যজমান। ইনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বহুদিন যাবৎ যজ্ঞ-রহস্য চিন্তা করিতে করিতে পূর্ণশুদ্ধ হইয়া পূর্ণভাবে ভগবানে নিজকে আহুতি দিয়া পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে দেবত্ব লাভ করিতেন। সব তত্ত্বকে পূর্ণভাবে ভগবানে আহুতি দিয়া—নিজে শিবময় হইয়া যাইতেন। যজ্ঞের উৎসবটি এমনভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যাইত যাহার ফলে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দর্শক সহায়ক সকলে যজ্ঞভাবে পরিভাবিত হইয়া যাইতেন।

————

অগ্নিতত্ত্ব

অগ্নি শব্দ অগ্‌-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি গতিপ্রাপ্ত, পরিণত বা বিবর্ত্তিত হন, যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয় তিনি অগ্নি। "যস্মাদস্য যতঃ" সূত্রানুসারে ব্রহ্মই অগ্নিশব্দের মুখ্য অর্থ। অগ্নি শিব, অগ্নি শিবের বিমর্শ শক্তি, যিনি সমস্ত শক্তির মূলাধার (Power House) তিনিই অগ্নি। সুতরাং যিনি শক্তি সঞ্চার করেন, যিনি জীবন দান করেন, যিনি বাঁচাইয়া রাখেন, এককথায় যিনি বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন তত্ত্বে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দের বর্দ্ধক, জীবের পরিণাম লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় তিনিই অগ্নি। অগ্নিতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহা বেদের অন্নাদতত্ত্ব বা প্রাণতত্ত্ব। জীবজগৎ, প্রকৃতি পুরুষের, শক্তি শক্তিমানের, সোম ও অগ্নির, রয়ি ও প্রাণের, (তন্ত্র ও পুরাণাদি মতে) শক্তি ও শিবের, রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলারহস্য। শব্দরহস্য চিন্তা করিলে জানা যায় যে, অগ্নির মুখ্য অর্থ ব্রহ্ম, গৌণতঃ বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন কোশে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন দেবতা বা ব্রহ্মপ্রকাশ। সহস্রারে অগ্নি ব্রহ্ম, আজ্ঞায় ভগ, অনাহতে প্রাণ, মণিপুরে বৈশ্বানর, মূলাধারে স্থূল অগ্নি। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আমরা অগ্নির বিভিন্ন চক্রে, বিভিন্ন কুণ্ডে বিভিন্নরূপে অবস্থান ও বিভিন্ন নামের পরিচয় পাই। পঞ্চাগ্নি পঞ্চচক্রে পঞ্চকোশে অবস্থিত প্রাণশক্তি। গীতায় ইন্দ্রিয়গণের সংযমাগ্নিতে, বিষয়ের ইন্দ্রিয়াগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের প্রাণ ও সমস্ত কর্ম্মের আত্মসংযম যোগাগ্নিতে আহুতির ভিতরেও আমরা এ তত্ত্বের আভাস পাই। দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক, কেবলাত্মক যজ্ঞের আহুতিগুলিও প্রতীক স্থূল

অগ্নি সূক্ষ্ম প্রাণাগ্নি ও কারণ আত্মাগ্নির রহস্য প্রকাশ করে। অগ্নি দেবতাদের দূত, বাইবেলের Holy Ghost, পুরাণের ইহপরকালের সম্বন্ধকারক নারদ ঋষি। ইহা হইতে জানা গেল যে অগ্নি স্বরূপতঃ মুখ্যতঃ ব্রহ্ম, গৌণতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য, পঞ্চদেবতা, বিভিন্ন চক্রে অবস্থিত ব্রহ্মশক্তি বা ভর্গ।

ইহার পরে অগ্নির আবাহন বা অগ্নির চয়ন-রহস্য। ষট্‌চক্রভেদ, পঞ্চকোশ-বিবেক, পঞ্চ-মকার, কুণ্ডলিনীর জাগরণ আদি ক্রিয়া সাহায্যে জীবাত্মার মনের সহস্রারে (Power Houseএ) গমন। সেখানে গিয়া অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ, তাহার পরে সেই অগ্নিকে দেহের জগতের প্রতিতত্ত্বে আনয়ন করিয়া প্রতিতত্ত্বে তাহার অবস্থান-রহস্য জানিয়া প্রতি তত্ত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া যজমানকে পুরুষোত্তমে পরিণত করিবার ব্যবস্থা বিশেষ। আদ্যাশক্তির (Power Houseএর) সঙ্গে সব কেন্দ্রগুলির যোগ স্থাপন করিয়া সব কেন্দ্রগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন ও দিব্যদর্শন আদি লাভ করিয়া সাধককে ব্রহ্মভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার রহস্য আমরা অগ্নিচয়ন মন্ত্রে দেখিতে পাই (দেবো ভূত্বা দেবান্ যজেৎ, উপাসককে উপাস্যে, ত্বং-কে তৎ-এ, God-the-sonকে God-the-Fatherএ পরিণত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা চিন্তনীয়)। সুতরাং অগ্নির আবাহনের দ্বারা সব কেন্দ্রকে অগ্নির আবির্ভাবের দ্বারা সবতত্ত্বকে অগ্নিময়, শক্তিময় করিয়া ব্রহ্মময় করিয়া তোলা। অগ্নিচয়নের ভিতরে আমরা সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির পূর্ণানুভূতি লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। অগ্নিচয়নের সময় ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, পঞ্চকোশ-বিবেক চিন্তনীয়। প্রথমে নেতি নেতি সাধনার দ্বারা সহস্রারে ভগবদ্ধামে

পৌঁছিতে হইবে। সেখানে গিয়া অগ্নির স্বরূপ জানিতে হইবে। তারপরে সেই অগ্নিকে সব তত্ত্বে লইয়া যাইতে হইবে—সব তত্ত্বকে তদ্ভাবে পরিভাবিত করিতে, পরিভাবিত দেখিতে হইবে (তুলনীয় Descent of the Divine)। সপ্ত ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে এই অগ্নির (ভর্গের) নিকট গমন, অগ্নির স্বরূপ অবধারণ এবং অগ্নিকে সবতত্ত্বে আবাহন করিয়া সবতত্ত্বকে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী সাধনের ভিতরে ষট্চক্রভেদ কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং সব চক্রে সব তত্ত্বে ভগবৎ-শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) অতি সংগোপনে সুরক্ষিত। সুতরাং অগ্নি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, গৌণতঃ ভর্গ, প্রাণ, বৈশ্বানর, স্থূল অগ্নি। অগ্নির আবাহন —ভগবৎ-অবতরণের দ্বারা সবতত্ত্বকে ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত করা। হবনের কুণ্ড যে আসলে দেহস্থিত বিভিন্ন চক্র তাহা মনে রাখিতে হইবে।

যজ্ঞে অগ্নির সহিত সর্ব্বদা সোমের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অধিকাংশ মন্ত্রগুলি অগ্নি ও সোমের, প্রাণ ও রয়ির, অন্ন ও অন্নাদের তত্ত্বে পূর্ণ। এই অগ্নি ও সোমের প্রকৃত রহস্য জানা না থাকিলে জগদ্-রহস্য সাধনরহস্য ভগবৎ-লীলারহস্য বুঝা অসম্ভব। আসল সোম অমৃত-রূপে পরম দেবতা প্রকৃত অগ্নির তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। বিবিধ পরিণামপ্রাপ্ত সোম দেহের বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন কুণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন অগ্নি দেবতাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অগ্নির্বৈ দেবানাম্ মুখম্।* অগ্নিতে অর্পিত দ্রব্য ক্রমে শুদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে অমৃতে পরিণত হইয়া দেব-

* অগ্নি দেবতাদের মুখ। অগ্নিমুখে দেবতারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। "স যদগ্নৌ জুহোতি তদ্দেবেষু জুহোতি" (শঃ ব্রা)। আহুত হবিঃ অমৃত পরিণত হইয়া দেবতাদের আহার্য্য হয়। "জীবং বৈ দেবানাং হবিরমৃতমমৃতানাম্" হবিঃ দেবতাদের জীবন, অমৃতের (দেবতাদের) অমৃত। তিল, তণ্ডুল, ঘৃতাদি হবির্দ্রব্য।

তাদের মুখে গিয়া অর্পিত হয়। সুতরাং অগ্নির ভক্ষণের ভিতর দিয়া দেবতার ভোজন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অগ্নির কার্য্য, অর্পিত পদার্থকে শুদ্ধ করিয়া উপরের তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তন্ত্রমতে মূলাধারে অবস্থিত অগ্নির কাজ ভুক্ত দ্রব্যকে রসে পরিণত করিয়া উহাকে মণিপুরে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং অসার অংশকে মলরূপে বাহিরে নিক্ষেপ করা। মণিপুরস্থ অগ্নি তখন ঐ রসের সারাংশকে রক্তে পরিণত করিয়া ঊর্দ্ধে অনাহতের দিকে প্রেরণ করেন। অসার অংশকে মূত্রাদিরূপে বাহিরে নিক্ষেপ করেন। অনাহতস্থ অগ্নি তখন ঐ রক্তকে বীর্য্যে পরিণত করিয়া ঊর্দ্ধে প্রেরণ করেন, অসার অংশ নিম্ন দিকে ত্যক্ত হয়। বিশুদ্ধাখ্যস্থ অগ্নি তখন ঐ বীর্যকে শুদ্ধ করিয়া তেজোরূপে আজ্ঞাচক্রে অগ্নির নিকট প্রেরণ করেন। আজ্ঞা-চক্রস্থ অগ্নি তাহাকে সুধায় প্রকৃত সোমে পরিণত করিলে তখন উহা সহস্রারস্থ সুধাসাগরে আনন্দময় কোশে গিয়া জমা হয়। ঐ সোম তখন শিবের তৃপ্তি বিধান করিয়া নীচের দিকে ক্ষরিত হইতে থাকে। নীচের দিকে প্রতিতত্ত্বস্থ দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতে করিতে অন্নময় কোশে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়া সুরক্ষিত হইলে উহা আবার ঊর্দ্ধগামী হইয়া সাধককে ঊর্দ্ধরেতা করিয়া প্রচুর শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান আনন্দ দান করে। এইজন্য অগ্নির এই কাজকে শুদ্ধিকরণ (**Distillation**) এবং সোমের কাজকে আপ্যায়ন বলা হয়। সোমের অবতরণই সাধনরাজ্যে 'বৃষ্টি' বলিয়া বর্ণিত হয়। আমাদের পঞ্চ-দশকলাসমন্বিত চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের নীচে অবস্থিত—পিতৃযান মার্গের সহিত ইহার সম্বন্ধ। অমৃতের আধার ষোড়শ কলার চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত। দেবযান মার্গের সহিত উহার সম্বন্ধ। দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ্য সোমের অর্পণই যজ্ঞ। ইহাদ্বারা জগচ্চক্র দেহচক্র পরিচালিত। অন্নকে শুদ্ধ করিয়া প্রকৃত সোমে পরিণত করিয়া দেবতাদের তৃপ্তি বিধান করা হয়,

দেবতারাও তৃপ্ত হইয়া জীবের তৃপ্তি বিধানে তৎপর থাকেন। এই সম্পদ্ বিনিময়ের ফলে ইহলোক ও পরলোকের কার্য্য সুসাধিত হয়। দেবগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে মানুষের কার্য্য করিতে পারেন না। মানুষ যজ্ঞদ্বারা দেবতা-দের সাহায্যে আপন প্রয়োজন সাধন করিয়া লন। আমরা অগ্নির সাহায্যে দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করি—দেবতারা আবার সোমের সাহায্যে জীব জগতের তৃপ্তি বিধান করেন। সুধার সাহায্যে আমাদের সব তত্ত্ব আপ্যায়িত হয়। আমাদেব অনেকটা অজ্ঞাতসারেই এই ব্রহ্মযজ্ঞ ভগবৎ-লীলা আমাদের ভিতরে অহর্নিশি সাধিত হইয়া যাইতেছে। যখন সাধকের ভিতরকার দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন আর অগ্নির আবাহন করিতে হয় না। আমাদের প্রতিতত্ত্বের ভিতর দিয়া এই ভাবনাত্মক যজ্ঞ সাধকের উপলব্ধিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক ক্রমে ক্রমে তখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া আসল যজমানে পরিণত হয় এবং তাহার ভিতর দিয়া পূর্ণা-হুতি সাধিত হইয়া কেবল শিবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তখন সুন্দররূপে অনুভবে আসে।

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা মনে রাখা উচিত। বৈদিক যুগে অগ্নি এতটা সুলভ ছিল না; অগ্নি জ্বালান একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির মতে প্রাচীন আর্য্যগণ হিম-প্রধান মেরুদেশে বাস করিতেন; তাই অগ্নিরক্ষার দিকে তাঁহাদের এতটা দৃষ্টি ছিল। সকলে এ মত গ্রহণ করেন না। অগ্নির বর্ণনা হইতে মনে হয় ঋষিগণ অগ্নিকে শুধু স্থূল অগ্নিতে পর্য্যবসিত করেন নাই, তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য ছিল ভিতরের আসল অগ্নির ব্রহ্মাগ্নির দিকে। স্থূল অগ্নি তাহার বহিঃপ্রকাশ বা প্রতীকমাত্র। আসল কথা আচার্য্যের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। ব্রহ্মচারিগণ রোজ সন্ধ্যাবেলা তাহাতে একখানা

করিয়া সমিধ্ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) প্রদান করিতেন। অগ্নি জ্বালাইয়া রাখার প্রথা প্রাচীন প্রায় সব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ ও রোমের কুমারীগণ অগ্নিরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রাচীন বৈদিক যুগে ত্রিবিধ অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ একটি বেদী রক্ষিত হইত; তাহার পশ্চিম দিকে চতুর্ভুজাকার গাহপত্য, পূর্ব্বদিকে গোলাকার আহবনীয়, দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার দক্ষিণাগ্নির স্থান নির্দ্ধারিত ছিল। গার্হপত্য অগ্নিতেই সাধারণতঃ স্মার্ত্ত যজ্ঞগুলি সম্পাদিত হইত। যজ্ঞ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; (১) শ্রৌত যজ্ঞ—যেমন, অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, প্রভৃতি। বৌদ্ধপ্রভাবে ইহার অধিকাংশ লুপ্তপ্রায়। (২) স্মার্ত্ত যজ্ঞ—স্মার্ত্তযজ্ঞের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ আদি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গার্হপত্য অগ্নি ছিল গৃহস্থের প্রতিনিধি। আহবনীয় অগ্নি পূর্ব্বদিগ্বাসী দেবগণের তৃপ্তির জন্য ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণ দিগ্বাসী যম ও পিতৃগণের তৃপ্তিকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অগ্নি ছিল গৃহস্থালীর প্রতীক, অগ্নিরক্ষা ছিল গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম; গৃহই ছিল সমাজের unit, পিতা ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। অগ্নিমন্থন ছিল একটা উৎসববিশেষ।

প্রাণ-অপান-রূপ অগ্নিদ্বয়ের মন্থন করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিতে হইবে। অন্যত্র দেখিতে পাই, স্বদেহকে অরণি করিয়া, প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানপ্রভাবে অগ্নি প্রস্তুত করিতে হইবে।

—:*:—

হবনীয় দ্রব্য

'সর্ব্বং বেদ্যং হব্যম্' তন্ত্রের এই বচন হইতে মনে হয় বেদের অন্নতত্ত্বের কথা। বেদে যতকিছু তত্ত্ব তাহা অন্ন ও অন্নাদ, রয়ি ও প্রাণ, অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তা এই দুইভাবে বিভক্ত। অন্নাদ যিনি অন্ন ভোজন করেন, মুখ্য অন্নাদ সেই উত্তমপুরুষ স্বয়ং। নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদ করিবার জন্য তাঁহার এই সৃষ্টি, পরিণতি বা বিবর্ত্তন। তিনি **নিজে ছাড়া যাহা কিছু সকলই তাঁহার অন্ন**। তিনি নিজেই অন্ন সাজিলেন। অন্নাদ স্বয়ং শিব, অন্ন তন্ত্রোক্ত পঁয়ত্রিশ তত্ত্ব। এইসব তত্ত্বগুলিতে শিব অনুপ্রবিষ্ট, তাই উপরের তত্ত্বগুলি নীচের তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অন্নাদ বা ভোক্তা, নীচের সব তত্ত্বগুলি যথাক্রমে উপরের তত্ত্বগুলির অন্নস্থানীয়। যজ্ঞে নীচের সব তত্ত্বগুলিকে উপরের তত্ত্বে আহুতি দিয়া শিবে পর্য্যবসিত করিতে হয় (তুলনীয় ষট্-চক্রভেদ)। অন্ন 'ইদং' পদার্থ। মুখ্য অন্নাদ স্বয়ং পরমাত্মা। গৌণ অন্নাদ যাহা কিছু ভোক্তারূপে পরিকল্পিত। ইনি সাধারণতঃ কর্ত্তা ভোক্তা ভাবযুক্ত 'অহং' পদার্থ। পরমাত্মার কাছে আত্মা শ্রেষ্ঠ অন্ন, তাহার পরে চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি দেহের বিভিন্ন অবয়ব এবং ইহাদের ভোগের যাবতীয় উপকরণসমূহ। এক কথায় আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সে সবই তাঁহার অন্ন। প্রথম অন্ন আত্মা, তারপরে (১) আত্মীয়—স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা-বাপ, বন্ধু-বান্ধব, যাহা কিছু। (২) অনাত্মীয়—দেহ, গেহ, ধন, জন, জিনিষপত্র, খাদ্য,

বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি, এই সবই হবনীয় দ্রব্য। এই সকল ভগবানে নিবেদন করিয়া দিয়া এই সকল যে তাঁহারই (আমার নয়) তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ইহাদিগকে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে তাঁহার জীব সেবায় লাগাইতে হইবে। "সর্ব্বং ত্বদীয়ং, ইতি মে প্রিয়মেব সর্ব্বং ত্বৎপ্রীতয়ে সততমেব নিয়োজয়ানি।" 'সর্ব্বং বেদ্যং হব্যম্'—যাহাকিছু জানিবার পাইবার ভোগ করিবার তাহার সবই যে হব্য। অর্থাৎ আত্মা-অনাত্মা প্রভৃতি সকলই ভগবানে আহুতি দিয়া ভগবৎকার্য্য-সাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। জীবজগৎ সমস্তই হব্য শ্রেণীভুক্ত। যজ্ঞে পশুর প্রয়োজন, এ পশু বনের মহিষ অজা প্রভৃতি নহে। "বনের মহিষ অজা মায়ের বাচ্চা, মা সে বলি লন না। যদি বলি দিতে আশ—স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাস-বাসনা।" যজ্ঞের পশু যজমান নিজে। "যজমানো বৈ পশুঃ"। এই পশুকে তাহার অষ্টপাশ বিমুক্ত করিয়া শিবে পরিণত করিয়া সে যে নিজে পশু নয়, স্বয়ং পশুপতি তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সুতরাং যজমান নিজেই পশু। যজমান নিজেকে এবং তাহার সব তত্ত্ব,প্রতীকভাবে তাহার যাহা কিছু প্রিয়, অর্থাৎ তাহার আত্মীয় অনাত্মীয় সব পদার্থই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবে। ইহাদের ত্যাগই শ্রেষ্ঠদান, ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে ভগবৎ-তৃপ্তির জন্য—সেবার জন্য। নিজেও একজন জীব, তাই হব্য সকলকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তাহার নিজের ভোগের দেহরক্ষা ও কল্যাণ সাধনের জন্য লাগাইতে পারিবে।

সুতরাং হবনীয় দ্রব্য হইল, (১) যজমান নিজে। সে তাহার নিজের জীবনকে আদর্শরূপে প্রস্তুত করিয়া ভগবৎকাজে জীবের সেবায় নিযুক্ত করিবে। (২) তাহার পরে নিজের সব প্রিয়জনদিগকে সুন্দর

আদর্শভাবে প্রস্তুত করিয়া দেব-ভাবাপন্ন করিয়া দেবতার কাজে (তৎপ্রীতয়ে ন তু মৎপ্রীতয়ে) নিযুক্ত করিবে। (৩) নিজের যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব সব ভোগ্যদ্রব্য শুদ্ধ করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট নিজের সেবায় লাগাইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, সব লোকের সব দ্রব্যের উপর নিজের স্বামিত্বভাব আছে কিনা—এইজন্য হইতে হইবে জিতেন্দ্রিয় অনাসক্ত, নতুবা তাহাদের শোধনে বাধা পাইবে—অন্যের জিনিষ কি করিয়া দান করিব ? তাহার পরে দেখিতে হইবে সেগুলি শুদ্ধ করা হইয়াছে কিনা এবং ঠিকভাবে ভগবানে অর্পিত হইয়াছে কিনা। আর তো সেগুলি নিজের ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হয় না। ভগবৎসেবায় জীবের সেবায় লাগিতেছে তো ? ভগবৎ-উদ্দেশ্য সফল হওয়া চাই।

আসল হবনীয় দ্রব্য যজমান নিজে,তাহার দেহ ও আত্মা। পরে নিজের বদলে আসিল অন্য মানুষ, পশু, পুড়োডাশ (তৈয়ারী মানুষ) যজমানের মূর্ত্তি ও তাহার প্রিয়দ্রব্যের নমুনা। দেহ ও আত্মার স্থানে আসিল পিষ্টক ও হবি বা দুগ্ধ—ইড়া সোম।

এই হবনীয় দ্রব্য—

(১) জ্ঞানযজ্ঞে—অবিদ্যা অধ্যাস, কামনা বাসনা আসক্তি—সব মনের কল্পনা (mental constructions) অজ্ঞানতা ত্রিবিধ এষণা যাহা কিছু দৃশ্য ইদং (phenomenon) নামরূপ, ব্যষ্টি আত্মা।

(২) ভাবনাত্মক যজ্ঞে—ব্যষ্টি ও সমষ্টি সব তত্ত্ব, তাহাদের ক্রিয়ায় ভগবৎ-লীলা দর্শন, সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উপকরণ।

(৩) দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে—দেহ ও প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন—হোমকুণ্ড, ঘৃতপাত্র, চামচ, কোশাকুশী, পুষ্পপাত্র,

পুষ্প, ফল, তুলসী, চন্দন, দুর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সমিধ্, (শমীকাঠ, যজ্ঞডুমুর, অশোক, বট, পলাশ, শাল, বেল, আম্র কাষ্ঠ) ও হবন সামগ্রী। *

---

* ঘৃত, দধি, বিল্বপত্র (১০৮টি) আতপ চাউল, যব, তিল, মধু, চিনি, পেস্তাবাদাম, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচ, আখরোট, মনাক্কা, কিসমিস।

"ঘৃতদধিতিলাশ্চৈব যবশর্করমিশ্রিতাঃ। এতৎ পঞ্চামৃতং প্রোক্তং হোমে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদম্।"

সুগন্ধি দ্রব্য - কর্পূর, গুগ গুল, চন্দন, অগুরু, কমলের বীজ।

পূর্ণাহুতির জন্য—আস্ত নারিকেল, কলা, আস্ত পান, সুপারী।

মনে রাখিতে হইবে যে সমস্ত হবনীয় দিয়া যজমানের বিভিন্ন অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে হয়, পরে সেই মূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গে যজমানের বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরে যজমানের অঙ্গ প্রতীকরূপে ঐ মূর্ত্তির এক এক অঙ্গ আহুতি দিতে হয়। তুলনীয়—'শরীরং হবিঃ (শিবদর্শন), কুণ্ড=হৃদয় বা মূলাধার; হবিঃ=দ্রব্য=চিত্তের ভাব অর্পণ=ব্রহ্মের (দেবতাদের) নিকট পৌছান। চিতি= প্রজাপতির বা যজমানের স্থূল দেহ। চিত্তি (বেদি) স্রুক্, চিত্ত=আজ্য; বাক্য=বেদি; ধ্যান=কুশ; জ্ঞান=অগ্নি; প্রাণ=হব্য; বিজ্ঞান=অগ্নি।

—ঃ*ঃ—

নিষ্ক্রয় তত্ত্ব

নিষ্ক্রয় শব্দের অর্থ একের বদলে অন্যকে প্রদান। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। সকল তত্ত্বের সকল দ্রব্যের মধ্যেই তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্তমান থাকিয়া লীলা করিতেছেন। দেবতা বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন পদার্থে ভগবৎপ্রকাশ— তাই দেবতা মূলে এক থাকিয়াও বহুরূপে প্রকাশিত। ইঁহারা মানুষের ভাগ্যফল দাতা, ইঁহাদেরে প্রসন্ন করিয়া আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি প্রায় সকল দেশে সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতারা অনেক বিষয়ে যেন আমাদেরই মতন অথচ আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাদের অভাব পূরণে সমর্থ, তাই আমাদের নমস্য—উপাস্য। ইঁহারা আমাদের প্রদত্ত অন্নাদি লাভে স্তব-স্তুতি-সেবায় তৃপ্তি বোধ করেন। মানুষের ভাবগুলি দেবতায় আরোপ করিয়া মানুষ তৃপ্তিবোধ করে। ইহারই ফলে দেবতাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিয়া দেবতাদের সুখী করিয়া আমরা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করি। দেবতাদের এসব দ্রব্যের প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের দান করিবার প্রবৃত্তি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হন। তাঁহারা অন্তর্য্যামী, আমাদের সব খবর জানেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই গোপন থাকে না; তবু আমরা আমাদের মনোভাব তাঁহাদিগকে জানাইলে, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃত-পাপ স্বীকার করিলে তাঁহারা খুসী হন। য়ীহুদীগণ এই জন্য দেবতার নিকট পাপস্বীকার করিয়া (Sin offering) কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত

হইত। Catholic Confessionএর মধ্যেও এই তত্ত্ব নিহিত। তাহাদের মতে জীবমাত্রেই পাপী। আমাদের “পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং” ইত্যাদি মন্ত্রও এই ভাব প্রকাশ করে। অনেকের মতে এই ভাবটি একান্ত বিদেশী। সকল দেশে সকল সমাজে দেবতার কাজে স্বার্থত্যাগ দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিচিত। অনেক দেশে এই জীবন উৎসর্গ এই চরম দান বিকৃত হইয়া নরবলিতে পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইয়া পড়িযাছে। ভগবানের জন্য আত্মাহুতি খুব কম লোকেই করিতে সমর্থ। তাই সমাজে নিজের পরিবর্ত্তে নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জন, প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করিবার প্রথা আসিয়া দেখা দিল। দেবতার তৃপ্তিবিধানে দেবত্বলাভ হউক বা না হউক প্রায় সকল দেশেই এইভাবে নরবলির প্রথা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন য়ীহুদী, গ্রীক, রোমান, সকলেই নরবলি দিত। নিজের জীবন ভগবৎকার্য্যে উৎসর্গ করার পরিবর্ত্তে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র একমাত্র পুত্র—শেষে বড় ঘরের ভাল ভাল ছেলে চুরি করিয়া বলি দেওয়া হইত। কোথাও মূল্য দিয়া ছেলে খরিদ করিয়া তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া শিক্ষিত করিযা দেবতার প্রিয় দেবতার গ্রহণযোগ্য করিয়া বলি দেওয়া হইত। এখনও তাহার প্রতীকভাবে পশুকে পূজার সময় স্নান করাইয়া পূজা করিযা দেবভাবাপন্ন করিয়া তাহাকে বলি দিয়া তাহার মাংস খাইয়া দেবত্ব লাভের চেষ্টা করা হয়। সব চেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে উন্নত দ্রব্যের উৎসর্গই পরম ত্যাগ বলিয়া কথিত হইত। অনেক সময় অপুত্রক পুত্রলাভের জন্য, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মারকভীতি নিবারণের জন্য, পশুবলি এমনকি নরবলি মানত করা হইত। প্রাচীন ভারতে গ্রীসে রোমে ইহার বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় এবং কৌষীতকিব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, রাজা হরিশ্চন্দ্র শত পত্নী সত্ত্বেও অপুত্রক। বরুণ

দেবকে প্রথমপুত্র দিতে মানত করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। কিন্তু পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র রোহিতকে মমতাবশতঃ বলিদিতে অসম্মত হওয়ায় উদরী রোগগ্রস্ত হন। রোহিত তখন অজিগর্ত্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করেন। পাষণ্ড পিতা বহু অর্থ পাইয়া নিজপুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হন। পুত্র ছিল দেবভক্ত, তাই তখন তাহার মুখ হইতে ঋক্-মন্ত্র বাহির হইতে আরম্ভ করায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্তিদান করেন। একজনের পরিবর্ত্তে অন্যকে বলি দেওয়া (নিষ্ক্রয় প্রথা Vicarious offering) খৃষ্টধর্ম্মেও দৃষ্ট হয়; এমন কি ভগবান যীশু জীবের কল্যাণের জন্য জিহোবার মন্দিরে বলিপ্রথা দূর করিবার জন্য নিজেকে নিজে বলিরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত, পশুবলি বা নরবলি দ্বারা দেবতাদের ক্রোধ উপশমিত হয়। পিতাপুত্র ভেদ সত্ত্বেও অভেদ (তুলনীয় ভেদাভেদ বাদ)। যীশু ছিলেন ষোল আনা মানুষ ষোল আনা ঈশ্বর। পূর্ণ মানুষ বলিয়া সকল মানব জাতির প্রতিনিধি রূপে নিজের জীবন দান করিয়া তাহার রক্তে জগতের পাপ ক্ষালিত করিলেন। পূর্ণমানব নিষ্ক্রয় প্রতিনিধি হইলে জগতের কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিলে জীবের সেবায় জীবন দান করিলে বাস্তবিকই ঈশ্বর প্রীত হন, জীবের পাপ তাহাতে দূর হয়। আজও খৃষ্টভক্ত যীশুর রক্ত মদরূপে, তাঁহার মাংস রুটিরূপে ভক্ষণ করিয়া মদ ও রুটিকে মন্ত্রপুত করিয়া তাহা ভক্ষণ করিযা যীশুভাবে পরিভাবিত হইয়া নিষ্পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও বলেন, পুরোডাশ পশুরই আলম্বন—সৌত্রামণী যজ্ঞের সুরা সোমলতার রস। বেদপন্থী সমাজে এই নিষ্ক্রয় প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, দেবগণ মানুষকে পশুরূপে আলম্বন করিলে মনুষ্য হইতে যজ্ঞভাগ পলাইয়া গিয়া

প্রথমে অশ্বে পরে ক্রমান্বয়ে মেষে পৃথিবীতে ব্রীহিযবে ধান্যে প্রবেশ করে। মানুষের নিষ্ক্রয় হইল অশ্ব, অশ্বের গরু, গরুর মেষ, মেষের পৃথিবী পৃথিবীর ব্রীহি যব, ধান্য ইত্যাদি। সুতরাং ইহারা পর্য্যায়ক্রমে নিষ্ক্রয়রূপ যজ্ঞীয় দ্রব্য। ঈশ্বর মানুষের প্রতিনিধি হইয়া তিনিও যজ্ঞীয় পশুতে যজ্ঞীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়াছিলেন, পরিণত রহিয়াছেন। একবার আত্মদান যথাসর্ব্বস্বদান হিংসাত্মক বলিদানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, আবার যজ্ঞের হিংসাত্মক ভাব দূর করিয়া যজ্ঞকে দ্রব্যদানে আনিয়া ফেলা হইল। মূল ত্যাগের ভাবটা রহিয়া গেল। তাই ঈশ্বর পশুমেধ যজ্ঞের পশু। সুতবাং আমাদের যজ্ঞীয় দ্রব্য ঈশ্বরের আত্মার যজমানের আদর্শ মনুষ্যের পশুর প্রতিভূ। আসল কথা, যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে আপনাকে, নিজের যথাসর্ব্বস্বকে, সব প্রিয় দ্রব্যকে ভগবৎপ্রীতিব জীবসেবার জন্য উৎসর্গ করিতে হইবে। যাজ্ঞিকের এই ত্যাগই যজ্ঞ—ত্যাগই ভারতীয় সাধনভজনের সারতত্ত্ব—এই ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" যে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয় সে সকলই আত্মার আত্মীয়ের প্রতিনিধি প্রতীক নিষ্ক্রয় Substitute *

---

* এখানকার ভাবটি সম্বন্ধে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীব "যজ্ঞকথা" দ্রষ্টব্য।

—:*:—

(২২)

যজ্ঞের পশু

যিনি নিজেকে জগতের কল্যাণের জন্য ভগবৎপ্রীতিসাধনের জন্য দান করেন সেই যজমানই যজ্ঞের পশু। "যজমানঃ বৈ পশুঃ"। পশুপতি নিজে যজ্ঞের জন্য পাশবদ্ধ হইয়া পশু হইলেন, জীব আবার পাশমুক্ত হইয়া যজ্ঞ করিয়া শিবত্ব লাভ করিবে। শিবত্ব লাভের জন্য কল্যাণের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে পারিলেই আসক্তি বন্ধন ঘুচিয়া পশুত্ব দূর হয়। প্রথম যজ্ঞকালে ভগবান নিজে ইহা দ্বারা অসীম সসীম হইলেন, অবিভক্ত বিভক্ত হইলেন. নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ পশুরূপে জীবরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না, তাই তিনি ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজেই হোতা হব্য হবন—ভোক্তা ভোগ্য ভোজন, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে প্রকাশ পাইলেন। পশুপতি পশু না সাজিলে যে লীলা চলেনা। তবে তাঁহার এই পাশগ্রহণ হইল আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু লীলা আস্বাদনের জন্য। পিতা যেন নিজে স্বরূপ আস্বাদন করিবার জন্য পুত্র সাজিলেন, পুত্ররূপে জীবরূপে আপনাকে দান করিলেন, জীবও আবার নিজের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া নিজের পশুত্ব ঘুচাইয়া শিবত্ব লাভ করেন। এই লীলাতত্ত্বের ত্যাগ রহস্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া শিষ্যগণ ভিতরের ভাবটা ছাড়িয়া দিয়া একটা খোসা লইয়া টানা-টানি আরম্ভ করিল। ফলে এই আত্মোৎসর্গ হিংসাত্মক বলিতে পরিণত হইল। প্রথমে আরম্ভ হইল নিজের আত্মদানের পরিবর্ত্তে অন্যকে দান করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা। গুরু পুরোহিতের দ্বারা

পূজা নিষ্পন্ন করা। ঘুষ দিয়া পাপ ক্ষালনের দ্বারা আশীর্ব্বাদ ও মাদুলির প্রভাবে কর্ম্মফলের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া। নিজে সাধন দ্বারা ত্যাগের দ্বারা সংযমের দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া, পশুত্ব ঘুচাইয়া মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে দেখা দিল বনের পশু বলি দিয়া মুক্তিলাভের প্রথা। যজ্ঞের প্রধান কথা, পশুত্ব ঘুচাইতে হইবে নিজের। এইজন্য কামনা বাসনা আসক্তি সুখস্পৃহা প্রতিষ্ঠার মোহ আদি যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য আছে যাহা আমাকে রজ্জুর ন্যায় সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে অষ্ট পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। নিজকে বদ্ধ জানিয়া সেই বন্ধন দূর করিতে হইবে। ভগবল্লাভের জন্য পূর্ণ আত্মনিবেদনের জন্য আমার যাহা কিছু সব ভগবানকে দিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই ভগবানকে দেওযা অর্থই সকলকে দেওয়া, বিশ্বহিতে সর্ব্বস্ব দান করা। আত্মাকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা। কাজটা অতি কঠিন অথচ ইহার ফলের লোভটাও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণত্বহীন হইয়াও আমরা ব্রাহ্মণের আধিপত্যটা বজায় রাখিতে সচেষ্ট। ফলে দেখা দিল কপটতা — আরম্ভ হইল প্রতিনিধি প্রথা। যাহার পরিণাম এই পশুবলি ও নরবলি। এই কলুষিত ভাব দূর করিবার জন্য আবার প্রতিনিধি ক্রমে দেখা দিয়াছে পিষ্টক বা হবিঃপ্রদান প্রথা। এই পিষ্টক যজমানেরই প্রতীক। খৃষ্ট সমাজেও যীশুর প্রতীক দাঁড়াইয়াছে রুটি ও মদে। এই সব প্রতীকের আবরণের ভিতর হইতে আমাদের সারতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইবে। তাহার পরে আমাদের পশুত্ব ঘুচাইয়া ভিতরকার পশুভাবকে বলি দিয়া ভগবৎ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আবার শিবত্ব লাভ করিতে হইবে। জ্ঞান-যজ্ঞে সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই যজ্ঞীয় পশু।

—ঃ০ঃ—

আহুতিতত্ত্ব

আ- হ্বে ধাতু নিষ্পন্ন আহ্বান শব্দের অর্থ আহুতি ভগবানকে ভগবৎ শক্তিকে দেহে দেহের প্রতি তত্ত্বে প্রতি অবয়বে মনে প্রাণে বুদ্ধিতে চিত্তে এবং আত্মায় আহ্বান করিতে হইবে। আহ্বান করা হয় যে দূরে থাকে তাহাকে—যে সর্ব্বব্যাপী তাহাকে আবার আহ্বান করিব কেন? তাই আহ্বান বা আবাহন শব্দের অর্থই তিনি যে সব তত্ত্বে আছেন—তিনিই যে সব তত্ত্ব হইয়া বসিযাছেন তাহার উপলব্ধি লাভ করা। তাই আহ্বান শব্দের অর্থ সবই যে তিনি, তিনিই যে সব তত্ত্বে ব্যষ্টি সমষ্টিভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা -এক কথায় সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তারপরে আ—হু ধাতু নিষ্পন্ন আহুতি * শব্দের অর্থ দিযে দেওয়া, দান করা, নিবেদন করা। প্রথমতঃ হবনীয় দ্রব্যগুলিকে পূজার উপকরণ-গুলিকে শুদ্ধ করিয়া ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত করিযা তাঁহার গ্রহণযোগ্য করিযা তাহার মধ্যে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিযা অর্থাৎ তিনি নিজেই যে এই সব রূপে এই সব হইয়া আসিযাছেন তাহা উপলব্ধি করা। তারপরে ক্রমে ক্রমে সাধকের মনে হয় যাহা আমার নিজের তাহাই কাহাকেও দিতে পারা যায়। এইসব হবনীয় দ্রব্য কি আমার নিজের? তখন অনুভবে আসিবে যে এই সব কিছুই আমার নিজের নয়—এই সবই যে মায়ের, এই সব আমি সৃষ্টি করি নাই, এইসব কি তাহাও আমি জানি না—যাবার দিনে এই সব সঙ্গে নিয়ে যেতেও পারিব না। এইরূপ চিন্তার

* আহুতি একপ্রকার আহুতি--যাহা দ্বারা দেবতারা আহূত হন

পরিণামে সাধক অনুভব করিতে পারেন যে, আমার এই দেহ, দেহের সব তত্ত্ব, আত্মীয়স্বজন জগতের সব পদার্থই—আমার শ্রীভগবানের, ইহার কিছুই আমার নিজের নয়—"সর্ব্বং ত্বদীয়ং ইতি মে প্রিয়মেব সর্ব্বম্, ত্বৎ-প্রীতয়ে সততমেব নিয়োজয়ানি"—ইহার ফলে নির্ম্মমভাব আসিয়া থাকে। আমার এই দেওয়াটা শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করার ন্যায়। "তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার হে"—"প্রতীচ্ছ হে স্বস্য ধনং স্বয়ং ত্বং কিঞ্চিৎ নিজস্বং ন হি বিদ্যতে মে যদ্দীয়তে তচ্চরণে মুকুন্দ"। ইহার পরে সাধক এই দেওয়া নেওয়া আদি সবই যে মায়ের খেলা, তিনি যে শুধু দ্রষ্টামাত্র তাহা বুঝিয়া মায়ের লীলায় সহায় হন। তখন সাধকের ভিতর হইতে ছিন্নমস্তা তত্ত্বের স্ফুরণ হয়—মা যে কিভাবে ভোক্তা-ভোজ্য-ভোজন, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, কর্ত্তা-কর্ম্ম-করণ আদি ত্রিপুটীরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া লীলারত সে তত্ত্ব সাধক তখন বুঝিতে পারেন। ভগবানের এই যে জগজ্জীবরূপে পরিণাম বা বিবর্ত্তন এই সবই যে মায়ের খেলা—এখানে আমার যে অহন্তা মমতা রাখিবার আর যো নাই। তখন সাধক হবনের দ্বারা আত্মনিবেদনের ফলে পরম শান্তিপদের ব্রাহ্মীস্থিতি-লাভের যোগ্য হন। আসল পূজা মা-ই যে করিতেছেন, আমাদের পূজা যে তাহার নকলমাত্র, আমাদের কর্ম্মের বিকৃতি দূর করিয়া স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মায়ের লীলায় যে যোগদান করিতে হইবে,—এ তত্ত্ব তখন বুঝিতে পারা যাইবে। আহুতি দেওয়া হয় আমাদের স্বামিত্ববোধকে, কর্ত্তৃত্ববোধকে, ফলে আমরা হইয়া পড়ি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, লাভ হয় পরম শান্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তি।

—ঃ০ঃ—

পূর্ণাহুতি

যজ্ঞের অর্পণ ক্রিয়ায় আত্মনিবেদনের, নিজকে পূর্ণভাবে ভগবানে দিয়া দেওয়ার, দিতে কিছু বাকী না রাখার, দেওয়াটা পূর্ণস্বরূপের নিকট পূর্ণভাবে সাধিত করার নাম পূর্ণাহুতি। আহুতির দ্রব্যগুলি পূর্ণ হওয়া চাই—কিছুই যেন বাকী না থাকে। বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্। তন্ত্রের ৩৫টি তত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশত্তম শিবে আহুত হওয়া চাই। দেওয়ার পাত্রটি পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ সারতত্ত্ব হওয়া চাই, আহুত দ্রব্য যে সব প্রতিবিম্ব অতিক্রম করিয়া সব আবরণ দেবতাদের ভিতর দিয়া গিয়া মূল বিম্বে পরম দেবতায় পূর্ণ ব্রহ্মের নিকট পৌঁছিয়াছে এই তত্ত্ব পূর্ণভাবে অনুভূত হওয়া চাই। যে আহুতি দিতেছে তাহার পূর্ণত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ বিকশিত হওয়া চাই—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটীকে সার্থক করিয়া তোলা চাই।

আমরা বাহিরের আলো ততটা দেখিব, বাহিরে জ্ঞানের খেলা প্রেমের লীলা ততটা অনুভব করিব যতটা আমাদের ভিতরকার চোখের জ্যোতি, বুদ্ধির জ্ঞান, চিত্তের প্রেম বিকশিত হইবে। সুতরাং আমরা পূর্ণকে তখনই বুঝিতে পারিব যখন আমরা নিজে পূণত্ব লাভ করিব—এজন্য চাই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত আদি তত্ত্বগুলিকে শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া ভগবৎ-শক্তি ভগবদ্‌জ্ঞান ভগবদ্‌ভাবদ্বারা পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া পূর্ণত্বের পূর্ণভাবে ধারণযোগ্যতা লাভ। মনে রাখিতে হইবে যে ভগবানের সখা অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিকট হইতে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াও

ভগবানের পূর্ণস্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া পূর্ণত্বলাভ করিলেই তখন বুঝিতে পারিব যে পূর্ণত্বের অর্থই সেই আসল পূর্ণের স্বরূপ উপলব্ধি। তাঁহার পূণত্ব লইয়াই আমাদের পূর্ণত্ব—পূর্ণত্ব এক ছাড়া দুই হইতে পারে না। আমাদের পূর্ণত্ব যে তাঁরই পূর্ণত্ব সে যে আপনা হইতেই অর্পিত আহুত হইয়া রহিয়াছে এ তত্ত্ব তখন অনুভবে আসিবে।

পূর্ণত্বলাভের পর আমাদের চ্ছা তাঁহার ইইচ্ছা হইতে আর পৃথক্ থাকিতে পারে না "তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।" প্রতিবিম্ব যে তখন শুদ্ধ শান্ত হইয়া বিম্বে গিয়া লীন হইয়া বসিযাছে। জীবাত্মা (God the Son) যে তখন পরমাত্মায় (God the Father)-এ লীন—ত্বং-পদার্থ যে তখন তৎপদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া বসিয়াছে। পূর্ণাহুতির সময় যজমান যে নিজকে পূর্ণ করিয়া নিজের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের সমস্ত তত্ত্বগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া পূর্ণত্বের গ্রহণ-যোগ্য করিয়া পূর্ণের সহিত পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যান। তাহার আর যে কোনও রূপ পৃথক্ অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে না। তখন তাহার যে ষোল আনা অর্পিত হইয়া গিয়াছে—নিজের কর্ম্মফল বলিয়া আর কিছু বাকী থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সর্ব্বস্ব অর্পণ এখন ষোল আনা পয়সা দানে, কর্ম্মফলার্পণ একটা যে কোন বৃক্ষের ফল ত্যাগ করায় পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণাহুতির ফলে তখন যজমান যে ভগবানের বিশ্বযজ্ঞে পূর্ণরূপে সহায় হইয়া পড়েন—তাহার ভিতর দিয়া তখন ভগবদিচ্ছা পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করে। 'পূর্ণা ভবত্বনুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা' তখন সার্থক হয়।

মনে রাখিতে হইবে পূর্ণাহুতির সময় আমাদের আহুত দ্রব্য পঞ্চাগ্নির

ভিতর দিয়া শুদ্ধ হইতে হইতে সুধায় পরিণত হইয়া গিয়া পুরুষোত্তমে অর্পিত হইয়া যায়। বিশ্ব পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। অগ্নিকে এবং অগ্নি দ্বারা শোধিত সোমকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পাঁচটি অগ্নিতে—আহার্য্য, রক্ত, বীর্য্য, ওজঃ ও অমৃত এই পাঁচটিকে যথাক্রমে আহুতি দেওয়ার ফলে অবশিষ্ট রহিয়াছে একমাত্র আনন্দ। এই যজ্ঞাবশেষ আনন্দ দ্বারা আমাদের সব তত্ত্বগুলি পূর্ণরূপে আপ্যায়িত হইয়া যায়। তখন আমাদের সব অবয়ব পূর্ণ পরিণত, সব ইন্দ্রিয় পূর্ণ শক্তিযুক্ত, চিত্ত পূর্ণরূপে সমাহিত ভগবানের সহিত যুক্ত হয়। তখনই আমাদের সব তত্ত্বের ভিতর দিয়া ভগবদিচ্ছা পূর্ণরূপে সফল হইয়া যাইতে আরম্ভ করে। আমাদের ইচ্ছা বলিয়া তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ এই আনন্দকেও পরম প্রিয়তমে প্রদান করিয়া সেই চরম অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। তখনই আহুতিক্রিয়া পূর্ণতালাভ করিবে। সাধক তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ দ্রষ্টা হয়—ভগবল্লীলাদর্শনে সে থাকে পূর্ণভাবে বিভোর। এই চরম সোম পরম ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়া চরম সারতত্ত্বকে পরম শ্রেয়াস্পদকেও আহুতি দিবে। সুতরাং পূর্ণাহুতির দ্বারা আমরা পূর্ণত্ব লাভ করি। তখন সসীম গিয়া অসীমে, ত্বং তৎএ, ইদং অহংএ পর্য্যবসিত হয়। আমরা পূর্ণাহন্তা অবস্থা লাভ করি। অর্পণক্রিয়া দ্বারা যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব শেষ করিয়া অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বে গিয়া পৌঁছাইতে হইবে। তখনই দেওয়া-নেওয়া শেষ হইয়া যাইবে। দিব্য অগ্নিপঞ্চকের ক্রিয়া শেষ হইলে অগ্নিসমূহ আত্মাতে পূর্ণরূপে আরোপিত হয়। তখন যজ্ঞ গিয়া যজ্ঞপতিতে লীন হয়। তখন আত্মভাব অনাত্ম সত্তা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিজ স্বরূপকে আশ্রয় করে। 'ওঁ যজ্ঞঃ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাহা' হয় মন্ত্র। আস্বাদিত হয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব।

ইড়া, সোমতত্ত্ব ও হবিঃশেষভক্ষণ

ইড়া অদিতি সরস্বতী ভারতী (ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি)। ইহারা তিনে এক, একে তিন। আবার সরস্বতী নদীও বটে, যাহার স্রোত ফিরাইয়া মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলা করিয়া একদিন কবষ ঋষির পিপাসা দূর করা হইয়াছিল।

মনুকন্যার নামও ইড়া—যাহা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। ইড়া আবার বাগ্দেবী (Word of God) **শব্দব্রহ্মতত্ত্ব**—যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া সাধিত হয়। এ তত্ত্ব খৃষ্টানগণও স্বীকার করেন। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবীও ইড়ারই মূর্ত্তি। ইড়াকে (বাগ্দেবীকে) ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া দেবময় হওয়া যায়—সকল কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই ইড়া **খৃষ্টমতে যীশুর রক্তমাংস** বা স্বয়ং যীশু। সুতরাং দেখিতে পাই, ইড়া স্বয়ং যজমান, ইড়া পশু, বাগ্দেবতা, শব্দব্রহ্ম (Word of God), খৃষ্টানের যীশু। আবার এই ইড়াই যজমান পশুর **প্রতীক, পুরোডাশ,** যীশুর মাংস। "যজমানো বৈ পুরোডাশঃ", "পশবঃ পুরুষাঃ", "পাশো বৈ ইড়া"। ইনিই আবার **তন্ত্রের মাতৃকা**—অবিভক্তের বিভক্তি, অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব, পশুপতির পশুত্ব। ইড়ার আবাহন মন্ত্রে বলা হয়, "ইড়া তুমি বাগ্দেবী, তুমি ভারতী, তুমি এস, সকলের ভিতরে আবির্ভূত হও, সকলের ভিতর দিয়া আমরা তোমাকে দর্শন করি।......এই ইড়া তোমারই প্রতীক, **ইহাকে ভক্ষণ** করিয়া সকলের ভিতরে ইহাকে দর্শন করিয়া আমরা

সকলে ঐক্যবদ্ধ হইব।" "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্" ইত্যাদি। ইহার আবাহন মন্ত্র হইতে জানা যায়, ইনি পাপ নাশ করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়া অমৃতদানে সমর্থা। বৈদিক যজ্ঞে **ইড়া যজ্ঞাবশেষ,** যজ্ঞোৎপাদিত সারতত্ত্ব—**ব্রহ্মজ্ঞান**—যাহা ভক্ষণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ইড়া পুরুষের যজমানের প্রতীক—যজ্ঞীয় পুড়োডাশ মন্ত্রপূত হইয়া ভগবানে ভগবৎ-তত্ত্বে পরিণত হয়, যাহার ভক্ষণে মানুষ দেবত্ব অমৃতত্ব লাভ করে। বাইবেলে এই **ইড়া ও সোম যীশুর মাংস ও রক্তে পরিণত** হয়—যাহার **ভক্ষণে** সাধক **দেবত্ব অমৃতত্ব লাভ** করে। যীশুর মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে রুটি ভাঙ্গিবার সময় (Breaking of the bread) বলিয়াছিলেন,—"This is my body which is broken for many for remission of sins... I am the bread of life. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Except ye eat the flesh of the son of man, drink his blood ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life." খৃষ্টধর্ম্মের এই দেবতাভক্ষণ (Eucharistic sacrifice)-এর সঙ্গে বেদের ইড়া সোমাত্মক যজ্ঞশেষ ভক্ষণের সাদৃশ্য চিন্তনীয়। যীশুর মাংস ও রক্ত ভক্ষণই যে যীশুর মতন দেহ ও মন প্রাণ লাভ করা। **ইড়া ও সোমপান,** পূজায় প্রসাদ **ভক্ষণ, যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞতত্ত্বকে আত্মস্থ** করা, তাহাকে মনে রাখা, তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া **তন্ময়তা লাভ করা**—এই সব একই কথা। ইহারই সহিত তুলনীয় যীশুকে খাওয়া বা রামপ্রসাদের "এবার কালী তোমায় খাব" প্রভৃতি।

সোমপান ঃ- **সোম** সুধা, সহস্রার বিগলিত সুধা, **গঙ্গা**, ব্রহ্ম-জ্ঞান,—**যাহা সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করে।** এই সোমরূপ অমৃত **বা** শোধিত সুরা প্রায় সকল দেশেই সাধনায় ব্যবহৃত হইত। **খৃষ্টযজ্ঞে ইহা মদ্য** (সুরা) —**যীশুর রক্তের প্রতীক।** মন্ত্রপূত **হইয়া ইহা** যীশুর রক্তে পরিণত হইত এবং ইহা **পান করিয়া দেবত্ব লাভ** করা হইত। য়ীহুদী দেবতা জেহোবাকে তৃপ্ত করিবার জন্য পশু-রক্ত **দান** করা হইত। সোম আনয়নের মন্ত্র ও বিধি হইতে মনে হয়, **ইহা** সহস্রার বিগলিত সুধা বা সোমধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়—("সোমধারা ক্ষরেৎ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে")—যাহা পান করিয়া সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন। তান্ত্রিকগণ হংসবতী মন্ত্র পাঠ করিয়া আজও প্রতীক সুরাকে সোমে (অমৃতে) পরিণত করিয়া থাকেন। "দেবকৃতস্য এনসো অবজনমসি, পিতৃকৃতস্য এনস ইব জনমসি", "অপাম সোমং অমৃতা অভূম আজগ্ম জোতিরবিদাম দেবান্।" সোম পান দ্বারা আমাদের **সব পাপ** দূর হইয়াছে, আমরা অমর হইয়াছি, আমরা জ্যোতির্ম্ময়ধামে **প্রবেশ লাভ** করিয়াছি, দেবতাদেরে জানিয়াছি। এই সব সোম পান মন্ত্র হইতেও জানা যায় যে সোম তাত্ত্বিক ভাবে অমৃত বা ব্যবহারিক ভাবে অমৃতকল্প কোন পানীয় দ্রব্য। সোমপায়ীকে বাগ্দেবী আসিয়া অমৃতত্ব দান **করেন**—সোম পান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রতীক অবলম্বনে আরাধনা প্রায সব দেশেই সুপরিচিত। এই অমৃতের স্থানে কালে সুরাবিশেষ আসিযা উপস্থিত হইল। বেদ ও **আবেস্তার** মতে সোম এক প্রকার ঔষধবিশেষ যাহার নামান্তর মধু,—**যাহাতে** মাদকতা-শক্তি জন্মায়, বাক্যে স্ফূর্ত্তি দান করে ও শরীরে বল বিধান করে। যাহা ব্যাধি দূর করে, তাহাই আবার অমৃতত্ব দান করে।

অন্যত্র আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সোম স্বর্গের একজন রাজা, “সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষয়ামি।” এই স্বর্গরাজ সোমকে, স্বর্গীয় সুধাকে, ভক্ষণ করিবার বিধানও দৃষ্ট হয়। সোমযাগ হইতেও জানা যায়, সোম একপ্রকার পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্। মহাদেব ইহাকে মস্তকে ধারণ করেন। অবশ্য মহাদেবের সোমকে মস্তকে ধারণ করিবার মধ্যে আমরা সুন্দর একটি দার্শনিক গূঢ় রহস্যও দেখিতে পাই। (মহাদেবের মস্তকে গঙ্গার,—সোমধারার রহস্য চিন্তনীয়)। সোমযাগে একসময় মদও খাওয়া হইত। মদ্যপায়ী মদোন্মত্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মারামারি, হত্যাকাণ্ড দেখিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়া তাহার স্থানে দুগ্ধ বা বটের রস পানেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, একটা তাত্ত্বিক ও অপরটা প্রতীক, ভাবনাত্মক ও প্রতীকরূপ রহস্য, অন্নাদ ও অন্নের, প্রাণ ও রয়ির আভাস। সবই যে অগ্নীষোমাত্মক Matter এবং Spirit—মূলে আদি দম্পতির, অহং এবং ইদং এর, শিব-শক্তির, রাধা-কৃষ্ণের যুগল লীলারহস্য।

হবিঃশেষভক্ষণঃ—যজ্ঞীয় পুড়োডাশ ভক্ষণ যজ্ঞের অঙ্গ-বিশেষ—যজ্ঞে যজমানকে তাঁহার প্রিয়জনকে প্রিয় দ্রব্যকে ভগবানে অর্পণ করিয়া, সব মলিনতা দূর করিয়া—সব তত্ত্বকে সব পদার্থকে ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত করিয়া—সকলে মিলিয়া তাহা ভক্ষণ। প্রথমতঃ সব কিছু শুদ্ধ করিয়া ভগবানের গ্রহণযোগ্য করিয়া তাহা ভগবানকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার উপর নিজের স্বামিত্ব ও কর্তৃত্ববোধ দূর করিয়া সব কিছুই ভগবানের জানিয়া ভগবৎ-জীবের সেবায় লাগাইতে হইবে। জীবের মধ্যে আমিও একজন, শুধু সেইভাবে যথা প্রয়োজনে সেই তত্ত্বকে সেই দ্রব্যকে নিজের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। যজ্ঞ দ্বারা যজমানের

আত্মা, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, আত্মীয় এবং সব দ্রব্যাদি ভগবানের হইয়া যায়। তখন সব তাঁহার জানিয়া সবকে সমানভাবে ভালবাসিতে হইবে, সকলকে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধক কাজে তাঁহার প্রিয়তম জীবের সেবায় লাগাইতে হইবে। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের পরে আত্মনিবেদনের ফলে সব ভগবানের হইয়া যায়—তখন গঙ্গাজল দিয়া গঙ্গাপূজা করিতে হয়—ভগবানের সেই সব বস্তু শুধু ভগবৎসেবায় লাগাইতে হয়। স্বার্থের প্রলোভনের বাসনা-কামনা-তৃপ্তির জন্য কিছু লাগাইবার আর অধিকার থাকে না।

যজ্ঞে অর্পিত দ্রব্যের মধ্যে যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য (যাহা হইতে জীব-সৃষ্ট কামনা-বাসনা-সংস্কারের ভাব দূর হইয়া গিয়াছে) সকলের ভিতর বিতরণ করিয়া যজ্ঞের ফল সকলের ভোগে লাগাইয়া দিয়া সকলের সঙ্গে নিজেও ভোগ করিতে হইবে। যজমানের উদ্দেশ্য সকলে মিলিয়া সফল করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজ দেশ ও জগতের মধ্যে সব ভেদভাব দূর করিয়া জগতে একটা একতা স্থাপনে মৈত্রীভাব আনয়নে, জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে, ব্রতী হইতে হইবে। সমাজে এখন কেবল কতগুলি ভক্ষ্য দ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া সেই প্রসাদ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করা মাত্র রহিয়া গিয়াছে। পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষকে সব তত্ত্বে, সব দেবতার ভিতরে দর্শন করিয়া সব তত্ত্বকে পুরুষভাবে পরিভাবিত করিয়া সব তত্ত্বে পুরুষকে দর্শন করিয়া সব তত্ত্বের পূর্ণ তৃপ্তি বিধান করিয়া সেই জ্ঞানামৃত সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করা হইত। যজ্ঞে চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করার ফলে সকলকে যে আত্মার বিভূতিরূপে দর্শন করা হয় তাহাই বস্তুতঃ যজ্ঞের শেষভাগ ও সারতত্ত্ব অর্থাৎ অমৃত (ইড়া)। সকলে মিলিয়া এই অমৃতই গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের সকলের দেহ

প্রাণ, মনকে এইরূপ তদ্ভাবে পরিভাবিত করিতে হইবে যাহার ফলে সকলে আমাদের কথা, ভাব ও কাজ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে আমরা সকলে মিলিয়া এক হইয়াছি—অদ্বৈততত্ত্ব আস্বাদন করিয়াছি। রামপ্রসাদের মত মাকে খাইয়া, মাকে হজম করিয়া মা-ময় হইয়া মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। খৃষ্টান সাধকদের মতে যীশুকে খাইয়া যীশুময় হইয়া যীশুর প্রিয় কার্য্য সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। বেদপন্থীরাও দেবতাকে খাইয়া দেহ মনকে দেবভাবে পরিভাবিত করিয়া, দেবময় হইয়া যাইতেন। হবিঃ যে দেবতারই প্রতীক। যজ্ঞাবশিষ্ট পূর্ণাহুতির ফল, সমস্ত যজ্ঞফল, যজ্ঞলব্ধ সমস্ত ভগবৎ-শক্তি, ভগবদ্ভাব সকলে মিলিয়া ভোগ করিয়া সমাজের, দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে, সকলকে একসূত্রে বদ্ধ করিতে হইবে। এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে হইবে। ইড়া ও সোম ভক্ষণ খৃষ্টানদের দেবতা (যীশুর মাংস ও রক্ত) ভক্ষণের ন্যায়। ইহার উদ্দেশ্য বাগ্দেবতাকে আত্মস্থ করিয়া তাহাব সহিত সাযুজ্য স্থাপন করা দেবতাময় হইয়া যাওয়া। ইহাই অমৃত ভোজন—এই অমৃত ভোজনেই যজ্ঞের সার্থকতা।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম আজগ্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্" আমরা যজ্ঞাবশিষ্ট সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি জ্যোতিঃলাভ করিয়াছি দেবগণকে জানিয়াছি, পাইয়াছি দেবময় হইয়া গিয়াছি। ইহা হবিঃ ও সোম পানের মন্ত্র। প্রায় সকল দেশেই যজ্ঞের এবং যজ্ঞশেষ ভক্ষণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অনুষ্ঠানে একটু পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের মিথ্র (মিত্র) পূজার রুটি ও সোমরস (অভাবে আঙ্গুররস) খৃষ্ট সমাজের রুটি ও মদ, হিন্দুর ইড়া ও সোম অর্পণের

মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেদের সময়ও এদেশে যজমান ও ৪ জন ঋত্বিক মিলিয়া ইড়া ও সোম (অভাবে দুগ্ধ) পান করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞের পুড়োডাশ ভঙ্গের সহিত খৃষ্টের রুটিভঙ্গের (breaking of the bread)-এর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহা যীশুর ক্লেশস্বীকার ও জীবনদানের প্রতীক। বৈদিক ঋষিগণ যেমন পুরোডাশ ও সোমে দেবতার আহ্বান করিতেন খৃষ্টভক্তগণও রুটিভঙ্গের ব্যাপারে (consecration & invocation) অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আসল কথা যজ্ঞশেষ ভক্ষণ করিয়া যজ্ঞার্থে নিজ জীবন, প্রিয়জন ও প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করিয়া জীবসেবার ও পরে শুধু দেহ রক্ষার জন্য যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া অমৃতত্ব লাভের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যজমান পশুর শুদ্ধ হইয়া আত্মনিবেদন করিয়া দেবতার সহিত একত্ব লাভ করা যীশুর স্বর্গীয় পিতার সহিত মিলিত হইবার অনুরূপ। হবিঃশেষভক্ষণ একটা প্রতীক মাত্র (Symbol)। ইহা বলিয়া দেয়, সমাজে আমাদের কিভাবে চলিতে হইবে। কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। উপরে দেবতাদের ভিতরে একত্ব অনুভব, এবং নীচে জীবের ভিতরে একতা আনয়ন করিয়া অদ্বৈতানুভূতি লাভের চেষ্টা করা হইত। আসল কথা আমরা যে সকলে ভগবানের সন্তান পরস্পর ভাই ভাই পরম আত্মীয় এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া অহংকারের বশে অজ্ঞানতার প্রভাবে একটা ভেদভাব এবং তজ্জনিত অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি। যজ্ঞের দ্বারা প্রথমে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করা হয়। তাহার পরে আমাদের সব তত্ত্বকে সব যন্ত্রগুলিকে ভগবদ্‌ভাব দ্বারা, ভগবৎ-শক্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তোলার ফলে আমাদের তখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

তখন সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন সব জীবকে ভগবৎসন্তান ভগবদ্‌বিভূতিরূপে অনুভব করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ফলে আমরা জীবের সেবা দ্বারা শিবের সেবা করিতে ভগবল্লীলায় যোগদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়ি। তখন যজ্ঞের ফল সকলে মিলিয়া এমনভাবে ভোগ করা হয় যাহাতে সকলের কল্যাণসাধনের ভিতর দিয়া আমাদের নিজ নিজ কল্যাণ আপনি সুসাধিত হইয়া যায়। যজ্ঞের ভাবে তখন আমরা এমন সুন্দর ভাবে পরিভাবিত হইয়া পড়ি যে আমাদের তখন কথা, ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া যজ্ঞের মহিমা ঘোষিত হইতে থাকিবে, যজ্ঞের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যজ্ঞের দ্বারা আমরা ভগবানকে পাইয়া তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব— তাঁহার লীলার সহায় হইয়া পড়িব। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোগ করিয়া আমরা সব পাপ, সব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দলাভের অধিকারী হইব।

হবিঃশেষ—যজ্ঞের সারভাগ যজ্ঞপুরুষ ও যজ্ঞতত্ত্ব ; যজ্ঞের ফল যজ্ঞের পূজার সমস্ত ফল উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব। ভক্ষণ—আত্মস্থকরণ, ধরিয়া রাখা, নিজের সব তত্ত্বকে তদ্ভাবে পরিভাবিত করা, যজ্ঞপুরুষের সঙ্গে তন্ময়তা লাভ করা। সকল দেশেই এই দেবতাকে খাওয়ার প্রথা আছে। কালীকে খাওয়া, যীশুকে খাওয়া প্রসিদ্ধ।

আমার সব কর্ম্মের, আমার সব জ্ঞানের, আমার সব অনুভূতির সার অংশ সকল জীবের সেবায় লাগাইয়া, সকল জীবকে দান করিয়া আমিও একটি জীব বলিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ আমার নিজের সেবায়, নিজের জীবনধারণে লাগাইতে হইবে।

—:o:—

যজ্ঞ

(মন্ত্রভাগ)

১। **বিষ্ণুস্মরণ :—**

যজ্ঞাদি যাবৎ শুভকার্য্যানুষ্ঠানের প্রথম কার্য বিষ্ণুস্মরণ। ইহা চিত্তশুদ্ধির মন্ত্র। "বেবেষ্টি (বিষ্ ব্যাপ্তৌ) ব্যাপ্নোতি বিশ্বম্" ইতি বিষ্ণুঃ। যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত তাঁহারই নাম বিষ্ণু। অথবা "বিষ্ণাতি বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাৎ" ইতি বিষ্ণুঃ। যিনি মায়াপসারণের দ্বারা ভক্তগণকে সংসার হইতে বিযুক্ত করিয়া মুক্ত করেন তিনিই বিষ্ণু। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সকল জীবের পরমাত্মীয় সকলের মা-বাপ। জীবজগৎ তাঁহার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ—অর্থাৎ জীব পোষাকপরা শিব। সুতরাং জীবের সেবাই শিবের সেবা, জীবকে কষ্ট দিলে শিবকেই কষ্ট দেওয়া হয়। তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার খারাপ ব্যাবহার সহ্য করিবেন না—সকলেই আমার মা, বাপ, ভাই, বোন—চিত্তে এই ভাব জাগ্রত থাকিলে আর যে কাহারও প্রতি খারাপ ভাব পোষণ করা যায় না। চিত্ত আপনা হইতেই শুদ্ধ হইয়া যায়, তাই বিষ্ণুস্মরণ চিত্তশুদ্ধির সহায়।

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ॥ ১ ॥

ইহার সাধনে ওঁ উচ্চারণ করিয়া মূলাধার হইতে অকার উকার মকার ভেদ করিয়া চিত্তকে অর্দ্ধমাত্রার কাছে সহস্রারে লইয়া যাইতে

হইবে। সেখানে গিযা ভগবানেব বাক্য-মনের অতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন জ্যোতির্ময স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পরে চিত্তকে আস্তে আস্তে সব চক্রে সব তত্ত্বে নামাইয়া লইয়া সব তত্ত্বকে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত দেখিয়া সমস্ত জীবজগৎকে 'ঈশাবাস্য' সৎ-রূপে উপলব্ধি কবিতে হইবে। তখন এই বিশ্ব যে ভগবানেরই প্রকাশ, তাঁহারই বিভূতি তাহা সুন্দররূপে অনুভবে আসিবে। তখন সর্ব্বত্র ভগবানের দর্শন ধ্যান ও উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। তখন সবই ভগবান, সর্ব্বত্রই ভগবান্—এই উপলব্ধি লইয়া ওঁবিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ উচ্চাবণ করিতে হইবে। স্থূলে বিষ্ণু, সূক্ষ্মে বিষ্ণু, কারণে বিষ্ণু সর্ব্বত্রই তখন বিষ্ণুকে উপলব্ধি করা যাইবে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২ ॥

সূবয়ঃ (জ্ঞানিগণ) তদ্বিষ্ণোঃ (সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর) পরমং পদং (পরম ধাম) দিবি (আকাশে) আততং (বিস্তৃত, বিস্ফারিত) চক্ষুঃ ইব (চক্ষুর ন্যায়) সদা পশ্যন্তি (সর্ব্বদাই দেখিতেছেন।) এই শ্লোকটি ভগবানের অস্তিত্বের এবং সর্ব্বব্যাপকত্বের সর্ব্ব কারকত্বের প্রমাণ। ভগবান্ বাক্য মনের অতীত। প্রমাণাদি মনো-ধর্ম্মের দ্বারা মনাতীতকে উপলব্ধি করা যায় না। হৃদা মনীষা মনসাভি-ক্৯প্তঃ। তিনি যে বিশুদ্ধ চিত্তের অনুভবগম্য। জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধ শান্ত সত্যবাদী জীবহিতব্রত ঋষিদের বচন এবং অনুভূতি হেতুবাদ দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আপাততঃ অশুদ্ধরূপে প্রতীয়মান ঋষি-বাক্যকে আমরা অশুদ্ধ না বলিয়া আর্ষপ্রয়োগ বলি ; কারণ ঋষিবাক্যে

শঙ্কাও অসঙ্গত। তাঁহারা যখন বলেন ভগবান আছেন, তাঁহাকে দেখিতেছি তখন আব তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলেই ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর হইয়া থাকে। তাঁহারা ভগবানকে বিশ্বরূপে সর্ব্বতঃ পাণিপাদ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখাদিরূপে, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং, সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রঃ বা (শুচি বা অশুচি) সর্ব্বাবস্থাং গতঃ অপি বা (যে কোন অবস্থায় স্থিত হইয়াও) যঃ (যিনি) পুণ্ডরীকাক্ষং (সেই কমললোচন, দেহের সবতত্ত্বে অবস্থিত ভগবানকে) স্মরেৎ (স্মরণ করেন) [তিনি] সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (অন্তরে এবং বাহিরে) শুচিঃ (শুচি হইয়া থাকেন)। তখন সর্ব্বত্র বিষ্ণু ভগবানের স্মরণ ও উপলব্ধির ফলে সাধকের ভিতর বাহির যে শুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌।
আবিরাবীর্ম্ম এধি ॥ ৪ ॥ (৩ বার)

মে বাক্‌ (আমার বাক্য) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনেতে প্রতিষ্ঠিত হউক) আবিঃ আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ) মে এধি (আমাতে অধিষ্ঠিত হও)।

ঋষিদের কর্ত্তৃত্বাভিমান বা প্রতিষ্ঠার মোহ ছিল না। তাঁহারা

ছিলেন ভগবানের হাতের এক একটি যন্ত্র। ভগবানের তালে তালে নাচিয়া ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাঁহাদের জীবনের চরম সার্থকতা। তাই সকল শুভ কাজের আরম্ভে তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন 'হে ভগবান্, তুমি আমার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া আমার মনটিকে সম্পুর্ণরূপে দখল করিয়া লও, আমার বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কবিযা দাও, তুমি আমার মুখ দিয়া কথা বল, আমার হাত দিয়া কাজ কবিতে থাক, তাহা হইলে আমার স্বার্থপবতা, কর্ত্ত্বাভিমান, প্রতিষ্ঠাব মোহ আর তোমাব ইচ্ছা এবং তোমার কাজকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারিবে না। আমাব মুখ দিয়া তুমিই কথা বল আমার হাত দিয়া তুমিই কার্য্য করিতে থাক।

২। সূর্য্যার্ঘ্য ঃ—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ তুমি তেজসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, বিষ্ণুতেজের আধার জগৎকর্ত্তা, পবিত্র ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। এই অর্ঘ্য শ্রীসূর্য্যদেবকে প্রদান করিলাম।

ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মা) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ভাস্বতে (দীপ্তিমানকে) বিষ্ণুতেজসে (সর্ব্বব্যাপক তেজসম্পন্নকে) জগৎসবিত্রে (বিশ্ব শ্রষ্টাকে) শুচয়ে (শুদ্ধকে) সবিত্রে (সকলের প্রসবিতাকে) কর্ম্মদায়িনে (কর্ম্ম-প্রেরণাদাতা তোমাকে) নমঃ (প্রণাম করি)।

হে ব্রহ্মস্বরূপ দীপ্তিমান সূর্য্যদেব, তুমি চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করিযা উহাতে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছ। তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব, তোমার প্রভাবে বিশ্ববাসী কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করে। অতএব হে বিশ্বপালক দিবাকর তোমার

তেজোময় সহস্র (অসংখ্য) রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া আমার চিত্ত-শোধন কর। আমি ভক্তিমিশ্রিত অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হই। সূর্য্যদেব খুব সন্নিহিত হইয়া তোমার প্রার্থনা শুনিতেছেন এবং অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন এইরূপ চিন্তন করিবে। আর তোমার ইচ্ছা এবং তোমার কাজকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারিবে না। আমার মুখ দিয়া তুমিই কথা বল, আমার হাত দিয়া তুমিই কার্য্য করিতে থাক।

৩। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ :-

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ বান্ধবেভ্যো নমঃ,
ওঁ জীবেভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ,
ওঁ বিশ্বরূপায় পরমাত্মনে নমঃ ॥ ৬

অকৃতজ্ঞতাকে, নেমকহারামিকে, ঋষিগণ সর্ব্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। মনু বলিয়াছেন - "ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।" তাই উপকারীর উপকার স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করা, সব কাজের প্রথমে তাঁহাদের কাছে প্রণত হওয়া, তাঁহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করা, ছিল ঋষিদের নিত্য কর্ম্মের ভিতরে সর্ব্বপ্রথমে অনুষ্ঠেয়।

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ—গু শব্দের অর্থ জ্ঞান, যাঁহারা সেই জ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই গুরু। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সেই জ্ঞান উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা হইত।

ওঁ বান্ধবেভ্যো নমঃ—তারপরে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের বন্ধুবান্ধবদের

নিকট। তাই তাঁহাদিগকে স্মরণ করা, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করাও ছিল অবশ্য করণীয়।

ওঁ জীবেভ্যো নমঃ—ইহার পরে আমরা কতরূপে কতভাবে সব জীবের নিকট উপকৃত তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিবার ব্যবস্থা ছিল।

ওঁ দেবেভ্যো নমঃ—আমরা যে কত রূপে কত ভাবে ভগদ্বিভূতি-স্বরূপ দেবতাদের নিকট আমাদের সব তত্ত্বে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নিকট ঋণী, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকট নত হইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।

ওঁ বিশ্বরূপায় পরমাত্মনে নমঃ—সর্ব্বোপরি বিশ্বরূপ পরমাত্মাই যে এই সব রূপ ধরিয়া নানারূপে, নানাভাবে আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন—তাহা উপলব্ধি করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা আমাদের ভিতর দিয়া পূর্ণ সফলতা লাভ করিবার সুযোগ পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। স্বস্তিবাচন :—

স্বস্তিবাচন অর্থ হইল সমর্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা মঙ্গল বাণী উচ্চারণ করাইয়া লওয়া। যজমান বলিবেন—আপনারা বলুন, এই কার্য্যের মঙ্গল হউক; ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—স্বস্তি। যজমান বলাইয়া লন, তাই বাচন। স্বস্তিবাচন আর্য্য সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতা ঋষি, মুনি এমন কি প্রত্যেক জীব পাপী-তাপীর নিকট পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজের ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া

সমস্ত শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে একটি সামান্য জীবকেও অসন্তুষ্ট রাখিয়া ভগবৎ-ধামে প্রবেশ অসম্ভব। তাই সকলের নিকট প্রার্থনা করা হইত যে আপনারা সকলে মিলিত স্বরে বলুন যে আমাব আরব্ধ কার্য্যের মঙ্গল হউক—সু-অস্তি। এই বচন আপনাদের মুখ হইতে বাহির হউক। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—আমার এই অনুষ্ঠান মঙ্গল বিধান করুক এই কথা আপনাদের মুখ হইতে বাহির হইলে নিশ্চয়ই আমাদের এই অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইবে।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥৭

বৃদ্ধশ্রবাঃ (প্রভূত স্তুতি বা হবিরূপ অন্ন যাঁহার আছে, অথবা যিনি সতত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন সেই) ইন্দ্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) নঃ স্বস্তি (আমাদিগের মঙ্গল) [দধাতু (বিধান করুম)] বিশ্ববেদাঃ (সর্ব্ব-জ্ঞানাধার) পূষা (জগৎপোষক দেবতা) নঃ স্বস্তি (আমাদের মঙ্গল) [বিধান করুন] অরিষ্টনেমিঃ (অরিষ্ট=অহিংসা, তাহার নেমি বা পালক—সমস্ত অশুভকে যিনি পরিধিগত করিয়া নাশ করেন সেই গরুড়, অথবা অরিষ্টনেমিঃ=যাঁহার নাম স্মরণ করিলে (জীবন) রথনেমির (অর্থাৎ চক্রের) অবাধ গতি হয় সেই বিষ্ণুরচালক গরুত্মান্) তার্ক্ষ্যঃ (গরুত্মান্) নঃ স্বস্তি (আমাদের কল্যাণ করুন) বৃহস্পতিঃ ন স্বস্তি দধাতু (দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের অবিনাশ বিধান করুন॥৭॥

ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবা ইন্দ্রাদয়স্তথা।
ভূতানি যানি বৈ লোকে স্বস্তি দিশন্তু তানি নঃ॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ চ রুদ্রঃ চ (ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্রদেব) তথা ইন্দ্রাদয়ঃ দেবাঃ (আর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ) লোকে (এই জগতে) যানি বৈ ভূতানি তানি (যে সমুদায় প্রাণিগণ আছে তাহারা সকলে) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি (কল্যাণ, মঙ্গল) দিশন্তু (বিধান করুন) ।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ ৯
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১০
ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু ॥ ১১
ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ।
ওঁ তিথিনক্ষত্রবারাদয়ঃ শুভায় ভবন্তু ॥ ১২

আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লোকাঃ (জীবসমুদয়) দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ (দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং মানবগণ) সর্ব্বে পিতরঃ (আমাদের পিতৃপুরুষগণ) মাতৃমাতামহাদয়ঃ (মাতৃগণ এবং মাতামহ প্রভৃতি) তৃপ্যন্তু (সকলেই পরিতৃপ্ত হউন) । অতীতকুলকোটীনাং অতীত কোটিকুলের) সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং (এবং সপ্তদ্বীপবাসী আত্মগণ) ময়া দত্তেন (আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত) তোয়েন (জলাঞ্জলি দ্বারা) তৃপ্যন্তু (তৃপ্তিলাভ করুন) । ভুবনত্রয়ং (ত্রিভুবন) তৃপ্যতু (তৃপ্ত হউক) । আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ (ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ) তৃপ্যতু (তৃপ্ত হউক) । অয়ম্ আরম্ভঃ (এই শুভানুষ্ঠান) শুভায় ভবতু মঙ্গল বিধান করুক) । তিথিনক্ষত্রবারাদয়ঃ (তিথি-নক্ষত্র-দিবসাধিপতি দেবতাদি সকলে) শুভায় ভবন্তু (মঙ্গল বিধান করুন) ।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ হবন-কর্ম্মণি
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, শিবং চাস্তু,
ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাম্ ॥ ১৩

অস্মিন্ কর্ত্তব্যে হবনকর্ম্মণি (এই অনুষ্ঠেয় হবনকর্ম্মে) ভবন্তঃ (আপনারা উপস্থিত সকলে) ঋদ্ধিম্ অধিব্রুবন্তু (পার্থিব অপার্থিব সম্পৎ, ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ হউক, এই আশীর্ব্বাদ করুন)।

ঋধ্যতাং (সকলের মুখ হইতে তোমাদের আধিভৌতিক আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হউক এই বাণী উচ্চারিত হইল)।

সকলের ঋণ শোধ করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া ভগবৎস্বরূপের চিন্তনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

৫। ভগবৎস্বরূপচিন্তন :—

এখানে ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থ লক্ষণ ও ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ এবং কোথায় কিভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় এই জাতীয় কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া পরে যজ্ঞেশ্বরের ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানই যে আমাদের সব তাঁহাকে লইয়াই যে সব, তিনিই যে আমাদের সমস্ত সম্পৎ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও আনন্দের একমাত্র মূলাধার, তিনি যে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে, আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া তাঁহার পরম আনন্দ-ধামে লইয়া যাইতে কত ব্যস্ত তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

স্বরূপ-লক্ষণ :—

ওঁ সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম
ওঁ আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি।
ওঁ শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্
তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৪

ওঁ ব্রহ্ম (সেই চিরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানস্বরূপ) অনন্তম্ (অপরিচ্ছিন্নস্বভাব) যৎ বিভাতি (যিনি সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন) আনন্দরূপম্ অমৃতম্ (তিনি আনন্দস্বরূপ এবং অবিনাশী)। শান্তম্ (তিনি শান্ত) শিবম্ (কল্যাণময) অদ্বৈতম্ (অদ্বৈততত্ত্ব। তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (সেই দেবতাকে আমরা হবি আহুতি দ্বারা অবশ্যই পরিচর্য্যা করিব)।

তটস্থ লক্ষণ ঃ—

ওঁ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৫

ওঁ যতঃ (যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম হইতে) ইমানি ভূতানি বৈ জায়ন্তে (এই সমুদয় জীবজগতের নিঃসন্দেহ উৎপত্তি) যেন (সেই ব্রহ্ম দ্বারা) জাতানি জীবন্তি (সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ বিধৃত, পরিপুষ্ট) যৎ (পুনঃ সেই ব্রহ্মে) প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি (প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রয়াণ করিয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়, পরম বিশ্রাম লাভ করে) তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (সেই দেবতাকে আমরা অবশ্যই হবিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।)

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঃ—

ওঁ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচম্।
স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ তস্মৈ দেবায় হবিষা
বিধেম ॥ ১৬

যৎ (যিনি) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (কর্ণেন্দ্রিয়াদির শ্রবণাদি শক্তি) মনসঃ মনঃ (মনের মনন শক্তি বাচঃ হ বাচং (বাগিন্দ্রিয়েরও বাক্‌শক্তি) স উ প্রাণস্য প্রাণঃ (তিনিই প্রাণের স্পন্দনশক্তি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (নেত্রের দৃক্‌শক্তি) তস্মৈ দেবায় ইত্যাদি ।

ভগবানের অধিষ্ঠান ঃ—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৭

ওঁ যঃ দেবঃ (সেই প্রসিদ্ধ দ্যোতনশীল জ্যোতিঃ) অগ্নৌ (অগ্নিতে) যঃ যিনি) অপ্সু (জলেতে) যঃ (যিনি) বিশ্বং ভুবনম্‌ (সমস্ত ভুবনে) যঃ ওষধিষু (যিনি ওষধিবৃক্ষসমূহে যঃ বনস্পতিষু (যিনি বিশাল মহীরুহে) আবিবেশ (আত্মা অন্তর্য্যামী অন্তর্নিহিত শক্তি-রূপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন) তস্মৈ দেবায় ইত্যাদি ।

বিশেষভাবে অনুভব করিতে হইবে ভগবানের অবস্থিতি ও কৃপা ছাড়া অর্থাৎ তাঁহার সহিত যোগসূত্রটি বজায় না থাকিলে আমাদের চোখ দেখিতে পায় না, কান শুনিতে পায় না, হাত কাজ করিতে পারে না, মন চিন্তা করিতে পারে না, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না. আমাদের আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত লোপ পায়। "এই রহস্য চিন্তা করিয়া ভগবান যাহাতে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহার যজ্ঞ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া লইতে পারেন," সেই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ।

৬। যজ্ঞেশ্বরের পূজা ঃ—

ভগবান স্বয়ং যে যজ্ঞরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া যজ্ঞ যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞের উপকরণ যজমান আদিরূপে উপস্থিত হইয়া নিজের যজ্ঞ নিজে সাধিত করিতেছেন—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রার্থনা করিতে হইবে—হে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ভগবান্, তুমি নিজে যজ্ঞক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভিতরে সর্ব্বতত্ত্বে সর্ব্বদ্রব্যে সর্ব্বক্রিয়াকাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া তোমাব যজ্ঞ তুমি নিজে সুসম্পন্ন করিয়া দাও। তুমি আমাদের সকলের সব তত্ত্ব দখল করিয়া বসিয়া আমাদিগকে যন্ত্ররূপে চালিত কর। এখানে অনুভব করিতে হইবে যেন সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধমহাত্মগণ সকলে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞদর্শনে সমাগত হইয়াছেন। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে তোমার কার্য্য তোমারই দ্বারা সাধিত হইতেছে। ইহার ভিতরে আমাদের কোনওরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রতিষ্ঠার মোহ থাকা উচিত নয়।

ধ্যান ঃ—

যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞী যজ্ঞাঙ্গং যজ্ঞসাধনম্।
যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞভুগ্ বিষ্ণুস্ত্বমেব যজ্ঞপাবনঃ ॥ ১৮

তুমিই এই যজ্ঞের যজ্ঞপতি তোমারই উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ সাধিত হইতেছে। তুমিই এই যজ্ঞের কর্ত্তা, তুমিই এই যজ্ঞের সর্ব্ব অঙ্গ, সব উপকরণ, তুমিই যজমান ঋত্বিক্ প্রভৃতি রূপে উপস্থিত, তুমিই এই সকলকে সব উপকরণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে। তুমি নিজেই যজ্ঞফল বহন করিবে। তুমিই ইহার ভোক্তা তুমিই তোমার যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দাও। ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ আদি ভাব পরিচিন্তনীয়।

পাদ্য অর্পণ ঃ—মনে রাখিতে হইবে ভগবান কিভাবে জীবের পূজা, জীবের সেবা করিয়া চলিয়াছেন—আমাদের পূজা সেই পূজার নকলমাত্র। এখানে সম্প্রদান অর্থ ই তিনিই যে সব করিতেছেন তিনিই যে মুখ্য কর্ত্তা আমরা যে শুধু নিমিত্তমাত্র এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। যজ্ঞেশ্বর কিভাবে জগতের জীবের ভিতর বসিয়া সমস্ত জলতত্ত্ব শোধন করিয়া দিতেছেন এবং সেই শোধিত জলদ্বারা বিষ্ণুর পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন – এই তত্ত্ব এখানে চিন্তনীয়।

ওঁ এতৎ পাদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৯

অত্র পাদ্যসমর্পণেন চেতসি যদ্‌যৎ মালিন্যং সঞ্জাতং, তৎ সর্ব্বং শোধয়িত্বা সহস্রারবিগলিতসুধাং যজ্ঞেশ্বরায় পাদ্যরূপেণাহং সম্প্রদদে ॥ ২০

অত্র পাদ্যসমর্পণেন (এই স্থলে পাদ্যসমর্পণের দ্বারা) চেতসি (আমার চিত্তদর্পণে) যৎ যৎ মালিন্যং সঞ্জাতং (যে সমস্ত মলিনতা উৎপন্ন হইয়াছে) তৎ সর্ব্বং শোধয়িত্বা (সেই সকল শোধনপূর্ব্বক) সহস্রার-বিগলিত-সুধাং (সহস্রার হইতে বিগলিত সুধা) অহং যজ্ঞেশ্বরায় পাদ্যরূপেণ সম্প্রদদে (আমি যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পাদ্যরূপে নিবেদন করিতেছি)। অর্থাৎ সাধক নিজের চিত্ত শোধন করিয়া সহস্রার বিগলিত সুধার দ্বারা যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম পরিধৌত করিতেছেন এইরূপ ভাবনা করিবেন।

যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি ভক্তবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥ ২১

যস্য (যাঁহার) দিব্যে নির্ম্মলে (দিব্য এবং নির্ম্মল) পাদাম্বুজে

(চরণকমলে) ব্রহ্মরূপিণী গঙ্গা (ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গা) স্থিতা (অবস্থিত আছেন এবং) তদ্ভবা (তাঁহা হইতে উৎপন্না হইয় সেই গঙ্গা) জগৎ পুনাতি (জগৎ পবিত্র করিতেছেন) [তস্মৈ] (সেই চরণ কমলে) অহং পাদ্যং দদামি (আমি পাদ্য অর্পণ করিতেছি)।

আমি সেই পাদপদ্ম আমার ভক্তিবারির দ্বারা বিধৌত করিলাম। সেই প্রসাদী জলদ্বারা আমার সবতত্ত্ব শুদ্ধ ও আপ্যায়িত করিতেছি। দেবতার শুদ্ধ স্বরূপের ধ্যান দ্বারা আমার সব তত্ত্ব আজ শুদ্ধ হইয়া গেল।

অর্ঘ্য প্রদান ঃ—

ওঁএষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২২

অত্র অর্ঘ্যসম্প্রদানেন চেতসি
যানি যানি সৌন্দর্য্যাণি সন্তি,
তানি সর্ব্বাণি যজ্ঞেশ্বরায় অহং সম্প্রদদে ॥ ২৩

এখানে তিনি যে কিভাবে জীব-জগৎকে সুসজ্জিত করিতেছেন এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরাও তাঁহার কাজের নকল করিয়া তাঁহাকে আমাদের সব পূজার পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের সব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি যে আসলে তাঁহারই দান, তাঁহারই প্রকাশ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

যঃ প্রাণবিন্দুর্মদীয়ো মহাপ্রাণাম্বুধৌ ত্বয়ি।
সোঽয়ং সম্মিলিতো দেব প্রাণার্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৪

মদীয়ঃ যঃ প্রাণবিন্দুঃ (আমার যে ক্ষুদ্রপ্রাণবিন্দু) ত্বয়ি প্রাণাম্বুধৌ (তোমার মহাপ্রাণসাগরে) সম্মিলিতঃ (ওতঃপ্রোতভাবে মিলিত

রহিয়াছে) দেব (হে দেব) সঃ অয়ং প্রাণার্ঘ্যঃ (সেই এই মদীয় প্রাণরূপ অর্ঘ্য) প্রতিগৃহ্যতাম্ (তোমাকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হউক)। অর্থাৎ তোমারই যে দেওয়া আমার এই জীবাত্মরূপ প্রাণবিন্দু তাহা আমি অর্ঘ্যরূপে তোমাতে নিবেদন করিতেছি। তাহা পরিশুদ্ধ হইয়া তোমার গ্রহণযোগ্য হউক।

আমাদের এই প্রাণ মন আদি যে তোমারই সর্বব্যাপী প্রাণাদির অচ্ছেদ্য অংশমাত্র, আমাদের অহংকার এতদিন যে ইহাদিগকে তোমা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া কত অকর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল আজ তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আমাদের এই ব্যষ্টি প্রাণাদিকে তোমার সমষ্টিপ্রাণে আহুতি দিয়া আমরা যেন সর্বতোভাবে তোমার হইয়া যাইতে সমর্থ হই। তুমি আমাদের এই প্রাণটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥ ২৫

[যৎ] (যেই) পাদপদ্মং (চরণকমল) দিনে দিনে (প্রতিদিন, নিয়ত) ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ) চিন্তয়ন্তি (শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত হৃদয়ে ধ্যান করেন) [তস্মৈ] অনর্ঘায় জগদ্ধাত্রে (জগৎপালক তোমার সেই অমূল্য শ্রীপাদপদ্মে) অহং এতৎ অর্ঘ্যং দদামি (আমি এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি)। অর্থাৎ আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ তোমারই দান তোমারই মহাপ্রাণ-সাগরে মিলনোন্মুখ, আর যাহাতে আমার অহংবুদ্ধি-প্রসূত ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ না করিতে হয় মিলনকামী তোমার এই

সন্তানকে আত্মকবলিত করিয়া আমার এই প্রাণার্ঘ্য দান গ্রহণ করিয়া জয়যুক্ত কর।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে পাদপদ্মের ধ্যানে বিভোর আমরা সেই অমূল্য পাদপদ্মের ধ্যান করিয়া আজ আমাদের জীবন সার্থক করিব।

গন্ধপুষ্পপ্রদান ঃ—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২৬
অত্র গন্ধপুষ্প-সম্প্রদানেন চেতসি
যে যে ভগবদ্ভাবাঃ সন্তি,
তান্ সর্বান্ যজ্ঞপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ২৭

এই স্থূল গন্ধপুষ্প এবং ইহা যাহার প্রতীক সেই আমাদের চিত্তের জ্ঞান প্রেম আদি সব সৌন্দর্য্যগুলি যে তোমারই দান, তোমারই প্রকাশ, সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলিকে তোমাতে অর্পণ করিতেছি। এই সব যে আমাদের নিজের নয় এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তোমার ধন তোমাকে দিয়া আমরা আজ বৃথা কর্ত্তৃত্বা-ভিমানের হাত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করি।

ধূপদান ঃ—

ওঁ এষ ধূপঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২৮
অত্র ধূপদানেন চেতসি
তপস্যা-লব্ধা যে যে সদ্গুণাঃ সন্তি,
তান্ সর্বান্ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ২৯
ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩০

দিব্যঃ (স্বর্গজাত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) গন্ধাঢ্যঃ (সুগন্ধে ভরপুর) বনস্পতিরসঃ (বৃক্ষজাত রস) সর্বদেবানাং আঘ্রেয়ঃ (সকল দেবতাদের আঘ্রাণের প্রিয়বস্তু) সুমনোহরঃ অয়ং ধূপঃ (এই মনোজ্ঞ ধূপ) প্রতিগৃহ্যতাম (তোমা কর্তৃক গৃহীত হউক)।

ধূপ আগুনে জ্বলিয়া সুগন্ধ বিতরণ করে। আমাদের ভিতরেও সেইরূপ অনেক গুণ আছে, যাহা আমাদের তপস্যার ফলে প্রকাশের আবরণ দূর হওয়ায় প্রকাশ পায়। তাই এই সব তপস্যালব্ধ সদ্‌গুণগুলিও যে তোমারই প্রকাশ ছাড়া অপর কিছুই নহে এ তত্ত্ব আস্বাদ করিবার যোগ্যতা দান করে।

এই বনস্পতির রসনির্মিত ধূপ যাহা দেবতাদের আঘ্রেয়, তাহা তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তাহাও যে তোমারই প্রকাশ তাহাই কেবল মনে হইতেছে।

দীপদান :—

ওঁ এষ দীপঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৩১
অত্র দীপদানেন পরোক্ষাপরোক্ষাদি-সর্বজ্ঞানং যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ৩২

অত্র দীপদানেন এইস্থলে জ্যোতিঃরূপ দীপদান দ্বারা) পরোক্ষ-অপরোক্ষ-আদি সর্বজ্ঞানং (শাস্ত্রাদিলব্ধ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ চৈতন্যদ্বারা স্বানুভূত অপরোক্ষ—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান) অহং যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে সম্প্রদদে (আমি যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ করিতেছি)। অর্থাৎ আমার ভিতরে পরোক্ষ অপরোক্ষ যত প্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়াছে তাহা তোমার কৃপাতেই হইয়াছে, তোমাতেই তাহা সমর্পিত হউক।

পাদ্যাদি ধূপ পর্য্যন্ত অর্পণের ফলে তখন কর্তৃত্বাভিমান দূর হওয়ায় যোগের ক্রিয়াবিশেষের ফলে আমাদের আজ্ঞাচক্রে শিবলিঙ্গরূপে জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। তখন বুঝিতে পারা যায়—

ওঁ অগ্নিজ্যোতী রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতি স্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমং দেব জ্যোতি র্মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩

অগ্নিজ্যোতিঃ (অগ্নির জ্বলনদীপ্তি) রবিজ্যোতিঃ (সূর্য্যের প্রকাশ-শীলতা) চন্দ্রজ্যোতিঃ তথা এব চ ' এবং নিশাকরের স্নিগ্ধ চন্দ্রিমা) দেব (হে দেব) জ্যে তিষাম্ উত্তমং মে জ্যোতিঃ (এই সমস্ত সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই দীপেব জ্যোতিঃ) প্রতিগৃহ্যতাম (তোমার গ্রহণযোগ্য হউক)।

অর্থাৎ সেই জ্ঞানের আলো এত উজ্জ্বল এত মধুর যে অগ্নির সূর্য্যের সোমের জ্যোতি যেন তাহার কাছে ম্লান হইযা যায। তখন বুঝিতে পারা যায় যে উপনিষৎ কেন বলিয়া গিযাছেন—ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র-তারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ সেই ব্রহ্মজোতির কাছে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুতাদির জ্যোতি সবই নিষ্প্রভ তাঁহারই আলোকে ইহারা সকলে আলোকিত হয়।

যস্মিন্ প্রজ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমঃ
বাহ্যং ন চাভ্যান্তরম্।
সোঽয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো
দীপঃ সমুজ্জ্বালতাম্ ॥ ৩৪

যস্মিন্ প্রজ্বলিতে (যে জ্ঞানাগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিলে) ন বাহ্যং ন চ আভ্যন্তরং তমঃ ন (না ত' বাহ্য না ত' আভ্যন্তর—কোনওরূপ অন্ধকারই আর থাকিতে পারে না) জ্ঞানময়ঃ (জ্ঞানময়) প্রকাশপরমঃ (পরম প্রকাশস্বরূপ) সঃ অয়ং দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্ (সেই দীপশিখা প্রজ্বলিত কর)। অর্থাৎ যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সাধকের হৃদয়ে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোক সম্পাত হইতে থাকিলে অনাত্মদর্শনজনিত মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায়। ক্রমে সাধকের জ্ঞানদৃষ্টি দিব্যচক্ষু লাভ হয়, তাহাই যথার্থ দীপ নিবেদন।

সেই জ্যোতির প্রকাশে ভিতর বাহিরের সব অন্ধকার দূর হইয়া যায়। হে ভগবান্ তুমি দয়া করিয়া আমার সেই জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত করিরা দাও এবং সেই জ্ঞানও যে তোমারই প্রকাশ তাহার ভিতরেও যে আমার অহংকার করিবার কিছুই নাই, এই তত্ত্ব আমাকে বুঝিতে দাও।

নৈবেদ্য নিবেদন ঃ—

ওঁ এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৩৫

অত্র নৈবেদ্যসম্প্রদানেন মম
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তাত্মানং
ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ৩৬

এখানে নৈবেদ্য অর্থ—ভুক্ত অন্নাদির চরম পরিণতিরূপ সুধা, আমাদের সাধনভজনের ফলে উৎপন্ন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব।

উপচার সমর্পণ ঃ—

ময়ার্প্যতে ত্বচ্চরণেঽহয়মাত্মা
প্রতীচ্ছ হে স্বস্য ধনং স্বয়ং ত্বম্।
কিঞ্চিন্নিজস্বং ন হি বিদ্যতে মে
যদ্ দীয়তে ত্বচ্চরণে মুকুন্দ ॥ ৩৭

ময়া (আমাকর্তৃক) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) ত্বচ্চরণে (তোমার চরণে) অর্প্যতে (অর্পিত হইতেছে) হে (সর্ব্বাত্মন্) ত্বং স্বয়ং (তুমি নিজে) স্বস্য ধনং (তোমার নিজের এই ধন) প্রতীচ্ছ (গ্রহণ কর)। মুকুন্দ (হে মুক্তিদাতা) ত্বচ্চরণে (তোমার চরণে) যৎ দীয়তে (যাহা কিছু অর্পিত হইয়াছে) [তাহাতে] মে নিজস্বং (আমার নিজস্ব) কিঞ্চিৎ ন বিদ্যতে হি (কিছুমাত্রও নিশ্চয়ই নাই)।

আমার এই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মাও যে তোমারই প্রদত্ত বস্তু এই তত্ত্ব সাধক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া আত্ম-নিবেদন তত্ত্ব সার্থক করিয়া তোলেন। এখানে "কি দিব, কি দিব বঁধু মনে করি আমি" নরোত্তম ঠাকুরের এই প্রার্থনাটি স্মরণীয়।

গায়ত্রী জপ :—

সাধক নিজের আরাধ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া যজ্ঞেশ্বরের ধ্যানের ফলে আস্তে আস্তে তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব আস্বাদ করিতে থাকেন। তখন সমস্ত "ইদং তত্ত্ব" যেন ধ্যেয় "অহং তত্ত্বে"রই পরিণতি বা বিবর্ত্তন-রূপে উপলব্ধ হওয়ায় আস্তে আস্তে সমস্ত ইদংতত্ত্ব অহংতত্ত্বে আহুত হইয়া সবই যেন এক পরম অদ্বৈত তত্ত্বে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তাহার পরে আস্তে আস্তে একটি লীলার্থ কল্পিত দ্বৈত ভাব যেন সাধকের নিকট স্ফুরিত হইয়া উঠে।

এই লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্। তখন সাধকের ভিতরে বাহিরে থাকে শুধু এক লীলাতত্ত্বের স্ফুরণ। এই দ্বৈত, অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতরূপ লীলাতত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চিন্তন ও উপলব্ধি লইয়াই

রূপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহাকে প্রকাশ ও বিমর্শ শক্তির রহস্য আস্বাদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে যজ্ঞেশ্বরায় ধীমহি
তন্নো যজ্ঞঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৩৮

ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে (যজ্ঞপতি পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া আমরা তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার চিদরূপে বিভোর থাকিব) যজ্ঞেশ্বরায় ধীমহি (যজ্ঞপুরুষের ধ্যানে আত্মসমাহিত হইব) [এইরূপে আমাদের সকল বৃত্তি ভগবানে অর্পিত হইলে] যজ্ঞঃ (সেই পরমেশ্বরের যজ্ঞস্বরূপ যজ্ঞ) নঃ [বুদ্ধিবৃত্তীঃ] (আমাদের [বুদ্ধিবৃত্তি] সমুদয়কে) প্রচোদয়াৎ (ধর্ম্ম-অর্থ আদি চতুর্ব্বর্গে প্রেরণ করুন)।

এই গায়ত্রীজপের ভিতরে আমরা দ্বৈতভাবে পরমেশ্বরকে জানিতে জানিতে আমাদের ভিতর বাহিরে সব তত্ত্বে পরমেশ্বরের ভাবনার ফলে তাহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া আমরা তাঁহার লীলার সহায় হইয়া পড়ি। তখন তিনিই যে যন্ত্রী হইয়া জীব-জগদরূপ এই যন্ত্রকে চালাইতেছেন সেই তত্ত্ব আমাদের অনুভবে আইসে।

<u>প্রণাম :—</u>**ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।**
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৩৯

কৃষ্ণায় (রূপে গুণে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্তাকর্ষককে) বাসুদেবায় (যিনি আমাদের বিশুদ্ধচিত্তে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট সেই বাসুদেবকে) হরয়ে (যিনি আপন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আমাদের চিত্তহরণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে তৎপর তাঁহাকে) পরমাত্মনে (যিনি পরমাত্ম-

রূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের দেহযন্ত্রকে চালাইতেছেন, তাঁহাকে) প্রণতক্লেশনাশায় (যিনি আশ্রিত ভক্তদের সমস্ত ক্লেশ দূর করিতে শশব্যস্ত তাঁহাকে) গোবিন্দায় (যিনি আমাদের সব ইন্দ্রিয়কে তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত করিয়া আমাদের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা আস্বাদিত হইতে সচেষ্ট তাঁহাকে) নমঃ নমঃ (বার বার প্রণাম করিতেছি)।

যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বসুদেবের আত্মজ, যিনি সর্ব্বদা প্রণত ভক্তের চিত্তহরণে তৎপর, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যিনি আশ্রিতের ত্রিবিধ ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন, যিনি বাক্য-মনের অগোচর হইয়াও ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অনুভববেদ্য সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ণ আত্মনিবেদন দ্বারা আমি বার বার নত হইতেছি।

ওঁ নমোব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৪০

ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ (ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার) গোব্রাহ্মণহিতায় জগৎ-হিতায় চ কৃষ্ণায় নমঃ (গোব্রাহ্মণ-হিতকারী এবং জগতের উপকারক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার) গোবিন্দায় নমঃ (যিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হইয়া আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদিত হইতে সচেষ্ট তাঁহাকে প্রণাম)।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥ ৪১

হে কৃষ্ণ হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক) করুণাসিন্ধো (দয়ার সাগর) দীনবন্ধো (অনাথশরণ) জগৎপতে (নিখিল জগতের বিধাতা, পালক)

গোপেশ (গোপদের ঈশ্বর—সমস্ত জীবের ঈশ্বর) গোপিকাকান্ত (মধুর ভাবাপন্ন বরণীয় রমণীয় তত্ত্ব) রাধাকান্ত (যিনি কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যা কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার বল্লভ) তে (তোমাতে) নমঃ অস্তু (আমার নমস্কার অর্পিত হউক)।

ওঁ প্রাণগোবিন্দায় নমঃ ॥ ৪২

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ ৪৩

ব্রহ্মানন্দং (নিজে ব্রহ্মে পরমাত্মসত্তায় বিচরণ করিয়া যিনি নিয়ত আনন্দ পান) পরমসুখদং (যিনি আত্মতত্ত্ব বিতরণ করিয়া অপরকে পরম সুখ দান করেন) কেবলং (পরমাত্মসত্তায় নিবেদিত প্রাণ হওয়ার ফলে যাহার ব্যষ্টিত্ব একান্তভাবে বিলুপ্ত হইয়া বিরাট ভূমা অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে) জ্ঞানমূর্ত্তিং (একমাত্র জ্ঞানই যাঁহার শরীরের উপাদান) দ্বন্দ্বাতীতং (যিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত অর্থাৎ দ্বিতীয় বোধহীন) গগন সদৃশং (যিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক—অসীম) তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ তৎ ত্বম্ অসি এই মহাবাক্যের যিনি লক্ষ্য) একং (যিনি অদ্বিতীয় সত্তায় অবস্থিত) নিত্যং (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালাতীত, অপরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত) বিমলং (সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-লেশ শূন্য) অচলং (নিত্যস্থির) সর্ব্বধী সাক্ষীভূতং (সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তিতে যিনি সাক্ষিরূপে বিরাজমান) ভাবাতীতং (যিনি পরম যোগী-ঋষিদেরও ভাবের অগম্য) ত্রিগুণরহিতং (যিনি সত্ত্বরজঃ তমঃ—

ত্রিগুণের মলরহিত) সৎ গুরুং তং নমামি (তিনিই একমাত্র সৎ-অস্তিত্বরূপী গুরু তাঁহাকে নমস্কার)। অর্থাৎ পরমপুরুষই সাধারণ রোগ-শোক-জন্মমৃত্যু-আদি মানবীয় ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীগুরুরূপে সাধকের কল্যাণার্থে আবির্ভূত হন। তাঁহাতে পরমাত্মতত্ত্বের সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যই পূর্ণরূপে বিরাজমান। সুতরাং গুরুতে কখনও মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই।

৭। অগ্নির আবাহন ঃ—

অগ্নির মুখ্যার্থ ব্রহ্ম, সহস্রারে তাঁহার অধিষ্ঠান। দেবগণের ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে গমন, দেবীর পিত্রালয়ে হিমালয়ে মর্ত্ত্যধামে আগমন রহস্য এইখানে অনুভবনীয়। ষট্‌চক্র-ভেদ কুণ্ডলিনীর জাগরণ, গায়ত্রীর সাধন প্রভৃতির সাহায্যে চিত্তকে সহস্রারে লইয়া গিয়া ভগবানকে জীবের দুঃখের সংবাদ জানাইয়া তাঁহাকে নীচের সবতত্ত্বে লইয়া আসিয়া সব তত্ত্বকে ভগবৎ ভাবে পূর্ণ করিয়া ভগবৎ-কার্য্য সাধনে যোগ্য করিয়া তুলিবার রহস্যই অগ্নির আবাহন। শ্রীঅরবিন্দের Descent of the Divine দিব্যের মর্ত্ত্যে আগমন, Bibleএর Let Thy Kingdom come ইত্যাদি স্বর্গের মর্ত্ত্যে অবতরণ এই তত্ত্বের অনুরূপ। মনে রাখিতে হইবে অগ্নি দেবতাদের মুখ-স্বরূপ, দেবতাদের পুরোহিত, Bible এর Holy Ghost, পুরাণের নারদ ঋষি অর্থাৎ যিনি মর্ত্ত্যবাসীকে স্বর্গের সমাচার জ্ঞাপন করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা করেন তিনি অগ্নির বিভূতি, ঈশ্বরের দূত, হিন্দুর দেবতাদি রহস্য। বিভিন্ন তত্ত্বে অগ্নির বিভিন্ন নাম বিভিন্ন কার্য্যকলাপ, সাধনার গূঢ় রহস্যে পূর্ণ।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৪৪

অগ্নে [ত্বং] আয়াহি (অগ্নিদেব, তুমি এই যজ্ঞভূমিতে সমাগত হও) বীতযে (হবি ভক্ষণের নিমিত্ত) গৃণানঃ (আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া) হব্যদাতযে (দেবতাদিগকে হবি প্রদানের জন্য) হোতা (দেবতাগণকে হবি গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিতে আসিয়া) বর্হিষি (আস্তীর্ণ দর্ভে) নিসৎসি (উপবেশন কর)।

হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইযা আমাদের প্রদত্ত হবি গ্রহণ করিয়া দেবতাদেব নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দাও।

ওঁ অগ্নে ত্বম্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ,
ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি,
ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,
মম পূজাং গৃহাণ ॥ ৪৫

হে অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞভূমিতে এই যজমানের দেহে আগমন কর। এখানে অবস্থান কর। আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইও না। আমাদের ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ॥ ৪৬
ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ৪৭

আমরা এই গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিতেছি,--অগ্নির নিকট এই হবি অর্পণ করিতেছি।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ৪৮

(আমি) যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ (যজ্ঞের পুরোভাগে অবস্থিত, দেহের হিতকারী, হোমের সম্পাদক) দেবম্ (জ্যোতির্ম্ময়) হোতারম্ ঋত্বিজম্ (দেবতাদের হোতানামক ঋত্বিক্‌কে) রত্নধাতমম্ (যজ্ঞের ফলস্বরূপ রত্নের দাতারূপ অগ্নিকে) ঈড়ে (স্তব করিতেছি)। যে অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত যজ্ঞের ফলদাতা আমি তাঁহার আরাধনা করিতেছি।

অগ্নিবন্দনা :—

ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৪৯

(আমি) প্রজ্বলিতম্ অগ্নিম্ বন্দে (প্রজ্বলিত অগ্নির বন্দনা করিতেছি) জাতবেদম্ (যিনি সব জাত সৃষ্ট পদার্থকে জানেন) হুতাশনম্ (যিনি সমস্ত হুত, প্রদত্ত নিক্ষিপ্ত বস্তু সকলকে ভক্ষণ করেন) অমলম্ (যিনি সমস্ত ময়লা ভক্ষণ করিয়া দ্রব্যকে পবিত্র করিয়াও নিজের পবিত্রতা রক্ষা করেন) সমিদ্ধং (যিনি সম্যগ্‌রূপে জ্বলনশীল) বিশ্বতোমুখম্ (যাহার শিখারূপ মুখ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত)।

গায়ত্রী :—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্।
ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৫০

এই মন্ত্র পড়িয়া ৭ বার আহুতি দিবে। এই মন্ত্রটির প্রথম ভাগে নেতি নেতি ক্রমে মূলাধার আদি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে গিয়া

পৌঁছিবার উপায় নির্দ্দেশ করে। ইহা যোগের ষট্‌চক্রভেদের অনুরূপ। ইহার সাধনক্রমে সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া মূলাধার হইতে সহস্রারে লইয়া গিয়া তৎসহ পরম শিবের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। সেখানে গিয়া ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং এই সপ্তলোকের প্রসবকর্ত্তা, বাক্য মনের অতীত, বরণীয় দেবস্য ভর্গঃ, পরমাত্মার ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধীমহি ধ্যান করি—এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক চিত্তকে সহস্রারে সপ্তলোকের ব্রহ্মজ্যোতিতে নিমগ্ন করিয়া দিতে হয়। সহস্রারে অগ্নির প্রকৃত ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইয়া অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অগ্নির নিকট আপন আপন প্রার্থনা জানাইতে হয়। ইহার পরে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে সমস্ত তত্ত্বে, অন্তরিন্দ্রিয়ে ও বহিরিন্দ্রিয়ে আনয়ন করিয়া সব তত্ত্বগুলিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিভাবিত করিয়া ব্রহ্মের কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাই হইল অগ্নিদেবতার অবতরণ—**Descent of the Divine,** তখন সহস্রারে এবং নীচের সব চক্রে সব তত্ত্বে অগ্নির স্বরূপ অবগত হইয়া প্রত্যেক চক্রে আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ সব চক্রে যে সব আগন্তুক ময়লা আসিয়া তত্ত্বগুলিকে মলিন করিয়াছিল ভগবৎকার্য্য সাধনে বাধা দিতেছিল তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত করিয়া সবতত্ত্বে ভগবৎ-লীলা অনুভব করিতে হয়। তখন

সহস্রারে:—**ওঁ অগ্নে ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।**
ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা *॥ ৫১

বলিয়া সহস্রারে অগ্নির মুখ্য ব্রহ্মরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট

---

* অগ্নিতে যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া যায় অগ্নি তাহার মলিনতা তাহার খাদ দূর করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হওয়াই সেই দ্রব্যের পুষ্টি বা পরিণতি। অগ্নি=ব্রহ্মাগ্নি, জ্ঞান, বিচার জ্ঞান। কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে

আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্নির আপন সংস্কারজনিত মলিনতা দূর করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তার পরে—

আজ্ঞাচক্রে:—**ওঁ অগ্নে ত্বমেব দেবস্য ভর্গোঽসি।**

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ ভর্গোরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫২

মন্ত্রে আজ্ঞাচক্রে চিত্ত স্থির করিয়া ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া সেখানে অগ্নির ভর্গোরূপের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে আহুতি প্রদান

ভুল সংস্কার খাদ দূর করিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণ করিতে সাহায্য করে। অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে ক্রমে শুদ্ধ করিয়া সুধায় পরিণত করে অর্থাৎ অন্নকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে লইয়া যায়।

সূর্য্যের কিরণরূপ অগ্নি জলের মলিনতা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপে সুধায় পরিণত করিয়া শিবের মস্তকে অর্পণ করে। সেই সুধা গঙ্গারূপে তখন বিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা হইয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর দিয়া মর্ত্তে আসিয়া জীবকে আপ্যায়িত করে, পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে।

মানুষ কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদির গৃহীত অন্ন আস্তে আস্তে সুধায় পরিণত হইয়া তাহার আত্মার কাছে যায়। ইহা নরমেধ যজ্ঞ। তার পরে পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষ সেই সুধা দ্বারা আমাদের সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করেন। এই আপ্যায়ন কাজে আমাদের সব রকমের মলিনতা তাহাতে যুক্ত হইয়া সেই সুধাকে সাধারণ বিকৃত অন্নে পর্য্যবসিত করে। ভগবানের আপ্যায়ন পুরুষমেধ যজ্ঞ। পাখীর শব্দ আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আমার আত্মার কাছে গিয়া পরা অবস্থা যে লাভ করিল তাহা হইল নরমেধ যজ্ঞ। আবার সেই শব্দ কিরূপে পাখীর পরা তত্ত্ব হইতে রওনা হইয়া তাহার মুখের বৈখরী তত্ত্ব দিয়া বাহিরে আসিল তাহা হইল পুরুষমেধ যজ্ঞ।

অগ্নির কাজ Distil করিয়া শুদ্ধ করা, Evolution এ সাহায্য করা, অন্নকে সুধায় পরিণত করা। সেই অন্ন আবার বিপরীত ক্রমে আস্তে আস্তে জীব জগদ্রূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়। অগ্নি সেই পরিণাম বা বিবর্ত্তন দূর করিয়া

করিতে হইবে। এই আহুতির ফলে ব্রহ্মজ্যোতি তখন আমাদের সংস্কার-জনিত উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন।

অনাহতচক্রে : —ওঁ অগ্নে ত্বমেব দেবস্য প্রাণোঽসি।
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ প্রাণরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৩

তারপরে চিত্তকে অনাহতচক্রে অবতরণ করাইয়া সেখানে অগ্নির প্রাণরূপে আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই প্রাণরূপে আবির্ভূত ব্রহ্মকে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ইহার ফলে আমাদের প্রাণতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে।

মণিপুরে : ওঁ অগ্নে ত্বমেব বৈশ্বানরোঽসি।
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ বৈশ্বানররূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৪

চিত্তকে মণিপুরে লইয়া গিয়া অগ্নিকে বৈশ্বানররূপে সমস্ত দেহের চালকরূপে অনুভব করিয়া অগ্নিকে বৈশ্বানররূপী ব্রহ্ম জানিয়া আহুতি দিতে হইবে। ইহার ফলে বৈশ্বানরের প্রকৃত তত্ত্ব কার্য্যকলাপ অনুভবে আসিবে।

অন্নকে সুধায় রশ্মিতে পরিণত করে। সেখানে গিয়া অন্ন এবং অন্নাদের, প্রাণ এবং রয়িব, অহং এবং ইদং-এর একত্ব সাধিত হয়। অগ্নির কাজ তাহাতে অর্পিত দ্রব্যকে শুদ্ধ করা, তাহাকে তাঁহার সুন্দররূপে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ করা। আমরা এই উদ্দেশ্যে দ্রব্যকে যজমানকে-যজমানের প্রতীককে অগ্নিতে (আহুতি) দেই। আহুতির ফলে God the Son, God the Father-এ অর্থাৎ ত্বং-পদার্থ তৎ-পদার্থে গিয়া পরিণত হয়। [অগ্নিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য]

মূলাধারে :—ওঁ অগ্নে ত্বমেবায়ং প্রজ্বলিতো বহ্নিরসি।
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ বহ্নিরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৫

মূলাধারে নামিয়া সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকে সেই বহ্নির প্রতিরূপ জানিয়া স্থূল অগ্নিকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া তাহাতে হবন করিতে হইবে। তখন এই বহ্নির ভিতরে সমস্ত বহ্নিতত্ত্ব আবিভূত হইযা প্রতীকের আহুতিগুলি ব্রহ্মের আহুতিরূপে অনুভবে আসিবে। তখন এই অগ্নি ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হইবে।

ওঁ অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,
অস্য অগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু,
যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ,
যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়
স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ,
অয়মেব স যো অয়মাত্মা,
ইদং ব্রহ্ম ইদমমৃতম্ ইদং সর্বং স্বাহা ॥ ৫৬

অয়ম্ অগ্নিঃ (এই সন্নিহিত অগ্নি) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু (যাবৎ ভূতগণের প্রিয় বস্তু) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল সৃষ্ট পদার্থ) অস্য অগ্নেঃ মধু (এই অগ্নির প্রিয় বস্তু) অস্মিন্ অগ্নৌ (এই অগ্নিতে) যঃ চ অয়ম্ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (যিনি সাক্ষাৎ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বর্ত্তমান ইনি একজন মহা শক্তিধর পুরুষ, শুধু জড় পদার্থমাত্র নহেন) যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং (এবং সেই পুরুষ এই অগ্নির আত্মরূপে ইহার সব

অণু পরমাণুতে অনুস্যূত) বাঙ্ময়ঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (যিনি কেবল বাক্ তেজ ও অমৃতদ্বারা গঠিত, যিনি আবার অধ্যাত্মরূপে জ্যোতির্ম্ময় বাক্যরূপে অমৃতরূপে, আনন্দরূপে প্রকটিত) অয়ম্ এব সঃ (ইনি সেই দেবতাই) যঃ অয়ম্ আত্মা) যিনি এই [আমারও] আত্মা) ইদং ব্রহ্ম (ইনিই ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত) ইদম্ অমৃতং (ইনিই অমৃত পুরুষ) ইদং সর্ব্বং (ইনিই আমার সর্ব্বস্ব) স্বাহা (সেই জন্য আমি এই অগ্নিতে আমার পৃথক্ সত্ত্বাবোধকে আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিতেছি)।

এখানে এই অগ্নিতত্ত্বই যে আমাদের ভিতরকার সারতত্ত্ব জ্ঞানের ও আনন্দের মূল প্রস্রবণ সমস্ত শক্তির চালক তাহা অনুভব করিয়া এই অগ্নির নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া আমরা অগ্নিতে তন্ময়তা লাভ করিয়া অগ্নির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব।

অখিল ভুবন-গর্ভে বর্তসে চিৎস্বরূপো
বিলসতি বিভব স্তে স্থূলসূক্ষ্মঃ পরশ্চ।
অনলবপুরিহ ত্বং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষরূপং
স খলু নিবস যজ্ঞে সাধু হব্যং গৃহাণ ॥ ৫৭

[হে অগ্নি] অখিলভুবনগর্ভে (তুমি সকল ভুবনে) চিৎস্বরূপঃ বর্ত্তসে (চৈতন্য জ্যোতিরূপে বিরাজ করিতেছ) স্থূলসূক্ষ্মঃ পরশ্চ (স্থূল সূক্ষ্ম এবং তৎপর কারণ জগৎ) তে বিভবঃ বিলসতি (তোমারই বিভূতি প্রকাশ পাইতেছে)। ইহ ত্বং অনলবপুঃ (এই যজ্ঞস্থলে তুমি স্থূল অগ্নি-শরীরে) প্রত্যক্ষরূপং ব্রহ্ম [অসি] (প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত আছ)। সঃ খলু (এতাদৃশ তুমি) যজ্ঞে নিবস

(আমাদের এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হও) হবাং সাধু গৃহাণ (এবং আমাদের হুত দ্রব্যাদি সম্যক্‌প্রকার গ্রহণ কর)।

চিত্তস্য নঃ সকল-ভাব-ময়ঃ প্রপঞ্চো
যৈষা ক্রিয়া প্রবিততা খলু প্রাণমূলা।
হব্যেন মে তদখিলং ত্বয়ি চাস্তু দত্তং
স্পষ্টীকুরুষ্ব ময়ি তে নরমেধযজ্ঞম্ ॥ ৫৮

নঃ চিত্তস্য (আমাদের চিত্তের) সকলভাবময়ঃ প্রপঞ্চঃ (সমুদয় ভাবনাময় প্রপঞ্চরাশি) [তথা] খলু (আর সেইরূপ) প্রাণমূলা (প্রাণ-স্পন্দমূলক) প্রবিততা যা এষা ক্রিয়া (নানাপ্রকার এই যে ক্রিয়া) মে তৎ অখিলম্ (আমার সেই সমুদয়) হব্যেন (হব্যরূপ প্রতীকদ্বারা) ত্বয়ি (তোমাতেই) দত্তম্ চ অস্তু (অর্পিত হউক)। ময়ি (আমার নিকটে) তে নরমেধযজ্ঞম্ (তোমার নরমেধ যজ্ঞতত্ত্ব) স্পষ্টীকুরুষ্ব (প্রকট করিয়া দাও)।

যচ্চাস্মাকং হুতং দ্রব্যং যচ্চাস্তি ভাবনাত্মকম্।
তাভ্যাং শুদ্ধিঃ সদা চাস্তু স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরয়োঃ ॥ ৫৯

অস্মাকং যৎ চ হুতং দ্রব্যং (আমাদের যাহা কিছু আহুত স্থূল দ্রব্য) যৎ চ ভাবনাত্মকং [দ্রব্যং] অস্তি (আর যাহা কিছু ভাবনাময় আহুতি আছে) তাভ্যাং (তদুভয় দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা) স্থূলসূক্ষ্মশরীরয়োঃ (ক্রমে স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের) পুষ্টিঃ অস্তু চ (পুষ্টি সাধিত হউক)।

ওঁ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ৬০

অগ্নে অস্মান্ নয় (হে অগ্নি আমাদিগকে লইয়া চল) সুপথা (সুন্দর পথে, দেবযানমার্গে) রায়ে (ধনের, কর্ম্মফলপ্রাপ্তির জন্য) দেব [ত্বং] বিশ্বানি বয়ুনানি (সমস্ত কর্ম্মাদি) বিদ্বান্ (অবগত আছ) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল, অপকারী) এনঃ (পাপ) যুযোধি (নাশকর) তে ভূয়িষ্ঠাং নম-উক্তিং বিধেম (তোমাকে প্রভূত নমস্কারবচন প্রেরণ করিতেছি)।

হে অগ্নি, তুমি আমাকে হাত ধরিয়া আমার প্রিয়তমের নিকট লইয়া চল। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করিলাম। তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে আর দ্বিধা বোধ করিব না।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ
সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ॥ ৬১

বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ (হে অগ্নি, তুমি বৈশ্বানর, জাতবেদ লোহিতাক্ষ বিবিধ নামে সুপরিচিত) ইহ আবহ (আমাদের এই যজ্ঞস্থলে দেবগণের সহিত অবতীর্ণ হও) সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা (সমুদয় কর্ম্ম আমাদেব দ্বারা সাধন করাইযা লও, আমরা তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি)।

হে অগ্নি, তুমি তোমার গুণাতীত স্বরূপ হইতে আবির্ভূত হইয়া একটু রজোগুণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া তোমার ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে আমাদের দ্বারা সকল কর্ম্ম সাধিত করিয়া লও।

৮। শুদ্ধিঃ—শুদ্ধিতত্ত্ব এখানে চিন্তনীয় (দ্রষ্টব্য "পূজা")। আমাদিগকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি দেওয়া হইয়াছিল-এই সব তত্ত্বে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়া এই সব তত্ত্বকে ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত,

ভগবৎশক্তিতে শক্তিযুক্ত করিয়া ইহাদিগকে ভগবৎকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিবার জন্য। অজ্ঞান, সংস্কার, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রতিষ্ঠার মোহ আদি দ্বারা আমরা এই তত্ত্বগুলিকে মলিন করিয়া বসিয়াছি। তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন ও দিব্যদর্শন আমাদের আর নাই। অথচ দিব্যদর্শন লাভ না হইলে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। তাই যোগবিশেষের ক্রিয়া ও ধ্যানাদির সাহায্যে আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে, পঞ্চভূতকে, পঞ্চভূতের সহিত দেহাদির ক্রিয়াগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আধার প্রস্তুত না হইলে ভগবানকে ধারণ করিব কি করিয়া? মনে রাখিতে হইবে যে আদর্শ নর ভগবানের সখা অর্জ্জুন পর্য্যন্ত দিব্যচক্ষু পাইয়াও ভগবজ্জ্যোতি সহ্য করিতে পারেন নাই। শুদ্ধিতত্ত্বে কিভাবে চিত্তকে সব সংস্কার, কামনা, বাসনা, আসক্তি, প্রতিষ্ঠার মোহ ও অহংকার শূন্য করিয়া ভগবৎ-মহিমা বুঝিবার যোগ্য করা যায় তাহার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জলশুদ্ধির ভিতরে দেহশুদ্ধির, আসনশুদ্ধির ভিতরে স্থৈর্য্য লাভের, ভূতশুদ্ধির ভিতরে আত্মাকে দেহাধ্যাস মুক্ত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

ওঁ অগ্নে ত্বং সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ।
অতঃ শোধয় চিত্তং মে যেন সত্যং বিভর্ম্যহম্॥ ৬২

অগ্নে (হে অগ্নি) ত্বং পাবকঃ [সন্] (তুমি পবিত্রতাসম্পাদকরূপে) সর্ব্বভূতানাং অন্তঃ চরসি (সকল জীবের অভ্যন্তরে বিচরণ কর)। অতঃ (অতএব) মে চিত্তং শোধয় (আমার চিত্ত বিশোধিত করিয়া দেও)। যেন (যাহাতে) অহং সত্যং বিভর্ম্মি (আমি সত্যস্বরূপকে ধারণ করিতে পারি)।

ওঁ শিরঃ-পানি-পাদ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠোদর জঙ্ঘা-
শিশ্নোপস্থ-পায়বো মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥৬৩

আমার মস্তক হস্তপদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর জঙ্ঘা শিশ্ন উপস্থ পায়ু সমুদয় বিশোধিত হউক। অহং জ্যোতিঃ (আমি জ্যোতিস্বরূপ) বিরজাঃ (রজোবিমুক্ত) বিপাপ্মা (নিষ্পাপ) ভূয়াসম্ (যেন হইতে পারি)।

আমার সমুদয় দেহ-তত্ত্ব পরিশুদ্ধ হইয়া যেন তোমাকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

ওঁ ত্বক্-চর্ম-মাংস রুধির-মেদো-মজ্জা-
স্নাযবস্থীনি মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৪

আমার ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু এবং অস্থি-সমূহ পরিশুদ্ধ হউক, তোমাকে ধারণ করিবার যোগ্যতলাভ করুক ইত্যাদি।

ওঁ পৃথিব্যপ-তেজো বাযবাকাশা মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৫

আমার শরীরস্থ পৃথ্বীতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব পরিশুদ্ধ হউক। আমি যেন জ্যোতিস্বরূপ হইয়া নির্ম্মল নিষ্পাপ হইতে পারি। তন্নিমিত্ত হে অগ্নিদেব, তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি।

ওঁ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৬

আমার দেহস্থ শব্দস্পর্শরূপরস এবং গন্ধ পরিশুদ্ধ হউক। ইত্যাদি

ওঁ মনো বাক্ কায় কর্মাণি মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৬৭

আমার মন বাক্য কায় এবং কর্ম্মসমূহ শুদ্ধ হউক। ইত্যাদি

ওঁ প্রাণাপান ব্যান সমানোদানা মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৬৮

আমার প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ শুদ্ধ হউক। ইত্যাদি

ওঁ বাঙ্-মনশ্-চক্ষুঃ শ্রোত্র জিহ্বা ঘ্রাণ
রেতো বুদ্ধ্যাকুতি সঙ্কল্পা মে শুধ্যন্তাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৬৯

আমার বাক্যমন চক্ষু শ্রোত্র জিহ্বা নাসিকা রেত বুদ্ধি প্রার্থনা এবং সংকল্প পরিশুদ্ধ হউক—ইত্যাদি।

ওঁ আত্মা মে শুধ্যতাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৭০

আমার আত্মা শুদ্ধ হউক, ইত্যাদি।

ওঁ পরমাত্মা মে শুধ্যতাম্।
ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৭১

আমার পরমাত্মা শুদ্ধ হউক, ইত্যাদি।

আত্মা ও পরমাত্মা শুদ্ধি শব্দের অর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে ভুল সংস্কার দূর করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা।

জ্যোতিরহং ইত্যাদি—আমি জ্যোতির্ম্ময জ্ঞানময় পুরুষ, বহির্মুখীন প্রবৃত্তিরহিত, মোহতমোগুণবর্জ্জিত যেন হইতে পারি—এই প্রার্থনা লইয়া আমার সমস্ত মলিনতা, কামনা, বাসনা, হে অগ্নি তোমাতে সমর্পণ করিতেছি। ইহারা আত্মলাভের সহায হউক। ইহারা এতদিন ভোগ-লালসা লইয়া ব্যস্ত ছিল, এখন ইহারা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হউক।

ওঁ ক্ষুৎপিপাসে ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা॥

ক্ষুৎপিপাসাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে আমি এই হবির অংশ অর্পণ করিতেছি।

ওঁকামঃ কামায় স্বাহা। ওঁ ক্রোধঃ ক্রোধায় স্বাহা।
ওঁ লোভঃ লোভায় স্বাহা। ওঁ মোহঃ মোহায় স্বাহা।
ওঁ মদঃ মদায় স্বাহা। ওঁ মাৎসর্য্যং মাৎসর্য্যায় স্বাহা।
ওঁ কামনা কামনাটয় স্বাহা। ওঁ বাসনা বাসনাটয় স্বাহা।
ওঁ অহঙ্কারঃ অহঙ্কারায় স্বাহা। ওঁ আসক্তিঃ আসক্ত্যৈ স্বাহা।

ওঁ সুখস্পৃহা সুখস্পৃহাটয় স্বাহা। ওঁ লোকৈষণা লোকৈষণাটয় স্বাহা।
ওঁ মমতা মমতাটয় স্বাহা। ওঁ অহন্তা অহন্তাটয় স্বাহা॥

(সমুদয় মন্ত্রার্থ)—ভগবদ্দত্ত কামাদি সব প্রবৃত্তির ভিতরে অজ্ঞান সংস্কার ও লোভবশতঃ যে সব আগন্তুক মলিনতা আসিয়া জুটিয়াছে

অগ্নিতে এই সব আহুতি দ্বারা সেই সব ময়লা দূর করিয়া এই সকলকে শুধু ভগবদ্‌উদ্দেশ্য পূরণে নিযুক্ত করি। ।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

পঞ্চ প্রাণাদি আহুতি দেওয়ার অর্থ— ইহারা আপন আপন কার্য্য সাধনে সমর্থ হউক। ইহাদের কার্য্য সাধনে বাধা দূর হউক।

ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা *, ওঁ জীবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা।।৭২

ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ঋষিগণ তখন তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত ব্রহ্ম-বিদ্যা স্ফুরিত করুন। পিতৃভ্যঃ স্বাহা—পিতৃগণ অভাবমুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের নিকট শুদ্ধস্বরূপে প্রকট হইয়া আমাদের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করুন। পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের সব ভুল ধারণা দূর করিয়া পরমাত্মা প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে অগ্নি আমাদিগকে সাহায্য করুন।

৯। <u>ইষ্টদেবতার হোম :—</u>

তত্ত্বগুলি ও তাহাদের বৃত্তিগুলি শুদ্ধ হইয়া গেলে তখন সাধকের

---

* পিতৃভ্যঃ স্বাহা—এই মন্ত্রে দুইটী ভাব নিহিত আছে।

(১) পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা, তাঁহাদের অভাব দূর করা। দ্রব্য দ্বারা, ভাবের দ্বারা তাঁহাদের পুষ্টি বিধান করা, তাঁহাদিগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

(২) পিতৃগণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, আমাদের অনুভূতি, আমাদের জ্ঞানকে শুদ্ধ করা। পিতৃগণের প্রকৃতস্বরূপ অবধারণ করা।

নিকট আপন আপন ইষ্টতত্ত্বের স্ফুরণ আরম্ভ হয়। ইষ্টদেবই আমাদের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মূল প্রস্রবণ; সে তত্ত্ব তখন অনুভব করিয়া আপন আপন ইষ্টের নিকট আত্মনিবেদন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বুঝিতে পারা যায় যে তিনিই সব হইয়াছেন, তিনিই সব করিতেছেন, আমরা শুধু বৃথা অহঙ্কারের বশে এতদিন কষ্ট পাইতেছিলাম। ইষ্টদেবের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া সাধক ইষ্টময় হইয়া পড়েন। সাধক নিজে দেব-ভাবাপন্ন না হইলে যে দেবতার পূজা অসম্ভব হয়।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥
ওঁ হূং জুং সঃ ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা॥ ৭৩

সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং ত্র্যম্বকং (শোভনগন্ধযুক্ত, পুষ্টি ও অভ্যুদয় প্রদান-কারী ত্র্যম্বক ভগবান মহামৃত্যুঞ্জয় শিবকে) যজামহে (আমরা আরাধনা করিতেছি)। [সঃ মাং] মৃত্যোঃ বন্ধনাৎ (তিনি আমাকে মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে) উর্বারুকম্ ইব (সুপরিপক্ব ফুটির ন্যায় অর্থাৎ পরিপক্ব ফুটি যেমন অনায়াসেই বৃন্তচ্যুত হয় তেমন ভাবে) মুক্ষীয (মুক্ত করুন) মা অমৃতাৎ (অমৃত হইতে যেন আমি কখনও বিচ্যুত না হই)।

ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা)॥ ৭৪
ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা॥ ৭৫

শিব কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতির মধ্যে যাঁহার যাহা ইষ্ট তিনি তাঁহার হবন করিবেন। ইহার ফলে সাধক ইষ্টময় হইয়া পড়েন।

১০। আবরণমোচন :—

এ সময় সাধক যেন তাঁহার ও শ্রীভগবানের ভিতরকার সামান্য

ব্যবধানটুকুও আর সহ্য করিতে পারেন না। তাই হিরণ্ময় আবরণটুকুও দূর করিয়া দিবার জন্য তখন প্রার্থনা আরম্ভ হয়। এই আবরণ দূর করা সাধকের হাতে নাই— ইহা ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। গোপীদের বস্ত্রহরণ তত্ত্ব এখানে চিন্তনীয়। মনে রাখিতে হইবে গোপীদের বস্ত্র হইল পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরীরূপ আবরণ—যাহা দূর হইলে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, ভগবৎ-অনুভূতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

তখনকার অবস্থা পদাবলীর "রূপে ভরল দিঠি" আদি সঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

ওঁ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ৭৬

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা, জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা) সত্যস্য মুখং অপিহিতং (সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে) পূষন্ (হে পূষাদেব) ত্বং (তুমি) সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে (আমার সত্যধর্ম্মের দর্শনের নিমিত্ত, সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর আমার নিকট হইতে) তৎ (সেই আবরণটি) অপাবৃণু (উন্মোচন করিয়া দেও)। এ সময় যে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সামান্য ব্যবধানও আর সহ্য করা যায় না।

১১। মহাব্যাহৃতি হোমঃ—(মহা-আকর্ষণ অনুভূতি)। শুদ্ধ লৌহ যেমন চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত সাধকও তখন সব দিক হইতে ভগবানকর্তৃক আকৃষ্ট হন। এই সময় সাধক সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া ভগবৎ-আহ্বান, ভগবানের মুরলীধ্বনি শুনিয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন।

মহাব্যাহৃতি—মহা-আকর্ষণ অনুভব করিয়া সাধক সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করেন।

ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে।
ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা ইদং
পরমজ্যোতিষে॥ ৭৭

ভূঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে* (পৃথিবীর উদ্দেশ্যে হুত এই আহুতি তদভিন্ন অগ্নিদেবতার নিকট পৌঁছুক) ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে * (অন্তরীক্ষলোকোদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি তদভিন্ন বায়ুদেবতায় সমর্পিত হউক) স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্য্যায় * (স্বর্গলোকোদ্দেশ্যে হুত এই হবি দ্যুলোকস্থান সূর্য্যদেবে সমর্পিত হউক), ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইদং পরমজ্যোতিষে (আর এই ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে প্রদত্ত হবি পরমজ্যোতিস্বরূপ পরম ব্রহ্মে সমর্পিত হউক)। এ সময় সাধক সকল শব্দস্পর্শাদির ভিতর দিয়া ভগবানের আহ্বান শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়েন।

১২। শুদ্ধ চিত্তকে ভগবদ্ভাব দ্বারা পরিপূরণ :—

এতক্ষণ আধারটি সংস্কার-গোবর দিয়া পরিপূর্ণ ছিল, তাই শ্রীভগবান সেই আধারটিকে তাঁহার অমৃতদ্বারা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এখন আধারটি শুদ্ধ হওয়ায় অমনি ভগবৎ-ভাবদ্বারা ভগবৎ-শক্তি দ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়া উঠিল। সব তত্ত্বগুলি তখন দিব্যদর্শন আদি লাভ করিয়া ভগবৎকৃপায় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলে সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন তখন স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

---

* অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং......॥—মনু।

কামাদিকা রিপুগণা মহসৈব নষ্টাঃ
প্লুষ্টাশ্চ মে হৃদিশয়াঃ সকলাস্তু কামাঃ।
শূন্যং মদীয়হৃদয়ং করুণাময় ত্বম্
ঐশেন ভাব-নিচয়েন প্রপূরয়স্ব ॥ ৭৮

মহসা এব (তোমার তেজের দ্বারাই) কামাদিকাঃ রিপুগণাঃ (আমার কামাদি রিপুগণ) নষ্টাঃ (বিনষ্ট হইয়াছে)। মে হৃদিশয়াঃ (আমার হৃদয়স্থ) সকলাঃ কামাঃ তু (সমুদয় কামাদিও) প্লুষ্টাঃ চ (বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে)। করুণাময় ত্বং (হে করুণাময় অগ্নিদেব, তুমি) শূন্যং মদীয়হৃদয়ং (এখন রিক্ত আমার এই হৃদয়কে) ঐশেন ভাবনিচয়েন (ঐশ্বরিক ভাবনিচয় দ্বারা) প্রপূরয়স্ব (পরিপূর্ণ কর)।

ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ শুদ্ধোঽসি শুদ্ধিং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ বুদ্ধোঽসি বুদ্ধিং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ মুক্তোঽসি মুক্তিং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ শান্তোঽসি শান্তিং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ শিবোঽসি শিবং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ সুন্দরোঽসি সৌন্দর্য্যং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ সত্যমসি সত্যং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ জ্ঞানমসি জ্ঞানং ময়ি ধেহি স্বাহা।
ওঁ আনন্দোঽসি আনন্দং ময়ি ধেহি স্বাহা ॥৭৯

তুমি বলস্বরূপ, আমাতে বল আধান কর। তুমি বীর্য্যস্বরূপ আমাতে বীর্য্য আধান কর। তুমি সহ্য করিবার শক্তি স্বরূপ, আমাতে সহ্যশক্তি আধান কর। তুমি তেজস্বরূপ আমাতে তেজ আধান কর। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ, তুমি আমাতে শুদ্ধি—বুদ্ধি—মুক্তি আধান কর। তুমি শান্ত শিব সুন্দর, তোমার শান্তি, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য আমাতে আধান কর। তুমি সত্য জ্ঞান আনন্দস্বরূপ- আমাতে সত্য জ্ঞান আনন্দ আধান কর।

১৩। দ্বন্দ্বভাব দূরীকরণ ঃ—

দ্বন্দ্বভাব ভেদভাব দূর না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। এখন সাধকের চিত্ত হইতে যাবৎ দ্বন্দ্বভাব যেন আপনা হইতে দূর হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দ্বন্দ্বভাব দূর হওয়ায় সাধক তখন অমূঢ় হইয়া ভগবানের অমরধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। "দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ" পদটি চিন্তনীয়।

ওঁ ধর্মায় স্বাহা। ওঁ অধর্মায় স্বাহা।
ওঁ বৈরাগ্যায় স্বাহা। ওঁ অবৈরাগ্যায় স্বাহা।
ওঁ জ্ঞানায় স্বাহা। ওঁ অজ্ঞানায় স্বাহা।
ওঁ ঐশ্বর্য্যায় স্বাহা। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় স্বাহা ॥ ৮০

১৪। ব্যাকুলতা প্রার্থনা ঃ—

এই সময় সাধকের ভগবানকে পূর্ণভাবে না পাইলে আর যেন চলে না। গোপীদের কৃষ্ণানুশীলন তত্ত্ব এখানে আস্বাদ্য। "চঞ্চল"মতি ধাওল অতি" সঙ্গীতটি এখানে আস্বাদনীয়। সাধক এখন যাঁহাকে দেখেন তাঁহার

নিকটেই প্রিয়তমের সন্ধান লন—নিজের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'ইতররাগবিস্মরণ' সিদ্ধ হইয়াছে—ভগবান ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না, আর কিছুই চাই না। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর এই ভাব উদয়ের সময় রাম রায়, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তদের অতি কষ্টে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইত। এ সময় আরম্ভ হয় ব্রজগোপীর ন্যায় সকল পদার্থের নিকট ভগবদ্দর্শন করাইয়া দিবার জন্য কাতর প্রার্থনা।

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ অগ্নি র্মা তত্র নয়ত্বগ্নি র্মেধা দধাতু মে
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ইদন্ন মম॥ ৮১

যত্র (যেখানে) ব্রহ্মবিদঃ দীক্ষয়া তপসা সহ (দীক্ষিত হইয়া তপোবলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ) যান্তি (গমন করিয়া থাকেন) অগ্নিঃ (অগ্নিদেব) মা তত্র নয়তু (আমাকে সেখানে লইয়া যাউন)। অগ্নিঃ মে মেধাঃ দধাতু (অগ্নি আমাকে মেধা প্রদান করুন)। অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নিতে হবন করিলাম) ইদম্ অগ্নয়ে (ইহা যে অগ্নিরই ইদং ন মম (ইহা আমার নহে)। এইরূপ ৮৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র।

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ বায়ু র্মা তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্ দধাতু মে
ওঁ বায়বে স্বাহা ইদং বায়বে ইদন্ন মম॥ ৮২
ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ সূর্য্যো মা তত্র নয়তু চক্ষুঃ সূর্য্যো দধাতু মে
ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা ইদং সূর্য্যায় ইদন্ন মম॥ ৮৩

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ চন্দ্রো মা তত্র নয়তু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে
ওঁ চন্দ্রায় স্বাহা ইদং চন্দ্রায় ইদন্ন মম ॥ ৮৪

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ সোমো মা তত্র নয়তু পয়ঃ সোমো দধাতু মে
ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায় ইদন্ন মম ॥ ৮৫

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ ইন্দ্রো মা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু মে
ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায় ইদন্ন মম ॥ ৮৬

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ আপো মা তত্র নয়ন্তু অমৃতং মোপতিষ্ঠতু
ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা ইদমদ্ভ্যঃ ইদন্ন মম ॥ ৮৭

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ ব্রহ্মা মা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে
ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইদং ব্রহ্মণে ইদন্ন মম ॥ ৮৮

প্রাণান্ (প্রাণশক্তি)…সোমঃ (সোমদেবতা) ।

পয়ঃ (প্রাণসঞ্জীবনরস)…অমৃতং (অমরত্ব) মা উপতিষ্ঠতু (আমার নিকট উপস্থিত হউক) । মে ব্রহ্ম দধাতু (আমাকে বেদজ্ঞান প্রদান করুন) ।

১৫ । সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন ঃ—

তখন আর ভগবান কি করিয়া দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন। অহংকাররূপ ব্যবধান দূর হওয়ায় তখন ভগবান সাধকের ভিতর দিয়াই

আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার ভিতর বাহির ভগবদ্‌ভাবে পরিভাবিত হওয়ায় তখন যে তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না। তখন ভগবান কৃপা করিয়া আবির্ভূত না হইয়া আর থাকিতে পারেন না। ভাগবতের "তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ" শ্লোকটি এখানে আস্বাদনীয়। তখন যে "জিতো জিতো দেখো শ্যামময়ী হৈ।" তখন সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন, সর্ব্বত্র নতি, সর্ব্বত্র আত্মানুভূতি যে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ দিবে স্বাহা। ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা। ওঁ নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ রুদ্রায় স্বাহা। ওঁ পশুপতয়ে স্বাহা। ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা। ওঁ ভূতানাং পতয়ে স্বাহা। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ওঁ নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ দশদিক্‌পালেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ভূতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ মনুষ্যেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ পরমেষ্ঠিনে স্বাহা॥ ৮৯

<u>১৬। ভাবনাত্মক যজ্ঞ ঃ—</u>

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ পর্য্যন্ত জীবের কাজ। এখানে সব তত্ত্ব শুদ্ধ হওয়ায় ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ হয়। চিত্ত জগতের দিক দিয়া শূন্যে পরিণত হওয়ায় ভগবান তখন ভগবদ্ভাব দ্বারা সেই চিত্ত পূর্ণ করিয়া দেন। সাধক তখন ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া ভিতরে বাহিরে ভগবানের কার্য্যকলাপ, ভগবল্লীলা দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। এখানে পর্য্যন্ত ধ্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হয়। তখন আরম্ভ হয়

সামবেদের ভাবনাত্মক যজ্ঞ। সাধকের সব তত্ত্ব ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হওয়ার ফলে তখন নিজের প্রতিতত্ত্বে ভিতরকার সব ক্রিয়ায় ভগবানের কার্য্যকলাপ, তাঁহার যজ্ঞকাণ্ড অনুভবে আইসে। সাধক তাই নিজের ভিতরে ভগবানের লীলাদর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়েন। ধ্রুবের ন্যায় পাছে হারাইয়া যায়, তাই আর চোখ খুলিতে সাহস হয় না। তখন ভগবান যেন বাহিরে সর্ব্বত্র লীলানুভূতির জন্য জোর করিয়া সাধকের চোখ খুলিয়া দেন। তখন সাধক ভগবদ্ভাবে পূর্ণ পরিভাবিত হইয়া সব তত্ত্বে ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবানের লীলাদর্শন করিয়া সমাধি-মগ্ন হইয়া পড়েন। চোখ খুলিলে জাগ্রৎ সমাধি, চোখ বুজিলে তাঁহার স্বপ্ন সমাধি। তখন সাধক সচ্চিদানন্দ ভাস্বররূপ দর্শন করেন।

ওঁ সচ্চিদানন্দদেবেশো ভাস্বরঃ সর্ব্বরূপধৃক্।
সর্ব্বেষামন্তস্তিষ্ঠন্ হি গৃহ্নাতু হব্যমুত্তমম্॥ ৯০

সচ্চিদানন্দদেবেশঃ (সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ দেবগণেরও ঈশ্বর) ভাস্বরঃ (জ্যোতির্ম্ময়) সর্ব্বরূপধৃক্ (বিশ্বরূপ ভগবান) সর্ব্বেষাম্ অন্তঃ তিষ্ঠন হি (সকলের অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত হইয়া) উত্তমং হব্যং গৃহ্নাতু (এই উত্তম হবি গ্রহণ করুন)।

ত্বং সর্ব্বভূতেষু বিরাজসে সদা
সর্ব্বেষু জীবেষ্বসি জীবনং স্বয়ম্।
ত্বদ্দর্শনং সর্ব্বগ মেঽস্তু সর্ব্বত
স্তবৈব পূজাস্তু চ কর্ম্মভির্ম্মম॥ ৯১

ত্বং সর্ব্বভূতেষু সদা বিরাজসে (তুমি সকল সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে নিয়ত বিরাজমান আছ) সর্ব্বেষু জীবেষু স্বয়ং জীবনম্ অসি (সমুদয়

জীবের তুমি নিজেই জীবন) সর্ব্বগ (হে সর্ব্বগ,) ত্বদ্দর্শনং মে সর্ব্বতঃ অস্তু (তোমার দর্শন সর্ব্বপ্রকারে আমার হউক) মম কর্ম্মভিঃ (আমার সর্ব্বকর্ম্মদ্বারা) তব এব পূজা অস্তু চ (তোমারই পূজা হউক)।

যতো বা প্রসৃতং কর্ম্ম যতঃ পরিসমাপ্যতে।
স বৈ বিষ্ণুঃ স্বয়ং যজ্ঞঃ সকলং তস্য কর্ম্ম চ॥ ৯২

যতঃ বা কর্ম্ম প্রসৃতং (যাঁহা হইতে কর্ম্মের উদ্ভব) যতঃ পরিসমাপ্যতে (এবং যাঁহাতে কর্ম্মসমূহের পরিসমাপ্তি হইয়াছে) স বৈ বিষ্ণুঃ স্বয়ং যজ্ঞঃ (সেই বিষ্ণুই স্বয়ং যজ্ঞ) সকলং তস্য কর্ম্ম চ [যজ্ঞঃ] (আর তাহার সমুদয় কর্মও যজ্ঞ-স্বরূপ)।

কায়েন মনসা বাচা সকলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যদ্বৈ বিধীয়তেঽস্মাভিঃ তত্রাস্তু মখদর্শনম্॥ ৯৩

কায়েন মনসা বাচা (কায়মনোবাক্য দ্বারা) সকলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ বৈ অস্মাভিঃ বিধীয়তে (যাহা কিছু আমাদের কর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকে) তত্র মখদর্শনম্ অস্তু (তৎ সমুদয়ে যেন আমাদের যজ্ঞদর্শন হয়)। অর্থাৎ আমরা কায়মনোবাক্যে এবং ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা সমস্ত কার্য্যই যেন যজ্ঞজ্ঞানে সাধন করিতে পারি।

ওঁ যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
যৎ তপস্যামি গোবিন্দ তৎ করোমি ত্বদর্পণম্॥ ৯৪

যৎ করোমি (আমি যাহা কিছু করি) যৎ অশ্নামি (যাহা কিছু আহার করি) যৎ জুহোমি (যাহা কিছু আহুতি দেই) যৎ দদামি (যাহা কিছু দান করি) যৎ তপস্যামি (যাহা কিছু তপস্যা করি),

গোবিন্দ (হে গোবিন্দ) তৎ (তৎসমুদয়) ত্বদর্পণং করোমি (তোমাতেই সমর্পণ করিতেছি)।

ওঁ যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ॥ ৯৫

আমি যাহা কিছু করিয়াছি এবং যাহা কিছু করিব তৎসমুদয়ই পরমব্রহ্মে সমর্পিত হউক এতদুদ্দেশ্যে আমি আহুতি প্রদান করিতেছি।

ওঁ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৬

যতঃ বৈ (যাঁহা হইতে নিশ্চিতই) ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূতগণ) জায়ন্তে (জাত হয়) যেন জাতানি জীবন্তি (যাঁহার শক্তিতে জাত হইয়া বাঁচিয়া থাকে) যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি (যাঁহাতে প্রয়াণ করিয়া পরম বিশ্রান্তি লাভ করে) তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরব্রহ্মে আমি আহুতি প্রদান করি)।

ওঁ যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেব স্তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৭

যস্মিন্ সর্ব্বে (যাঁহাতে সবকিছুর স্থিতি) যতঃ সর্ব্বে (যাঁহা হইতে সবকিছুর উৎপত্তি) যঃ সর্ব্বঃ (যিনি সব, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছুর অস্তিত্ব) যঃ সর্ব্বতঃ চ (এবং যিনি সর্ব্বত্র, সবকিছু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন)

যঃ সর্ব্বময়ঃ দেবঃ চ (যিনি সর্ব্বময় দেবতা) তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমব্রহ্মে আহুতি প্রদান করি)।

যঃ পৃথিব্যামপ্‌সু অগ্নৌ বায়ৌ আকাশে প্রাণেষু মনসি বিজ্ঞানেঽন্তরিক্ষে দিবি আদিত্যে দিক্ষু চন্দ্রে তারাসু তমসি তেজসি চক্ষুষি শ্রোত্রে ত্বচি রেতসি বাচি গুরৌ পিত্রোঃ বন্ধুবান্ধবাদিসর্ব্বভূতেষু তিষ্ঠন্নেতেষাং সর্ব্বেষাম্ আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত স্তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥৯৮

যঃ যিনি) পৃথিব্যাং ইত্যাদি (পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সকল, চন্দ্র, তারকা, তমঃ, তেজ, চক্ষু কর্ণ, ত্বক, রেতঃ, বাক্, পিতৃগুরু, বন্ধুবান্ধবাদি সকল ভূতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত হইয়া) এতেষাং সর্ব্বেষাং আত্মা (এই নিখিল সমুদয়ের আত্মা) অন্তর্য্যামী (এবং অন্তর্য্যামী) [যঃ] অমৃতঃ (এবং যিনি অবিনাশী) তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে আমি হবি অর্পণ করিতেছি)।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
যমাত্মস্থমনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৯

যঃ একঃ অবর্ণঃ (যিনি অদ্বিতীয়, অরূপ) বহুধা শক্তিযোগাৎ (নানাবিধ যোগমায়া শক্তির প্রভাবে) নিহিতার্থঃ (তাবৎ পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি (বিচিত্র রূপ প্রদান করেন) ধীরাঃ আত্মস্থং যম্ অনুপশ্যন্তি (সমাহিতচিত্ত মুনিগণ যাঁহাকে আত্মস্বরূপে

উপলব্ধি করেন) তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমাত্মার তৃপ্তি বিধান জন্য আমি হবন করিতেছি)।

ওঁ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো
যদ্ বাচো হ বাচম্।
স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু
স্তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ১০০

যৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (যিনি কর্ণেন্দ্রিয়ের শ্রবণ শক্তি) মনসঃ মনঃ (মনের মননশক্তি) বাচঃ হ বাচং (বাগিন্দ্রিয়েরও নিশ্চিত বাক্‌শক্তি) স উ প্রাণস্য প্রাণঃ (তিনিই আবার প্রাণেরও স্পন্দনশক্তি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (নেত্রের দৃক্‌শক্তি)। তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করিতেছি)।

[অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ] সর্ব্বংবেদ্যং হব্যম্,
ইন্দ্রিয়াণি স্রুচঃ, শক্তয়ো জ্বালাঃ,
স্বাত্মা শিবঃ, পাবকঃ স্বয়মেব হোতা ॥ ১০১

অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা যাহা কিছু আমার জ্ঞানের বিষয় হয় তৎসমুদয়ই হবনীয় দ্রব্য। ইন্দ্রিয় সকল সেই হবনের অর্পণ (যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার পাত্রবিশেষ)। প্রাণাদি শক্তিসমুদয় সেই যজ্ঞাগ্নির শিখা, আমার আত্মা সেই হোমের মঙ্গল অগ্নি এবং আমি নিজে হোতা।

অন্তর্নিরন্তরম্ অনিন্ধনমেধমানে
মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত মরীচি-বিকাশভূমি
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্ ॥ ১০২

অন্তঃ (সাধকের অন্তঃকরণে, হৃদয়ে) নিরন্তরম্ (অবিচ্ছেদে, সর্ব্বদা) অানন্ধনম্ (ইন্ধনশূন্য হইয়াও) এধমানে (যাহা প্রজ্বলিত আছে, জ্বলন্ত মোহান্ধকারপরিপন্থিনি (মোহরূপ অন্ধকারের বিনাশক) অদ্ভুতমরীচি-বিকাশভূমৌ (দিব্যকিরণসমূহ অর্থাৎ মাতৃকাচক্র বিকশিত—অঙ্কুরিত হইয়া প্রসৃত হইতেছে যে ভূমি বা উৎস হইতে) কস্মিন্ চিৎ (লোকোত্তর) সংবিদ্-অগ্নৌ (সেই সংবিদ্‌রূপ অগ্নিতে) বসুধাদিশিবাবসানম্ (পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক) বিশ্বম্ (এই সর্ব্বতত্ত্বময়-প্রপঞ্চ) জুহোমি (আমি আহুতি দিতেছি)।

অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্যন্ত ৩৬ তত্ত্ব ও তদ্‌রচিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদ্‌অগ্নিতে – বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যরূপ অনলে আহুতি দিতেছি। মোহান্ধকারনাশক ও অলৌকিক রশ্মি বিস্তারকারক এই জ্বলন্ত অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তত্ত্বাতীত অখণ্ডপ্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ধর্ম্মাধর্ম্ম হবি দীপ্তাবাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যং অক্ষবৃত্তী জুহোম্যহম্ ॥ * ১০৩

অহম্ (আমি) ধর্ম্মাধর্ম্মহবিঃদীপ্তৌ (ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ হবিঃ দ্বারা যাহা প্রদীপিত) আত্মাগ্নৌ (আত্মারূপ অগ্নিতে) মনসা স্রুচা (মনোরূপ স্রুক্ বা হাতা দ্বারা) সুষুম্না বর্ত্মনা (সুষুম্না নাড়ীপথে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অক্ষবৃত্তীঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে) জুহোমি (আহুতি দিতেছি)।

হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানম্ আত্মনা ॥ ১০৪
দ্বে আহুতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্রবিধানতঃ।
মমতাং প্রথমং হুত্বাহহন্তাঞ্চ জুহুয়াত্ততঃ ॥ * ১০৫

---

* তাৎপর্য্যার্থ গ্রন্থ শেষে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত হোমদ্বারা চেতনা অর্থাৎ দ্বৈতচেতনা জয় করিয়া—মনদ্বারা আত্মার ধ্যান করিবে।

অগ্নিহোত্র বিধান অনুসারে দুইটি আহুতি দিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথম মমতা আহুতি দিয়া পরে অহন্তাব আহুতি দিবে।

ইয়ং পৃথিবী, ইমা আপঃ, অয়মগ্নিঃ, অয়ং বায়ুঃ, অয়মাকাশঃ, অয়মাদিত্যঃ, অয়ং চন্দ্রঃ, ইয়ং বিদ্যুৎ, ইমা দিশঃ, অয়ং ধর্ম্মঃ, ইদং সত্যং, অয়ং মানুষঃ, ইমানি ভূতানি, অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, এতেষাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, য এতেষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, স এবাত্মা। অমৃতং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ ১০৬

অহন্তা-মমতা আহুতি দেওয়ার ফলে সাধক তখন সর্ব্বত্র একই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া সব কিছুতেই মধুব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন—জলস্থল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বতত্ত্বেই মধু—তখন নিজেও মধু এবং অন্য সব পদার্থও মধু। তখন সবই মধুময় হইয়া গিয়াছে। যাবৎপ্রপঞ্চ সর্ব্ববিধ বস্তুর মধ্যে সেই একই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাতেই সমস্ত আহুত হইতেছে।

১৭। ব্যষ্টি সমষ্টি হোম :—

ইহার পরে সাধকের ব্যষ্টি পঞ্চকোশ সমষ্টি পঞ্চকোশে আহুত হওয়ার ফলে তখন তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব আস্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। অনুভব করেন জগদ্ব্যাপী এক দেহ এবং তাহার ভিতরে দেহী পরমাত্মা অবস্থিত। জীব-জগৎ তখন যেন শ্রীভগবানের দেহ—তিনি ও তাঁহার দেহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ইহার পরে সেই

সমষ্টি কোশগুলি যেন পরস্পর উপরের কোশে আহুত হইয়া সব গিয়া একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ওঁ অন্নময়ায় স্বাহা ইদমন্নম্। ওঁ প্রাণময়ায় স্বাহা এষ প্রাণঃ। ওঁ মনোময়ায় স্বাহা এতন্মনঃ। ওঁ বিজ্ঞানময়ায় স্বাহা এতদ্বিজ্ঞানম্। ওঁ আনন্দময়ায় স্বাহা এষ আনন্দঃ। ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা এষ আত্মা॥ ১০৭

ওঁ অন্নময়ং প্রাণময়ায় জুহোমি স্বাহা। ওঁ প্রাণময়ং মনোময়ায় জুহোমি স্বাহা। ওঁ মনোময়ং বিজ্ঞানময়ায় জুহোমি স্বাহা। ওঁ বিজ্ঞানময়ং আনন্দময়ায় জুহোমি স্বাহা। ওঁ আনন্দময়ং পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা। ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম॥ ১০৮

অন্নময়কে প্রাণময়ে আহুতি দিতেছি ইত্যাদি ক্রমে অনুভবে আসিবে ইদং সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম এই সমস্তই ব্রহ্ম।

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ ১০৯

ওঁ অমৃতম্ উপস্তরণম্ অসি স্বাহা (হে অমৃত, তুমি নিম্ন আবরণস্বরূপ তোমাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি), ওঁ অমৃতম্ অপিধানম্ অসি স্বাহা (হে অমৃত তুমি উপরিতন আবরণস্বরূপ তোমাকে হবি প্রদান করিতেছি) ও ব্রহ্মণে স্বাহা—(সমস্তই ব্রহ্ম অতএব ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করিতেছি)।

১৮। কেবলাত্মক:

কেবলাত্মক যজ্ঞে ধ্যাতা ধ্যেয়ে সমাহিত হওয়ায় শুধু ধ্যেয় তত্ত্বের

বিলাস কিছু পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। ইহা অদ্বৈতসিদ্ধির পরকালীন অদ্বৈতের লীলার্থ কল্পিত দ্বৈতের বিলাস (লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্)। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ সাধারণতঃ দ্বৈতভাবে, ভাবনাত্মক যজ্ঞ অদ্বৈতভাবে, কেবলাত্মক যজ্ঞ অদ্বৈতের লীলাবিলাসরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন যে সবই রস সবই চিনি—ইদং বলিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা যে অহং-এরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন। মানুষ পশু পক্ষী আদি যদি থাকে তবে তাহার সবই যে চিনি নির্ম্মিত, মুখে দিলে শুধু চিনিই চিনি। সবই লীলার সহায় আনন্দের বর্দ্ধক মধুই মধু। তখন যে মধুরাধিপতেঃ সকলং মধুরম্। শব্দ মধুর, স্পর্শ মধুর, রূপ মধুর, গন্ধ মধুর—মধুরম্ ছাড়া আর কিছু অনুভবে আইসে না।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ ১১০
ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ ১১১

অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণযন্ত্র ব্রহ্ম) হবিঃ ব্রহ্ম (অর্পণের দ্রব্য ঘৃতাদিও ব্রহ্ম) ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। (যাহাতে হবন করা হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম, যাহা কর্ত্তৃক হবন করা হয় সেও ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নিতে হবনকারী ব্রহ্মদ্বারা হুত হয় (ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা তেন (এই ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী দ্বারা) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ (ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য হয়, ব্রহ্মই লাভ হয়।) এইরূপে জীবের ব্যষ্টি চেতনা এবং অনুভব সমষ্টি যাহা নিয়া জীব নিয়ত জগদ্ব্যবহার করে তাহা আর তুচ্ছ বস্তু নহে, পরিচ্ছিন্ন হইলেও কেবল চৈতন্য উপাদানেই

গঠিত—এই জ্ঞানে ইহাদিগকে একীভূত করিয়া সমষ্টি চেতনা সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারিলেই জীবযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইয়া যায়।

ওঁ অহং তে মধু ত্বং মে মধু ওঁ তুভ্যং স্বাহা ওঁ মহ্যং স্বাহা ওঁ প্রিয়ায় প্রাণায় স্বাহা ওঁ আত্মনে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে স্বাহা॥ ১১২

অহং তে মধু (আমিও তোমার নিকট মধুময়) ত্বং মে মধু (তুমিও আমার নিকট মধুময়) তুভ্যং স্বাহা মহ্যং স্বাহা (তোমাতেও আহুতি প্রদান করি, আমাতেও আহুতি প্রদান করি) প্রিয়ায় প্রাণায় স্বাহা (প্রাণস্বরূপ প্রিয় তোমাতে হবি আহুতি দেই) আত্মনে * পরমাত্মনে স্বাহা (আত্মা আর পরমাত্মা অভিন্ন—তদুদ্দেশ্যে হবি প্রদান করি) প্রিয়ায় ইত্যাদি (পরমাত্মাই প্রিয় প্রিয়তম এবং প্রাণ—তাহাতেই আহুতি প্রদান করি)।

---

*আত্মনে স্বাহা—ইহাতে দুইটী ভাব নিহিত আছে :—(১) অগ্নির ভিতর দিয়া অগ্নির সাহায্যে আত্মার তৃপ্তি বিধান করা, আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা, আত্মাকে সুখী করা। পরে আত্মা দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে আপ্যায়িত করা।

(২) আত্মা সম্বন্ধে আমার সব ভুল ধারণা ভুল সংস্কার দূর করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করা।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বী র্ন
সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌ
রস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥ ১১৩

বাতা (বায়ু) মধু ঋতায়তে (সকল ঋতুতেই মধু বহন করে) সিন্ধবঃ (নদীসকল) মধু ক্ষরন্তি (মধু ক্ষরণ করে) নঃ ওষধীঃ (আমাদের ঔষধি বৃক্ষগণ) মাধ্বীঃ সন্তু (মধুময় হউক) মধু নক্তম্ (রাত্রি মধুময় হউক) উত উষসঃ (ঊষাও মধুময় হউক) পার্থিবং রজঃ মধুমৎ (এ পৃথিবীর রজকণাসমূহ মধুময় হউক) দ্যৌঃ * মধু অস্তু (অন্তরীক্ষ মধুময় হউক) নঃ পিতা (আমাদের পিতৃলোক মধুময় হউক) নঃ বনস্পতিঃ মধুমান্ (আমাদের বনস্পতি মধুময় হউক) সূর্য্যঃ মধুমান্ অস্তু (সূর্য্যদেব মধুময় হউন) নঃ গাবঃ মাধ্বী ভবন্তু । আমাদের গোমাতাসকল মধুময় হউক) ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু (সর্ব্বত্র সকলই মধু কেবল মধু, মধু হউক)।

---

* বৈদিক ঋষির কল্পনায় দ্যৌঃ স্বয়ংই পিতা। অতএব দ্যৌঃ পিতা—এইরূপ সামানাধিকরণ্যে অর্থ হইবে ঐ যে আকাশ আমাদের পিতা ইত্যাদি। দ্যৌঃ অর্থ যদিও দ্যুলোক তথাপি এখানে আকাশই বিবক্ষিত। দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সাকার নিরাকারের এইরূপ পিতৃমাতৃ কল্পনা আগমাদিতেও প্রসিদ্ধ। আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা এই তন্ত্রবচন এই ভাবেরই দ্যোতক।

বৈদিক ব্যাখ্যানুসারে এইরূপ হইবে—নঃ পিতা দ্যৌঃ (ঐ যে দ্যৌঃ আমাদের পিতা) মধু অস্তু (মধুময় হউক)।

১৯। পূর্ণাহুতি ঃ—

এই সময় সাধকের সব ইন্দ্রিয় সব অনুভূতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং নিজে পূর্ণ হইয়া পূর্ণস্বরূপকে পূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। তখন সবই যে ভগবান হইতে আসিয়া আবার ভগবানে গিয়া লীন হইতেছে সে তত্ত্ব অনুভবে আইসে। তখন সব অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম যে ভগবানেরই লীলা—আমি বলিয়া যে পৃথক্ কেহ বা কিছু নাই সেই তত্ত্ব পূর্ণভাবে অনুভবে আসিয়া সাধকের সব আহুতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। ফলে শিবাবসান সব ইদং শিবে আহুত হইয়া পূর্ণাহন্তা শিবতত্ত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

**ত্বং পূর্ণোঽসি তব বিশ্বমিদং চ পূর্ণস্তাবকবিধির্যমনু-
প্রয়াস্তি।
ব্রহ্মাদ্যাদিবিষদো ভুবনেশ তুভ্যং দত্তং মেঽন্তিম
হবির্ময়িপূর্ণতাপ্ত্যৈ ॥ ১১৪**

ত্বং পূর্ণঃ অসি (তুমি পরিপূর্ণস্বরূপ) ইদং তব বিশ্বং চ পূর্ণ (তোমার এই বিশ্বও পূর্ণ) তাবকবিধিঃ পূর্ণঃ (তোমার বিধানও পূর্ণ) যং ব্রহ্মাদ্যাঃ দিবিষদঃ (যে বিধানকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও) অনুপ্রযান্তি (অনুবর্ত্তন করেন)। ভুবনেশ (হে অখিল ভুবনের অধিপতি) ময়ি পূর্ণতাপ্ত্যৈ (আমাতে পরিপূর্ণতার নিমিত্ত) মে অন্তিমহবিঃ (আমার এই অন্তিম হবি) তুভ্যং দত্তং (তোমাতেই প্রদত্ত হইতেছে)।

**ইদং মে হবনং কর্ম্ম তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্।
তর্পিতাঃ সন্তু জীবাশ্চ ত্বদিচ্ছয়া পূর্ণতামিয়াৎ ॥ ১১৫**

ইদং মে হবনং কর্ম্ম (আমার এই হবন কর্ম্ম) তুভ্যং সমর্পিতম্ অস্তু

(তোমাতেই সমর্পিত হউক) জীবাঃ চ তর্পিতাঃ সন্তু (ইহাদ্বারা তোমারই জীবগণের তৃপ্তি হউক) ত্বদিচ্ছা পূর্ণতাং ইয়াৎ (তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক)।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ১১৬

পূর্ণম্ অদঃ (ঐ পরমাত্মা পূর্ণ) পূর্ণম্ ইদং (এই বিশ্বসংসারও পূর্ণ) পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে (ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতেই এই পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে) পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় (পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে) পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)।

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অগম্য পরমাত্মসত্তা নিজের দ্বারা নিজে পরিপূর্ণ। পরমাত্ম উপাদানেই এই দৃশ্য বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ায় এই বিশ্ব বা বিশ্ববাসী জীবও পূর্ণ, পূর্ণতালাভের সম্পূর্ণ অধিকারী। এই পূর্ণব্রহ্ম নিজ উপাদানে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াও নিজ অঙ্গহানিরূপ দোষে বা বিকারে দুষ্ট বা বিকৃত হন না কারণ পূর্ণতা হইতে কিছু গৃহীত হইলেও সে সত্তার পূর্ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। জাগতিক বস্তুতে এতাদৃশ দোষ দৃষ্ট হইলেও পরমাত্ম ক্ষেত্রে এই দোষ হইবে চিরনির্মুক্ত ইহাই পরমাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-প্রসুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ওঁ ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা॥ ১১৭

ইতঃ পূর্ব্বং (পূর্ব পূর্ব কালে, পূর্ব জন্মেও) প্রাণ বুদ্ধি দেহ-

ধর্ম্মাধিকারতঃ (প্রাণ বুদ্ধি দেহ এবং ধর্ম্মের অধিকার অনুসারে) জাগ্রৎ স্বপ্নপ্রসুপ্ত্যবস্থাসু (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে) মনসা, বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদারেণ শিশ্না (মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্ন দ্বারা) যৎ স্মৃতং (যাহা কিছু স্মরণ করিয়াছি) যৎ উক্তং (যাহা বলিযাছি) যৎ কৃতং (যাহা কিছু করিয়াছি) তৎ সর্ব্বং (সেই সমস্তই) ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা (ব্রহ্মে অর্পিত হউক)।

মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ ওঁ পরব্রহ্মণে জুহোমি স্বাহা ॥১১৮

আমি আমার নিজকে এবং আমার বলিযা যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদযই পরব্রহ্মে আহুতি প্রদান করিতেছি।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা
ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ১১৯

পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত।

২০। বৈগুণ্য দূরীকরণঃ—

সাধক যতই উন্নত হউক না কেন তিনি তাঁহার কাজকে পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিতে পারেন না। পূর্ণ হইতে পারে একমাত্র পূর্ণস্বরূপের কাজ, জীবের কাজ দোষমিশ্রিত। তাই সব অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য দূরের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায। ভগবানের নামে সব বৈগুণ্য দূর হয়—অপূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত করে।

ওঁ কৃতেঽস্মিন্ হবন কর্ম্মণি যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে।
ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥ ১২০

অস্মিন্ হবন কর্ম্মণি কৃতে (আমার এই হবনকর্ম্মানুষ্ঠানে) যৎ বৈগুণ্যং জাতং (যে অঙ্গহানিজনিত দোষ হইয়াছে) তদ্দোষপ্রশমনায় (সেই দোষ উপশান্তির জন্য) অহং শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণং করিষ্যে (আমি শ্রীবিষ্ণু ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি)।

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং, ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব, পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ১২১

হে জনার্দ্দন, আমি মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন। তোমার কৃপায় যতটুকু তোমার পূজা করিতে পারিয়াছি তাহা তুমি পরিপূর্ণ করিয়া দাও।

২১। আরতি ঃ—

আরতির উপাদানগুলি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক। ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ গন্ধ, তাহার প্রতীকরূপে ধূপ-ধুনা ; অপ্‌তত্ত্বের প্রতীক জল ; তেজ তত্ত্বের প্রতীক প্রদীপ ; মরুৎতত্ত্বের প্রতীকরূপে চামর বা বস্ত্রের হাওয়া ; আকাশ তত্ত্বের গুণ শব্দ, তাহার প্রতীক শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি—যজ্ঞপতির নিকট অর্পণ করা হয়। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র—ইহার সাত্ত্বিক ভাব হইতে মনবুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার, রাজসিক ভাব হইতে পঞ্চপ্রাণ, তামসিক ভাব হইতে পঞ্চভূত—এক কথায় আমাদের সব তত্ত্ব যাহা কিছু, সে সব ভগবানে

নিবেদন করিবার ব্যবস্থা এই আরতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সব যে তাঁহার, তাঁহার লীলার উপযোগী করিবার জন্য—ইহা অনুভবে আসা চাই। রতি চরম মিলন পরম সামরস্যের উপলব্ধি। তাহার সঙ্গে যোগ হইয়াছে মর্য্যাদা ও অভিবিধি দ্যোতক 'আ'। প্রথম দ্বৈতভাবে মর্য্যাদার সহিত তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সহিত অভেদভাব উপলব্ধির ফলে গিয়া রতিতে পর্য্যবসিত হয়—অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ করে। এই আরতি যজ্ঞের শেষ কাজ—পূর্ণরূপে তাঁহার সহিত একতাবোধের বাচক।

গান ১ ঃ—

ওঁ জয় জগদীশ হরে, স্বামী জয় জগদীশ হরে।
ভক্ত জনন্ কে সংকট ক্ষণ মে দূর্ করে॥
ওঁ জয় জগদীশ হরে।

জো ধ্যাওয়ে ফল পাওয়ে দুখ বিনশে মনকা।
স্বামী দুখ বিনশে মনকা।
সুখ সম্পতি ঘর আওয়ে, কষ্ট মিটে তনকা॥
ওঁ জয় জগদীশ হরে।

মাত-পিতা তুম মেরে শরণ গহুঁ কিসকী।
তুম বিন আউর ন দুজা আস করুঁ জিসকী॥
তুম পূরণ পরমাত্মা তুম অন্তরযামী—
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তুম সবকে স্বামী॥
তুম করুণাকে সাগর তুম পালনকর্ত্তা।
ম্যাঁয় মুরখ খল কামী কৃপা করো ভর্ত্তা॥

তুম হো এক অগোচর সবকে প্রাণপতি।
কিস্‌বিধি মিলুঁ গুসাঁই তুমকো ম্যাঁয় কুমতি॥
দীনবন্ধু দুঃখহরতা রক্ষক তুম মেরে।
অপনে হাত উঠাও দ্বার পড়া তেরে॥
বিষয়বিকার মিটাও পাপ হরো দেবা।
শ্রদ্ধা ভক্তি বঢ়াও সব সন্তন কী সেবা॥

গান ২ ঃ— তাঁরে আরতি করে চন্দ্র-তপন,
দেব-মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে!
অনাদি কাল, অনন্ত গগন,
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ ওঠে সঘন,
আনন্দ নন্দ নন্দরে!
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ,
কত গীত কত ছন্দরে!
বিহগ-গীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়,
গাহে গিরি কন্দরে;
কত কত শত ভকত প্রাণ,
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,
টুটিছে মোহ-বন্ধ রে!

২২। অঞ্জলি ঃ—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো
দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চভূতং প্রণমাম্যনন্যঃ ॥
এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ আকাশাদ্যাত্মনে যজ্ঞেশ্বরায়
শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

পুষ্প আমাদের সমস্ত সদ্‌গুণের প্রতীক। বেলপত্র তিনগুণের—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন তত্ত্বের প্রতীক। এই অঞ্জলিপ্রদানের ভিতর দিয়া আমাদের সব গুণ, সব তত্ত্ব, সব ক্রিয়া ভগবানে অর্পিত হইয়া যায়। এসব যে তাঁহারই বিভূতি—তাঁহারই প্রকাশ তাহা অনুভবে আসে। তখন আর আমাদের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—অহংকার করিবার কিছুই থাকে না। তিনিই যে তখন সব—তিনিই যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ; দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন এই তত্ত্ব অনুভবে আসিয়া ত্রিপুটীভাব দূর হইয়া সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ভাবের স্ফুরণ হয়।

২৩। প্রণাম ঃ—

এ অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি স্ফুরণ হওয়ায় সব জায়গায় মাথাটা আপনা হইতে গিয়া নত হইয়া পড়ে। প্রণাম করা ব্যাপারটা তত সহজ নয়। যাঁহাকে প্রণাম করি তাঁহার বিধানের কাছে নিজের বিধান নিজের ইচ্ছা নিজের সব খেয়াল বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ব্যবস্থামত চলিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ জাতবেদসে নমঃ।
ওঁ ব্রহ্মতেজসে নমঃ। ওঁ পরমাত্মনে নমঃ॥ ১২২

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ১২৩
ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ॥ ১২৪

যঃ দেবঃ অগ্নৌ (যে দেবতা অগ্নিতে) যঃ অপ্সু (যিনি জলে) যঃ বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ (যিনি বিশ্বভুবনকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন) যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু (যিনি ওষধিতে, বনস্পতিতে বিরাজমান রহিয়াছেন) তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ (সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার)।

ওঁ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১২৫

যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতের মধ্যে) মাতৃ-শক্তি-বিদ্যা-কান্তি-শান্তিরূপেণ সংস্থিতা (মাতৃ-শক্তি-বিদ্যা-কান্তি শান্তিরূপে বিরাজমানা) তস্যৈ নমঃ (তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি)।

শরণাগত-দীনার্ত্ত পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে (হে শরণাগত-দীন-আর্ত্তের পরিত্রাণ-পরায়ণে) সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে (হে সর্ব্বজীবের আর্ত্তিহারিণি) দেবি নারায়ণি (হে দেবি নারায়ণি) তে নমঃ অস্তু (তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক)।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্ব-মঙ্গল মঙ্গল্যে (হে সর্ব্বমঙ্গল ও মঙ্গলের উপায় স্বরূপিণি শিবে (কল্যাণ দাত্রি) সর্ব্বার্থসাধিকে (হে সর্ব্বার্থসাধিকে; শরণ্যে (হে শরণ্যে) ত্র্যম্বকে (হে ত্রিনয়নে) গৌরি নারায়ণি (হে গৌরি, হে নারায়ণি) তে নমঃ অস্তু (তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক)।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি, দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্বস্বরূপে (অয়ি সর্ব্বস্বরূপে) সর্ব্বেশে (অয়ি সর্ব্বেশ্বরি) সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিতে (অয়ি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে) দেবি (অয়ি দেবি) ভয়েভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে) নঃ ত্রাহি (আমাদিগকে ত্রাণ কর)। দুর্গে দেবি তে নমঃ অস্তু (হে দুর্গে দেবি তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক)।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী, সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং, নমামি পরমেশ্বরীম্॥ ৯২৬

দেবী সর্ব্বরূপময়ী (দেবী সর্ব্বরূপময়ী) সর্ব্বং জগৎ দেবীময়ং (সমস্ত জগৎ দেবীময়) অতঃ অহং (অতএব আমি) বিশ্বরূপাং তাং পরমেশ্বরীং (সেই বিশ্বরূপা পরমেশ্বরীকে) নমামি (প্রণাম করিতেছি) ।

২৪। অগ্নিনির্ব্বাপণ—

অগ্নিনির্ব্বাপণ ক্রিয়াটা অনেকটা দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জ্জনের ন্যায় । মাকে কৈলাস হইতে আবাহন করিয়া আনিয়া তিন দিনের পূজার ফলে আমাদের স্থুল সূক্ষ্ম কারণ শরীরের প্রতি পরমাণুতে মায়ের সত্তা অনুভব করার পরে আর মূর্ত্তির ভিতরে পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকার প্রয়োজন মনে হয় না। তখন যে শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) ক্রিয়া সাধিত হইয়া গিয়াছে। তখন মাকে আমাদের সব তত্ত্বে অনুভব করার ফলে মায়ের আসল পরম রূপটী শিবের সঙ্গে কৈলাসে সামরস্যভাবে অবস্থানটি অনুভবে আইসে। তখন মনে হয় মা যেন স্বরূপে কৈলাসে গিযাছেন—বিভূতিরূপে আমাদের প্রতিতত্ত্বে লীলারত রহিয়াছেন।

অগ্নিনির্ব্বাপণতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই অগ্নি আসিয়া আমাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—আমাদের সব অভিযোগ শুনিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সব অভাব দূর করিয়া আমাদিগকে শান্তিদান করিবেন। এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার ফলে পৃথিবীর জীবকে বলা হইল তোমরা এখন শান্তিতে থাকিতে পার—আর তোমাদের কোনওরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই।

অগ্নি, তুমি এখন সমুদ্রে কারণার্ণবে স্বধামে গিয়া স্বমহিমায় অবস্থান করিতে পার।

পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব ॥ ১২৭

হে পৃথিবী, তুমি শীতলা হও।

মালিন্যং সর্ব্বজগতাং নষ্টং চিত্তঞ্চ সাম্প্রতম্।
ভগবদ্ভাবসংযুক্তং ভাতি শান্তো ভবানল ॥ ১২৮
যেনাসি প্রার্থিতোঽস্মাভিঃ, সমাপ্তং যজ্ঞকর্ম্মতৎ।
ধন্যাঃ স্মঃ কৃতকৃত্যাঃ স্মো, বিজ্ঞায় বিভবং তব। ১২৯

সাম্প্রতং (অধুনা) সর্ব্বজগতাং মালিন্যং নষ্টং (সর্ব্বজগতের মলিনতা বিনষ্ট হইয়াছে) চিত্তং চ ভগবদ্ভাবসংযুক্তং ভাতি (আমার চিত্ত ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়াছে)। অনল শান্তঃ ভব (হে অগ্নি, তুমি শান্ত হও)। যেন অস্মাভিঃ প্রার্থিতঃ অসি (যে নিমিত্ত আমরা তোমাকে আবাহন করিয়াছিলাম) তৎ যজ্ঞকর্ম্ম সমাপ্তং (সেই যজ্ঞকর্ম্ম তোমার কৃপায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে)। তব বিভবং বিজ্ঞায় (তোমার বিভূতি উপলব্ধি করিয়া) ধন্যাঃ স্মঃ কৃতকৃত্যাঃ স্মঃ (আমরা ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইয়াছি—আমাদের জীবন সফল হইয়াছে)।

অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ ॥ ১৩০

হে অগ্নি, তুমি কারণ-সলিলরূপ সমুদ্রে যাও।

আশীষো নঃ প্রদীয়স্তাং, যাভিঃ স্মো বীরবত্তমাঃ।
প্রয়াহি ভাস্বরং ধাম দ্যোতমানং স্বতেজসা ॥ ১৩১

নঃ আশিষঃ প্রদীয়স্তাং (আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও) যাভিঃ (যদ্দ্বারা) বীরবত্তমাঃ স্মঃ (বীরশ্রেষ্ঠ হই)। স্বতেজসা

দ্যোতমানং (তোমার স্বকীয় তেজে উদ্ভাসিত) ভাস্বরং ধাম প্রয়াহি (জ্যোতির্ম্ময়ধামে গমন কর)।

২৫। শান্তি ঃ—শান্তি মন্ত্রে দেখান হইয়াছে আমরা এখন শান্তিতে থাকিতে পারি। কিরূপে আমাদের ভিতরে আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে এমন কি জগতে শান্তি স্থাপন করা যায় তাহার উপায় এখানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সকলের শান্তিতেই যে আমাদের শান্তি তাহা বুঝিয়া সমষ্টির শান্তির জন্য এখানে প্রার্থনার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা যেন কাহারও দোষ না দেখিয়া ভালর দিকে দৃষ্টি রাখি—সকলকে ভালবাসিয়া আপন মনে করিয়া ভাল করিতে চেষ্টা করি। সকলের সুখের জন্য যেন সমবেতভাবে প্রার্থনা করি।

এই শান্তি স্থাপনের প্রধান উপায় যে একতাস্থাপন, সকলকে নিজের ন্যায় দেখা, আত্মীয়—নিজেরই আত্মার বিভূতি মনে করা—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সকলের সুখে যে আমার সুখ, সকলের ঐশ্বর্য্যে যে আমার ঐশ্বর্য্য, সকলের উন্নতিতে যে আমার উন্নতি, সকলের কল্যাণে যে আমার কল্যাণ এই ভাবটা বদ্ধমূল করার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃপৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তির্ব্বনস্পতয়ঃ শান্তি র্বিশ্বেদেবাঃ শান্তি র্ব্রহ্মশান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ সর্ব্বরোগঃ শান্তিঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ। সা মে শান্তিরেধি। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥ ১৩২

(সুস্পষ্টার্থ)

**ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ ১৩৩**

দেব সবিতঃ (হে সবিতৃদেব) বিশ্বানি দুরিতানি (সর্ব্বপ্রকার অশুভ পাপ) পরাসুব (পরাভূত কর) যৎ ভদ্রং (যাহা শুভ, কল্যাণকর) নঃ তৎ আসুব (আমাদের নিকট তাহাই আবির্ভূত হউক) ।

**ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং চক্ষুভিরবলোকয়াম।
ভদ্রং মনোভিশ্চিন্তয়াম ভদ্রং বাহুভিঃ সাধয়াম ॥ ১৩৪**

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম (আমরা যেন কর্ণদ্বারা মঙ্গলময় বাণী শ্রবণ করি) চক্ষুভিঃ ভদ্রং অবলোকয়াম (চক্ষুদ্বারা যেন আমরা মঙ্গলময় দৃশ্য অবলোকন করি) মনোভিঃ ভদ্রং চিন্তয়াম (মন দ্বারা যেন আমরা শুভ চিন্তা করি) বাহুভিঃ ভদ্রং সাধয়াম (হস্তদ্বারা যেন আমরা শুভকর্ম্ম সাধন করি) ।

**সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৫**

অত্র (এ জগতে) সর্ব্বে সুখিনঃ সন্তু (সকলেই সুখী হউক) সর্ব্বে নিরাময়াঃ সন্তু (সকলেই নিরাময় হউক) সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু (সকলেই মঙ্গলময় দৃশ্য দর্শন করুক) কশ্চিৎ দুঃখং মা আপ্নুয়াৎ (কেহই যেন দুঃখ-প্রাপ্ত না হয়) ।

**সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু ॥ ১৩৬**

সর্ব্বঃ দুর্গাণি তরতু (সকলে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউক) সর্ব্বঃ ভদ্রাণি পশ্যতু (সকলে মঙ্গল দর্শন করুক) সর্ব্বঃ সদ্‌বুদ্ধিম্ আপ্নোতু (সকলে সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হউক) সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু (সকলে সর্ব্বত্র আনন্দ করুক)।

দুর্জ্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।
শান্তো মুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চান্যান্
বিমোচয়েৎ ॥ ১৩৭

দুর্জ্জনঃ সজ্জনঃ ভূয়াৎ (দুর্জ্জন সজ্জন হউক) সজ্জনঃ শান্তিম্ আপ্নুয়াৎ (সজ্জন শান্তিলাভ করুক) শান্তঃ বন্ধেভ্যঃ মুচ্যেত (শান্ত ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করুক) মুক্তঃ চ অন্যান্ বিমোচয়েৎ (এবং মুক্ত হইয়া অপর সকলকে বন্ধনমুক্ত করুক)।

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং ন্যায্যেন মার্গেণ
মহীং মহীশাঃ।
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং লোকাঃ সমস্তাঃ
সুখিনো ভবন্তু ॥ ১৩৮

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ (প্রজাদিগের মঙ্গল হউক) মহীশাঃ (ভূপালগণ) ন্যায্যেন মার্গেণ (যথাবিধি ন্যায়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক) মহীং পরিপালয়ন্তাং (পৃথিবী পরিপালন করুন) গোব্রাহ্মণেভ্যঃ নিত্যং শুভম্ অস্তু (গোব্রাহ্মণের নিয়ত কল্যাণ হউক) সমস্তাঃ লোকাঃ সুখিনঃ ভবন্তু (সকল লোক সুখী হউক)।

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যঃ, পৃথিবী শস্যশালিনী
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো, ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ।
অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু, পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ
অধনাঃ সধনাঃসন্তু, জীবন্তু শরদাং শতম্ ॥ ১৩৯

কালে (যথাকালে) পর্জ্জন্যঃ বর্ষতু (বারি বর্ষিত হউক) পৃথিবী শস্যশালিনী (পৃথিবী শস্যশালিনী হউক) অয়ং দেশঃ (আমাদের এই দেশ) ক্ষোভরহিতঃ (ক্ষোভ রহিত দুঃখ কষ্ট অশান্তি বর্জিত হউক) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) নির্ভয়াঃ সন্তু (শঙ্কাশূন্য হউক)। অপুত্রা পুত্রিণঃ সন্তু (অপুত্রকের পুত্রলাভ হউক) পুত্রিণঃ পৌত্রিণঃ সন্তু (পুত্রবানেরা পৌত্র লাভ করুক) অধনাঃ সধনাঃ সন্তু (নির্ধনেরা ধনলাভ করুক) [সর্ব্বে] শরদাং শতং জীবন্তু (সকলে শতবর্ষ জীবিত থাকুক)।

২৬। তিলক ধারণ ঃ—তিলক ধারণের ভিতরে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে যজ্ঞতত্ত্বের সার রহস্য আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিব—সেই আদর্শে আমরা জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিব। তিলক পরাইবার (দেওয়ার) সময় বলা হয় বৈদিক ঋষিদের মতন তোমাদের পরামায়ু, জ্ঞান, অনুভূতি ও শান্তি লাভ হউক।

ঋষীণাং কশ্যপাদীনাং যদ্বৈ তেজঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ।
সত্যস্য ধারণী প্রজ্ঞা যদায়ুষ্যং তদস্তু তে॥ ১৪০

কশ্যপ আদিনাং ঋষীণাম্ (কশ্যপাদি ঋষিদিগের) যৎ বৈ তেজঃ স্মৃতিঃ ধৃতিঃ (যে তেজ স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তি [যা চ] সত্যস্য ধারণী প্রজ্ঞা (আর যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্যস্বরূপের ধারণযোগ্য প্রজ্ঞা) যৎ আয়ুষ্যং (তাঁহাদের যে সুদীর্ঘ পরমায়ু) তৎ তে অস্তু (তাহাই তোমার হউক)।

(ললাটে) **ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং** (কণ্ঠে) **ওঁ জমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং।**
(বাহুমূলে) **ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং** (হৃদয়ে) **ওঁ তন্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং॥ ১৪১**

কশ্যপ ঋষির যে তিনটি বয়োবস্থা অর্থাৎ বাল্য, কৌমার এবং যৌবন, তদ্রূপ জমদগ্নি মুনির তিন বয়ঃ অবস্থা আর যে দেবতাদের তিন বয়ঃ অবস্থা সেই তিনটি বয়ঃ অবস্থা তোমাদেরও হউক। অর্থাৎ পূর্ণ পরিণতি লাভ কর—অকালে বিয়োগ যেন না হয়।

২৭। ইড়া ও সোম ভক্ষণ ঃ—ইড়া ও সোমভক্ষণের মধ্যে আমরা দেবতার যজ্ঞেশ্বরের সাদৃশ্য লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করি। ইড়া ভক্ষণের দ্বারা আমরা দেবতার মতন স্থূল দেহ, সোম ভক্ষণের দ্বারা আমরা দেবতার মতন সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়া দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হই। দেবতাকে ভক্ষণ করিয়া আমবা দেবত্ব লাভ করি। আমাদের ভিতরে তখন পূর্ণতা—একতা স্থাপিত হয়।

রাম প্রসাদের 'এবার কালী তোমায় খাবো' গানটির ভিতরে খৃষ্টধর্ম্মীর যীশুর মাংস ও রক্তভক্ষণের ভিতরেও আমরা এ রহস্য দেখিতে পাই।

ওঁ অপাম সোমমমৃতা অভূম।
আগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্॥ ১৪২

(হে সোম) সোমম্ (সোম, তোমাকে) অপাম (যেন পান করিতে পারি) অমৃতা অভূম (সোমপানের ফলে মৃত্যুকে জয় করিব) জ্যোতিঃ (দ্যোতমান স্বর্গ) আগন্ম (যেন প্রাপ্ত হই) দেবান্ অবিদাম (আমরা দীপ্যমান দেবতত্ত্ব জানিয়াছি।

ওঁসংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে॥ ১৪৩

তোমরা একত্র মিলিত হও, তোমাদের উক্তি একপ্রকার হউক।

তোমাদেব মন পরস্পব একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাগণেব ন্যায একমত হইযা যজ্ঞভাগ গ্রহণ কবিতেছেন।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী।
সমানং মনঃ সহ চিত্ত মেষাম্॥ ১৪৪

সমানী বঃ আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ১৪৫

তোমাদেব মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকাব হউক, তোমরা এক গোষ্ঠীতে অন্তভূক্ত হও; তোমাদের মন চিত্ত সকলই একপ্রকাব হউক। তোমাদেব অভিপ্রায এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, মন এক হউক, তোমবা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।

॥ সমাপ্ত ॥

যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

—ঃ০ঃ—

যজ্ঞবেদী কিংবা যজ্ঞকুণ্ড—বালি পাটকাঠি বা তুলা।

সমিধ্—আম, বেল, যজ্ঞডুমুর, কাঁঠাল, শাল, দেবদারু পলাশ, শমী, চন্দন প্রভৃতি কাঠ।

হবনসামগ্রী—১৫০টি ত্রিপত্র বিল্বপত্র, পঞ্চশস্য অর্থাৎ ধান (বা চাউল), যব, শ্বেতসরিষা, মুগ ও তিল; চিনি; কিসমিস ও বাদাম প্রভৃতি শুষ্ক ফল; ঘৃত, মধু চন্দন, গুগ্‌গুল, ধূনা ইত্যাদি।

যজ্ঞেশ্বরের জন্য—নৈবেদ্য ও মালা।

কোশাকুশী, ফুল, তুলসী, দুর্ব্বা, চন্দন। ধূপ-দীপ।

আরতির জন্য কর্পূর।

অর্ঘ্যের জন্য—ফুল, চন্দন, আতপ চাউল, দুর্ব্বা এবং জল।

পূর্ণাহুতির জন্য—১টি আস্ত পান, ১টি আস্ত সুপারি এবং ১টি আস্ত ফল (কলা, নারিকেল প্রভৃতি)।

অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য দধি।

প্রসাদ।

'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র এবং হবনসামগ্রী দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বিধেয়।

পরিশিষ্ট

[যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যজ্ঞের ভূমিকারূপে অন্যত্র * লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ হইতে তাঁহার সদয় অনুমত্যনুসারে।]

পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অতীত কালে ভারতবর্ষে অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিমুনিগণ নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ব্রাহ্মণগণের পালনীয় স্বাধ্যায় দান ও তপস্যার সঙ্গে যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন।" তখন সাধারণতঃ সকলে যজ্ঞকে লৌকিক এবং অলৌকিক সকলপ্রকার ফলপ্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তখন আমাদের দেশ যজ্ঞের মহিমা সম্বন্ধে গাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল।

কিন্তু কালবিপর্যয়ে যজ্ঞের তাৎপর্য্য ও রহস্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই অবগত নহেন। এমনকি প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন এবং প্রাচীন পরম্পরার পক্ষপাতী বলিয়া শ্রদ্ধালু তাঁহারাও যজ্ঞের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে মর্ম্মজ্ঞ নহেন। তাই আজ যজ্ঞের বিজ্ঞান জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যজ্ঞের প্রতি অধিকাংশ স্থলে অনাদর এবং উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইতেছে।

---

* অখণ্ড মহাযজ্ঞ নামক গ্রন্থের ভূমিকা—কাশীস্থ আনন্দময়ী আশ্রম হইতে প্রকাশিত।

যজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃতস্বরূপ কি, ইহার ফলবত্তার ভিত্তি কোথায়—এইসব প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ উদিত হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা নিয়ত সঞ্চালিত হইতেছে। ঋষিদের পরিভাষায় ইহারাই দেবতা। "দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বম্।" শক্তি মূলে এক হইলেও উপাধিভেদে নানাপ্রকার—দেবতাও এক এবং অভিন্ন হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে তাহার অবান্তর ভেদ অসংখ্য। "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। অব্যক্ত শক্তিদ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কার্য্যসাধনের জন্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয় এবং কার্য্য করিলে শক্তির অপচয় ঘটে। তাহার পূরণের অর্থাৎ শক্তির পুষ্টির নিমিত্ত আহার্য্য আবশ্যক হয়। এই আহার যোগাইয়া উহাকে সমর্থ করিতে হয়। ইহারই নাম দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ বা যজ্ঞ। যজ্ঞ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট— যথা, দেবতা, হবির্দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণা :—

১। দেবতা—এক আত্মার বিভিন্ন বিভূতিই দেবতা। দেবতাগণ তিনশ্রেণীভুক্ত—আজানজ দেবতা, কর্ম্ম দেবতা ও আজান দেবতা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে উদ্ভূত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি আজান দেবতা স্তুতি ও আহুতিতে তুষ্ট হন এবং যজ্ঞফল প্রদান করেন। ইহারা দিব্য, সাকার ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। সাধকের সাধনের যোগ্যতা থাকিলে ইহাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

২। হবির্দ্রব্য—আজান দেবতাদের ইহাই উপজীব্য। একবারে যতটা হবি অর্পণ করা হয় তাহাকে আহুতি বলে। আহুতি অর্থ—আহূতি বা

আহ্বান—যজমান আহুতি দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন। অগ্নি দেবতাদের মুখস্বরূপ। বিধিপূর্ব্বক হবিঃ অগ্নিতে অর্পিত হইলেই অমৃতে পরিণত হইযা দেবতাদের গ্রহণযোগ্য হয়।

৩। মন্ত্র শক্তিসম্পন্ন শব্দরাজি, যাহাব প্রভাবে হবিঃ দেবতার নিকট ভোগ্যরূপে উপনীত হয।

৪। ঋত্বিক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমন্ত্রিত বিদ্বান্ ও ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ।

৫। দক্ষিণা—যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণের পারিশ্রমিকস্বরূপ দেয় দ্রব্য।

সকল কর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুইপ্রকার। জগতের কল্যাণ এবং সর্ব্বজনহিতায কর্ম্মও নিষ্কাম। শাস্ত্রীয় বিধির অনুশাসনে বা ভগবৎপ্রেরণাতে কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ। এই দুই প্রকাব নিষ্কাম কর্ম্মই যজ্ঞের প্রকৃষ্ট স্বরূপ। ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও যথাসময়ে ইহা ফলপ্রসূ হইয়া নিখিল বিশ্বের কল্যাণার্থে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে বন্ধন তো হয়ই না বরং পূর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হয়। 'যজ্ঞার্থং কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ (গীতা ৩।৯) যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।' (গীতা ৪।২৩)

যজ্ঞেব কথা বলিতে গেলে বৈদিকযুগের কর্ম্মময় জীবনধারার একটি সুমধুর চিত্র হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। বৈদিক যুগে সামাজিক জীবনে অগ্নি দেবত'র স্থান অতি উচ্চে ছিল। ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে সমিধ আধান করিতে হইত। বৈবাহিক অগ্নিসংস্কারে গৃহস্থ হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও যাগাদি কর্ম্ম ভার্য্যার সহিত করণীয়। গৃহস্থ আশ্রমে অগ্নি সেবাই মুখ্য উপাসনা। এই অগ্নির নামান্তর গৃহ্য

বা আবসথ্য অগ্নি অথবা পাকাগ্নি ঔপাসন হোম, বৈশ্বদেব, পার্ব্বণ. অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ, শ্রবণা, শূলগব—এই সকল কর্ম্ম পাকযজ্ঞের অন্তর্গত। ঔপাসন হোমটি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করণীয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পৃথক হোম মনে হইলেও বস্তুতঃ একই অভিন্ন কার্য্য সাধক এবং একটি ফলেরই উৎপাদক।

পক্ষাদি কর্ম্ম—'সন্ধিমভিতো যজেৎ'—সন্ধির পূর্ব্বে ও পরে যজন করিবে—এই নিয়মানুসারে পর্ব্বের (অমাবস্যা পূর্ণিমার) চতুর্থাংশ ও প্রতিপদের প্রথম তিন অংশ যাগকাল।

বৈশ্যদেব কর্ম্ম—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর। গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন অবশ্য কর্ত্তব্য। চুল্লী পেষণী প্রভৃতি পাঁচটি গৃহস্থের সূনা বা হিংসা নিদান স্থান। এই অবশ্যম্ভাবী পাপমুক্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বের প্রাণীবর্গের সেবা। ঊর্দ্ধে দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোক, মধ্যে মনুষ্যলোক এবং নীচে ইতর প্রাণী বা তীর্য্যগাদি জীবলোক সমস্ত বিশ্বের প্রাণীবর্গকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিবিধান বা সেবা করার ভাবটি পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রাণ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাশ্চ যক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্।
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়াপ্রদত্তং তেষামিদং তে মুদিতাঃ ভবন্তু।

[পারস্কর গৃহসূত্রের ভাষ্যকার হরিহর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকটিতে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রৌত কর্ম্ম গৃহ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রৌত অগ্নি তিন প্রকার—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। আহবনীয় কুণ্ড চতুরস্র, গার্হপত্যের বৃত্তাকার ও দাক্ষিণাগ্নির অর্দ্ধচন্দ্রাকার। গার্হপত্যাগ্নি হবিঃ পাকনিমিত্ত, দক্ষিণাগ্নি পিতৃকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য এবং আহবনীয় মুখ্য যজ্ঞাগ্নি।

শ্রৌত কর্ম্ম—হবিঃসংস্থা ও সোমসংস্থা এই দুই প্রকার। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও দর্ব্বীহোম (পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি) প্রথমটির অন্তর্গত। দ্বিতীয় সংস্থায় অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম।

অগ্নিহোত্র—অগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করা হয়। অনেকে ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ স্মার্ত্ত ঔপাসন হোমকে অগ্নিহোত্র মনে করেন। অগ্নিহোত্র অতি প্রশস্ত কর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য। পরম সঙ্কট কালেও ইহা ত্যাগ করা অনুচিত। দর্শপূর্ণমাস অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য ফাল্গুন পূর্ণিমাতে, আষাঢ় পূর্ণিমাতে, কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে এবং ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে অনুষ্ঠেয়। নিরূঢ়পশুবন্ধ—প্রতি বৎসর বর্ষাকালে। আগ্রয়ণেষ্টি বা নবান্ন ইষ্টি নবীন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর করা হয়। সৌত্রামণী পশুযাগ বিশেষ। সোমযাগ বা অগ্নিষ্টোম প্রাচীনকালে সোমলতা হইতে রস নিষ্কাসন করিয়া উহাদ্বারা হোম করা হইত। বর্ত্তমানে সোমলতা দুর্লভ বলিয়া পুতিকার ব্যবহার করা হয়। এই যাগে ১৬টি ঋত্বিকের প্রয়োজন। ইহারা অধ্বর্যুগণ (যজুর্ব্বেদীয়), ব্রহ্মগণ (অথর্ব্ববেদীয়), হোতৃগণ (ঋগ্বেদীয়) এবং উদ্‌গাতৃগণ (সামবেদীয়) এই গণচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রতি গণে চারিটি করিয়া

ঋত্বিক। মূলে এই যাগে চারিটি সংস্থা আছে—যথা অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য ষোড়শী ও অতিরাত্র। এই চারিটি হইতে আরও তিনটির উদ্ভব। অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও আপ্তোর্য্যাম। বাজপেয় শরৎকালে করণীয়। সৌত্রামণীর ন্যায় ইহাতেও সুরা হোমের বিধান আছে। কিন্তু ইহা কলিতে বর্জ্জনীয়। যাজ্ঞিকগণ সোমসুরাস্থলে তাম্রপাত্রে গোদুগ্ধ সহ সোমরসের ব্যবহার করেন, কেননা গোদুগ্ধ তাম্রপাত্রে সুরাসদৃশ। রাজসূয় রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের জন্য। অশ্বমেধ ইহাও এক প্রকার সোমযাগ। সবনীয় পশু অশ্ব বলিয়া ইহার অশ্বমেধ নাম হইয়াছে। অভিষিক্ত সার্ব্বভৌম রাজা ইহার অধিকারী। পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ পিতৃমেধ প্রভৃতি যাগের কথাও ঋষিগ্রন্থে পাওয়া যায়। পিতৃমেধ মৃত পিতার মৃত্যুবৎসর স্মরণ না থাকিলে করিতে হয়।

মন্ত্রজন্য সংস্কার দ্বারা বাহ্য অগ্নি দিব্য অগ্নিতে পরিণত হয় এবং আত্মসংস্কার প্রভাবে হোমাগ্নিও ইষ্টাগ্নির মধ্য দিয়া ব্রহ্মাগ্নি স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তান্ত্রিক মতেও ভাবনা দ্বারা মূলাধার হইতে সুষুম্নাপথে উদ্গত চৈতন্যরূপ অগ্নিকে তৃতীয় নেত্রদ্বারা নির্গত করিয়া শুদ্ধ বাহ্যাগ্নির সঙ্গে যুক্ত করিতে হয় এবং শিববীর্য্যরূপে দেবীগর্ভাত্মক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই ব্যাপারটি বাগীশ্বরী গর্ভে—বাগীশ্বর বীজের অনুকল্প। এই হোমাগ্নি উপাস্য দেবতার নামানুসারে নামকরণের দ্বারা, ইষ্টাগ্নিরূপ ধারণ করে। অগ্নির সপ্তজিহ্বা—এক একটি জিহ্বা এক এক দিকে প্রসারিত। ঈশান, পূর্ব্ব, অগ্নি, নৈর্ঋত, পশ্চিম ও বায়ু এই ছয়দিকে ছয়টি ও মধ্যে একটি। উত্তর দক্ষিণে জিহ্বা নাই। মধ্যস্থ জিহ্বাটির নাম বহুরূপা—ইহাই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাতে আহুতি দিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। এই জিহ্বাটিতে ইষ্টরূপা জগজ্জননীকে

আবাহন করিয়া আবরণ দেবতাদিসহ সকলকে নিষ্কামভাবে আহুতি প্রদান করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম ব্যস্ত-সমস্তভাবে সমাপন করিয়া—ব্রহ্মার্পণ আহুতিতে পরব্রহ্মে স্থিতি নিতে হয়। চিদগ্নি কর্ম্মীর শরীর হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্যাগ্নিতে যুক্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি (অর্থাৎ সমিধ আদি) যতই শুদ্ধ হউক না কেন হোমাগ্নির কাজ করিতে পারে না। এইসব প্রক্রিয়ায় উচ্চাঙ্গের যোগকর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক। মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার ন্যায় বাহ্যাগ্নিতে চৈতন্য সঞ্চার করিয়া চেতন বা প্রাণময় করিলেই উহা দিব্যভাবে উন্নীত হইয়া পরাশক্তির বাহ্যস্ফুরণরূপে প্রতীতি গোচর হয় পরে উহাকে ব্রহ্মাগ্নিরূপে অনুভব করিযা ব্রহ্মার্পণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। তান্ত্রিক ছয়প্রকার কুলযাগের প্রথমটি বাহ্য স্থণ্ডিলাদি অবলম্বনে এবং ষষ্ঠটী আত্মচৈতন্যরূপ সংবিৎকে আশ্রয় করিয়া করিতে হয়। ইহার পূর্ণতার উত্তর অবস্থায় গুরু শরীর আশ্রয় করিয়া যাগটি নিষ্পন্ন হয়—ইহাকে সপ্তম যাগ বলা যাইতে পারে।

যজ্ঞের অন্তরঙ্গ নিগূঢ় ভাবটি ধারণা করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। গীতার বহুবিধ যজ্ঞের মধ্যে একই আদর্শ বিদ্যমান, শ্রীভগবান স্বয়ং জপযজ্ঞস্বরূপ। যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড, দান ও তপস্যা মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের এক কলার সমান হয় না। মানসজপ অতি শ্রেষ্ঠসাধন। "সর্ব্বক্রতুযাজিনাম্ আত্মযাজী বিশিষ্যতে।" ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত মানসজপ আত্মযাগে পরিণত হয়। আধানের পর অগ্নিসকল যজমানে স্থিত হয়—গার্হপত্য যজমানের প্রাণ, দক্ষিণাগ্নি অপান, আহবনীয় ব্যান, সভ্য ও আবসথ্য উদান ও সমানরূপে। তখন "আত্মন্যেব জুহোতি" আত্মাতেই হবন হয়। ইহার নাম আত্মযাগ—আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। [বৌধায়ন বৃঃ ২১০-২১১]

কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ নয়। যে কর্ম্মের ফলে শুদ্ধি জন্মে দেহশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় শুদ্ধি, অহঙ্কার শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, যে কর্ম্মের ফল স্বার্থ নহে পরার্থ, যে কর্ম্মে নূতন আবরণ রচিত হয় না বরং পূর্ব্বস্থিত আবরণ ক্ষীণ হয়, যে কর্ম্ম জীবকে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে ধাবিত করে ও চরমে মহাজ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত করে, তাহাই যজ্ঞ। যজ্ঞার্থ ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বন্ধন হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিষ্কাম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত যোগস্থ কর্ম্ম বা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মই যজ্ঞ। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল কর্ম্ম-কর্ত্তাতে আরূঢ় হইতে না পারিয়া সমস্ত বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তিরূপে ব্যাপ্ত হয় এবং যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করে। এই প্রীতি প্রসন্নতা বা প্রসাদই অমৃত—কর্ম্মকর্ত্তার যোগ্য পুরস্কার। অসার বা হেয় বলিয়া ত্যাগ এবং সার বা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ এই উভয়াত্মক ক্রিয়াই কর্ম্ম বা যজ্ঞের স্বরূপ। জাগতিক সকল পদার্থই সাঙ্কর্য্য দোষযুক্ত, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাগে মিশ্রিত। ক্রিয়া-কৌশলে এই অশুদ্ধাংশের বর্জ্জন ও শুদ্ধাংশের গ্রহণই যজ্ঞের রহস্য। যে চৈতন্যশক্তি এই সারাসার বিবেচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে যজ্ঞীয় পরিভাবাতে তাহাই সংস্কৃত অগ্নি। শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে কুণ্ডলিনী জাগিলে, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তবেই যজ্ঞের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ক্রমিক বিকাশ অনুভূত হয়। প্রথমে শক্তির জাগরণ—ইহার প্রভাবে মলিনাংশ পরিত্যক্ত ও শুদ্ধাংশ প্রকাশিত হয়। উচ্চতর ভূমির জাগ্রৎ শক্তিতে ঐ শুদ্ধাংশের আহুতি হয়। এই তীব্রতর অগ্নিতে পুনঃ সূক্ষ্ম মলের শোধন হয়। এইভাবে ততোধিক তীব্রতর তৃতীয় অগ্নির ক্রিয়া চলে। এইভাবে অশুদ্ধি শোধন হইতে হইতে পরিণামে বিশুদ্ধ সত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়—তখন আর অগ্নির দাহিকা শক্তি উহাতে কার্য্যকরী হয় না—উহা তখন বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্র।

যে ভূমিতে স্থূল দেহে আত্মবোধ প্রকাশ পায় তাহাই নিম্নতম। এই অধোভূমিতেই শক্তির প্রথম জাগরণ—অর্থাৎ জীবের চৈতন্যশক্তির উপলব্ধি। অন্নময়াদি পঞ্চকোশাত্মক দেহে ক্রমশঃ পঞ্চাগ্নিময় মহাযজ্ঞের প্রারম্ভে প্রথম অগ্নিতে বা জঠরানলে সৌম্যবস্তু বা আহার্য্যের আহুতি দানের ফলে অর্থাৎ প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রভাবে সপ্তধাতুর বিকাশ হয়। স্থূল অন্নময় কোষের সার বীর্য্যরূপ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই "আমির" অভিমান হয়। সাধারণতঃ বিন্দুর আহুতি দেওয়া সম্ভবপর হয় না বলিয়া—বিন্দু বহির্মুখ হয় ও অনিবার্য্য মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" মনোবহা নাড়ী অন্নরসদ্বারা হৃদয়ান্তবর্ত্তী মনকে আপ্যায়িত করে। অন্নরসের সূক্ষ্ম সত্তা সমস্ত দেহে তেজোরূপে সঞ্চিত হয় যাহার ফলে দেহে কান্তি, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, ধৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। চিত্তে কামনার উদ্ভব হইলে মনোবহা নাড়ী সর্ব্বগাত্র হইতে ব্যাপক তেজকে মন্থন করিয়া বীর্য্যরূপে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত বিন্দুরূপ দান করে এবং স্বীয় বহির্মুখ বেগে দেহ হইতে নিঃসারণ করিয়া দেয়। বিন্দুক্ষরণের ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে ক্ষীণভাবে হইলেও বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি হয় এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সহস্রারের মধ্যবিন্দু সদাখ্য কলাতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সুধা বা চন্দ্রবিন্দু আংশিকভাবে কালাগ্নিকুণ্ডে ক্ষরণ হয় তাই ব্রাহ্মীস্থিতি হয় না সুতরাং জীব জরা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায় না। বোধের সহিত সজ্ঞানভাবে বিন্দুর ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি হইলে স্থিতিলাভ হয়।

আহার্য্যের আহুতি হইতে পরিণত প্রথম অমৃতবীর্য্য দেহের অন্নময় কোষের পোষক। সার পদার্থ বিন্দুর আহুতি হয় দ্বিতীয় অগ্নিতে—

ওজঃরূপ সারাংশ প্রাণময় কোষের পোষক। ওজঃ তৃতীয় অগ্নিতে বিশুদ্ধ হইয়া মনোরূপে ফুটিয়া উঠে এবং মনোময় কোষকে পুষ্টি করে। বিকল্পসংকল্পাত্মক মনের চতুর্থ অগ্নিতে আহুতি হইলে বিকল্পাংশ দূরীভূত হইয়া শুদ্ধ সংকল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময় কোষের পোষক। ইহাই যোগভূমি বা ঐশ্বরিক জীবভূমি—এখানে মনোবহা নাড়ীর কোন ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান পঞ্চম অগ্নিতে পরিশোধিত হইয়া আনন্দরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চম অমৃত, আনন্দময় কোষের উপজীব্য। ইহাতে মল থাকে না—নিত্য শুদ্ধ অমৃত ও অক্ষয়। আনন্দময় কোষই মায়ের কোল। আনন্দরূপা মায়ের সত্তা। আনন্দময় কোষও অতিক্রম করিতে হয়—ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে চরম আহুতি - ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। পূর্ণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। প্রথম পাঁচটি দিব্য অগ্নিতে আনন্দের সহিত মিশ্রিত ভাবে নিরানন্দের অর্পণ, ফলস্বরূপ আনন্দের উজ্জ্বলতম রূপটি আয়ত্ত হয় যাহা প্রিয়তমকে উপহার দিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু। চরম আহুতিতে সে মহান আনন্দকে—অমৃতকে—সমর্পণ করিয়া ভোক্তৃভোগ্যভাবের অতীত অদ্বয় বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয়, দ্বন্দ্বাতীত পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।" আনন্দই সেই হিরণ্ময় পাত্র, যাহা দ্বারা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে। মৃত্যু ও অমৃত, দুঃখ ও আনন্দ, হেয় ও উপাদেয়—সব দ্বন্দ্ব পদার্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলেই সেই সর্ব্বাতীত দ্বন্দ্বাতীত সত্তার নির্ম্মল প্রকাশ উদয় হইবে। তিনিই যে অনন্ত দ্বন্দ্বময় বিচিত্র বিকাশরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, অমৃত ও মৃত্যু, দুঃখ ও সুখ যে তাঁহারই রূপ তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে। লৌকিক বা অলৌকিক

কোন অগ্নির এই পূর্ণাহুতি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই—একমাত্র ব্রহ্মাগ্নি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ অগ্নিই এই পরম অমৃত সোমকে ধারণ করিতে সমর্থ। ফলে অগ্নি ও সোম, চৈতন্য ও আনন্দ, শিব ও শক্তি সামরস্য লাভ করে—ইহাই পরিপূর্ণ সত্য। যোগিগণ সাধারণতঃ পাঁচটি স্তরে বিশ্বকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া কোষভেদের সহিত সংশ্লিষ্ট শোধক অগ্নি এবং অমৃতও পাঁচ পাঁচটি ধরা হইয়াছে। উপনিষদেও পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বর্ণনা আছে। বাণপ্রস্থ আশ্রমে তাপসগণের সূর্য্যাদি অগ্নিপঞ্চকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পঞ্চতপার বিষয় যাহা ভাগবতে বর্ণিত তাহা অন্য প্রকার। কর্ম্মভেদেও অগ্নি অনেক প্রকার যথা, মারুত, চান্দ্রমস, শোভন, হুতাশন, হব্যবাহন, কব্যবাহন, বহ্নি, সাহস, বরদ, মৃড়, জঠরাগ্নি, ক্রব্যাদ, বাড়ব, সংবর্ত্তক, পাবক প্রভৃতি। দেহস্থ কালাগ্নি, বাড়বাগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি, পার্থিবাগ্নি, সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম দেহাভিমানের শুদ্ধি আবশ্যক। মূল চিৎশক্তির প্রেরণাতে প্রকৃতিবশতঃ সর্ব্বকর্ম্ম সাধিত হয়। তাহাতে মিথ্যা অভিমান জড়িত থাকাতে কর্ম্মের বিপাকে সুখদুঃখ ভোগ হয়। যজ্ঞাত্মক কর্ম্মে অশুদ্ধ অহংকার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা না থাকাতে উহা বিশুদ্ধ কর্ম্ম। এইজন্য প্রারম্ভেই ব্যষ্টি সমষ্টি অভিমান দূর করিয়া দেহস্থিত হোমাগ্নির উদ্দীপন আবশ্যক। প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ দ্বারা অথবা প্রণব ও আত্মার ধ্যানরূপ নির্ম্মন্থন দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অনাদিকালের গুপ্তরত্নের আবিষ্কারের সন্ধান একমাত্র ঐ প্রদীপ্ত আলোকেই দিতে পারে—অন্য কোনও লৌকিক বা দিব্য আলোকও সমর্থ নয়।

যাবতীয় ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞেয় পদার্থ হব্যরূপে আহুতি দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হইলে যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন ইন্দ্রিয়বর্গ হয় স্রুক্ (হবির আধার—হোমসাধক জুহুকে "স্রুক" বলে), নিজে হয় হোতা, নিজে আত্মরূপী শিব হন অগ্নি এবং শক্তিবর্গ হয় জ্বালা অর্থাৎ পরিছিন্ন চিদাত্মা নিজেই হোতা সাজিয়া অপরিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মক নিজ স্বরূপের অনলে ইন্দ্রিয় সংবেদ্য বিষয় সমূহের আহুতি। সমস্ত ভেদভাব পরিত্যক্ত হইয়া কেবল বোধমাত্র স্ফূর্ত্তি। ইহাই অমৃতী ভাব। *

নিষ্কাম যজ্ঞের নিগূঢ়তম আদর্শ আত্মযাগ-স্বরূপে স্থিতি। যজ্ঞের আদর্শগত উৎকর্য—এই পরম লাভের (যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ) দিক হইতেই সুধীগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরম সৌভাগ্যবশে এই অবস্থা লাভ হইলে সাধক বলেন—

"যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং মৃত্যুরেব মহাপশুঃ।
অলৌকিকেন যজ্ঞেন তেন নিত্যং যজামহে॥"

---

* "সর্ব্বংবেদ্যং হব্যং ইন্দ্রিয়ানি স্রুচঃ শক্তযো জ্বালাঃ স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা।" (পরশুরাম কল্পসূত্র ১।২৬) এই বিশ্বহোমের বা সর্ব্বত্যাগের কথাই অপর একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—

"অন্তঃ (প্রভাস্বতি) নিরন্তর মেধমানে মোহান্ধকার পরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত মরীচি বিকাশভূম্নি বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানকম্॥

অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ৩৬টি তত্ত্ব ও তদ্রচিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদ্ অগ্নিতে—বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যরূপ অনলে আহুতি দিতেছি। মহান্ধকার নাশক ও অলৌকিক রশ্মিবিস্তারকারক এই অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তত্ত্বাতীত অখণ্ডপ্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি!

দ্বৈতবন ইন্ধন, মৃত্যু মহাপশু—ইহা অতি উচ্চ ও অলৌকিক যজ্ঞের আদর্শ। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন :—

"এষ যাগবিধিঃ কোঽপি কস্যাপি হৃদি বর্ত্ততে।
যস্য প্রসীদেৎ চিচ্চক্রং দ্রাগপশ্চিম জন্মনঃ।।"

চিৎশক্তি সুপ্রসন্ন হইলে একমাত্র সেই বিরল মহাত্মার হৃদযেই এই রহস্যময় যজ্ঞের স্বরূপ প্রতিভাত হইতে পারে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" যজ্ঞরূপেই বিষ্ণু বিশ্বধারণ করেন। প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে মানুষকে সংবদ্ধ করিয়া রচনা করিয়াছেন। মানুষ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতার ভাবনা করিবে আর দেবতা অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন। পরস্পর এরূপ ভাবনাদ্বারাই শ্রেয়ো লাভ হইবে।

—০—

১০৩—১০৫ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ

[পশ্চিম বঙ্গ বহরমপুর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পরম প্রেমাস্পদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম. এ. এই গ্রন্থ প্রকাশনে নানা বিষয়ে আমাদের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। তিনি ১০৩—১০৫ শ্লোকের একটু তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়া দিয়াছেন, যাহা উপাদেয় ও মনোরম হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে উপযোগী হইবে মনে করিয়া ইহা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।]

ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তা বাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না-বর্ত্মনা নিত্যং অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ ১০৩
হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানম্ আত্মনা ॥ ১০৪
দ্বে আহুতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্র বিধানতঃ।
মমতাং প্রথমং হুত্বা হহন্তাঞ্চ জুহুয়াত্ততঃ ॥ ১০৫

অনাদিকাল হইতে জীবভাব অবিবেক বশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সংস্কারই কর্ম্মসংস্কার। ইহার ফলে সুখদুঃখভোগের জন্য ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ না হওয়ার দরুণ ঐ অভিনব দেহেও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলেই পুনরায় কর্ম্মসংস্কার উৎপন্ন হয়। দেহান্তকালে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পুনর্ব্বার প্রারব্ধ কর্ম্মের উদ্ভব ঘটে, যাহার প্রভাবে মৃত্যুর পর অভিনব দেহ প্রাপ্তি আয়ু ও ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে জন্ম মৃত্যুচক্র অনবরত আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার দগ্ধ হইয়া যায়। তখন কর্ম্মভোগের জন্য দেহান্তর পরিগ্রহ আবশ্যক হয় না।

উপাসকের কর্ত্তব্য ভাবনা দ্বারা এই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দেওয়া। মুক্তিকামীকে প্রথমে বিষয়ের দ্বার ইন্দ্রিয়পথ রোধ করিতে হইবে এবং পরে পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথবা অন্য প্রকারও আছে—সেই প্রকারে বিষয় গ্রহণ করিয়াই বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা হইতেছে বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাকে চিদগ্নিসাৎ করিয়া

সংস্কারে পরিণত হইতে না দেওয়া। ভাবনাত্মক হোম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। মন যখনই বিষয় গ্রহণ করিবে—এবং গৃহীত বিষয় লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উহা আত্মাকে নিবেদন করিবে তখনই ভাবনা করিতে হইবে আত্মাগ্নিতে বিষয় সোম আহুতি দিতেছি। আহুতি ভাবনাত্মক, তাহার করণ মন, অতএব মনই এই আহুতির স্রুক্। "দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ" এই ত্র্যঙ্গ যাগের দ্রব্য ইন্দ্রিয় বিষয় (রূপরসাদি, উহাই বিষয়রস এবং ভাবনাত্মক যজ্ঞে উহাই সোমরস), দেবতা আত্মা, কারণ তদুদ্দেশেই বিষয় সোম অর্পিত হয়। অর্পণ সাধন মনই স্রুক্। বিষয় সকলেই জানি, মনকে না জানিলেও জানি, কারণ মনন ব্যাপার সকলেরই প্রত্যক্ষ। আত্মাকে বুদ্ধিদ্বারা বুঝি বটে, কিন্তু আত্মবিষয়ে ধারণা আমাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট। সুতরাং মন ভাবনাত্মক যজ্ঞে ইন্দ্রিয় পথে সমাহৃত বিষয় কি প্রকারে কোথায় অর্পণ করিবে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে সুষুম্না বর্ত্মনা।

১০৩ ও ১০৪ মন্ত্রে বিষয়রূপ সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের সুষুম্নাতে প্রবাহিত আত্মাগ্নিরূপ 'অহং'-এর ধারাতে আহুতি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে চেতনা অর্থাৎ দ্বৈত চেতনা বিনষ্ট হইবে। এখন অবশিষ্ট থাকিবে অণু চৈতন্যের সুষুম্না প্রবাহী ধারা। ধারা থকিলেই দেশ কাল আছে বুঝিতে হইবে। ইহাকে পরমাত্মজ্যোতিতে আহুতি না দিতে পারিলে নিঃশেষে শ্রেয়ো লাভ হইবে না। সেই আহুতির কথা ১০৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ধ্যায়েদ্ আত্মানমাত্মনা।

১০৫ শ্লোকঃ—শ্রুতিতে উপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রে মমতা অহন্তা দুইটি মাত্র আহুতিরই বিধান আছে। ভাবনাত্মক অগ্নিহোত্র তাহারই প্রতীক; অতএব এখানেও দুইটি আহুতিরই ব্যবস্থা। একটি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অহংধারার আহুতি। অহংভিন্ন অহংসম্বন্ধী সবই মম। অতএব ইন্দ্রিয়বৃত্তির আহুতিতে সমগ্র মম-কারের আহুতিও নিষ্পন্ন হইবে। ইহার পর অপর আহুতিতে অণু-অহংকেও পরম অকৃত্রিম ব্যাপক চৈতন্যে আহুতি দিলে 'অহং মম' একেবারেই নিঃশোষিত হইবে, সংসার চক্রের আবর্ত্তনও শেষ হইবে—জীব কৃতকৃত্য হইবে।